ISSN-0971-8435

যোজনা

ধনধান্যে

জুলাই ২০১৬ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹ ৩০

বিশেষ সংখ্যা

জল : এক অমূল্য সম্পদ

অর্থনৈতিক উন্নয়নে জলসম্পদ ব্যবস্থাপনার ভূমিকা
সচ্চিদানন্দ মুখার্জি

জলের জোগান বৃদ্ধি : সংরক্ষণ ও সচেতনতাই শেষকথা
ড. ইন্দিরা খুরানা

জলাভাব আর সেচে সরকারি লগ্নি : কিছু ভাবনাচিন্তা ও সুরাহার উপায়
সীমা বাথলা

বন্যা ব্যবস্থাপনা : বাঁধ ও জলাধারের ভূমিকা
এম. এস. মেনন

ফোকাস

পতিত পাবনী গঙ্গার উদ্ধার কোন পথে? অতীত উদ্যোগ এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচি
ভারত আর. শর্মা

বিশেষ নিবন্ধ

নদী সংযুক্তিকরণ প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা ও দক্ষ জল ব্যবস্থাপনা
ড. আর. কে. শিবনাপ্পন

PUBLICATIONS DIVISION

website: publicationsdivision.nic.in

Some Prestigious Titles Now Available Online

- India 2016 (also available as eBook)
- Bharat 2016 (also available as eBook)
- Legends of Indian Silver Screen (also available as eBook)
- Abode Under The Dome
- Winged Wonders of Rashtrapati Bhavan
- Right of The Line : The President's Bodyguard
- Indra Dhanush
- The Presidential Retreats of India
- Rashtrapati Bhawan
- Belief In The Ballot (also available as eBook)
- Gandhi : Jeevan Aur Darshan (hindi)
- 1857 The Uprising
- Sardar Patel-Sachitra Jeevni(hindi) (also available as eBook)
- Sardar Patel - A Pictorial Biography (also available as eBook)
- Basohli Painting
- Kangra Painting
- Indian Women : Contemporary Essays
- Bharat Ki Ekta Ka Nirman (hindi) (also available as eBook)
- Yuva Sanyasi (hindi)
- Gazetteer of India Vol.2
- The Geet Govinda of Shri Jaydev
- **Who's Who of Indian Martyrs (Vol-I)**
- **Who's Who of Indian Martyrs (Vol-II)**
- Saga of Valour
- Some Aspects of Indian Culture
- Art & Science of Playing Tabla (also available as eBook)
- Indian Classical Dance
- Celebration of Life : Indian Folk Dance
- **Nataraja**
- Bengali Theatre: 200 Years (also available as eBook)
- Bihari Satsai (hindi)
- Bihari Satsai - A Commentary

- Eye In Art
- Looking Again At Indian Art
- The Life of Krishna In Indian Art
- Pahari Painting of Nala Damayanti Theme
- Ajanta Ka Vaibhav (hindi)
- Bharatiya Kala - Udhbhav Aur Vikas (hindi)
- Bharatiya Chitrakala Main Sangeet Tatva (hindi)
- South Indian Paintings
- Garhwal Chitrakala (hindi)
- A Moment In Time
- Samay, Cinema Aur Itihas (hindi)
- Indian Cinema Through The Century
- Bharatiya Cinema Ka Safarnama (hindi)
- A History of Socialism
- Lamps of India
- Bharat Ke Durg (hindi)
- Wood Carving of Gujarat
- Lawns And Gardens
- Paryavaran Sanrakshan : Chunotiyan Aur Samadhan (hindi)

eBooks

- Lokmanya Bal Gangadhar Tilak
- The Gospel of Buddha
- Introduction To Indian Music
- Sardar Vallabhbhai Patel
- Sardar Vallabhbhai Patel (Adhunik Bharat Ke Nirmata Series)
- Lauh Purush Sardar Patel
- Aise They Bapu
- Mahatama Gandhi -A Pictorial Biography
- Gandhi In Champaran
- Mahatma Gandhi And One World

Printed Books available at flipkart.com
eBooks at kobo.com

জুলাই, ২০১৬

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

সম্পাদক : **রমা মন্ডল**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯

ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬

- এই সংখ্যায় ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- অর্থনৈতিক উন্নয়নে জলসম্পদ ব্যবস্থাপনার ভূমিকা — সচ্চিদানন্দ মুখার্জি ৫
- জলের জোগান বৃদ্ধি : সংরক্ষণ ও সচেতনতাই শেষকথা — ড. ইন্দিরা খুরানা ৯
- জলাভাব আর সেচে সরকারি লগ্নি — সীমা বাথলা ১৭
- বন্যা ব্যবস্থাপনা : বাঁধ ও জলাধারের ভূমিকা — এম. এস. মেনন ২২
- জলাভূমি সংরক্ষণ ও রামসর কনভেনশন — ড. চন্দ্রিমা সিন্‌হা ২৭
- জল নিয়ে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে ভারতের সমঝোতা — ড. সপ্তর্ষি মিত্র ৩৪
- নিরাপদ পানীয় জল : স্বাস্থ্য রক্ষার প্রথম শর্ত — এস. কে. সরকার ৩৭
- নমামি গঙ্গে : এক সংহত প্রয়াস — নির্মাল্য নাগ ৪২

ফোকাস

- পতিত পাবনী গঙ্গার উদ্ধার কোন পথে? — ভারত আর. শর্মা ৪৬

বিশেষ নিবন্ধ

- নদী সংযুক্তিকরণ প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা ও দক্ষ জল ব্যবস্থাপনা — ড. আর. কে. শিবনাপ্পন ৫৩
- মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য সুরক্ষা রাষ্ট্রের আশু দায়িত্ব — ডা. পারভিন বানু ৫৮
- নীতি আয়োগ : সময়ের দাবি — অনিন্দ্য ভুক্ত ৬২

নিয়মিত বিভাগ

- জানেন কি? — সংকলক : ভাটিকা চন্দ্রা ৬৬
- যোজনা ক্যুইজ — সংকলক : রমা মন্ডল এবং পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী ৬৮
- যোজনা ডায়েরি — ঐ ৬৯

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দু-বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)

ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in
www.facebook.com/bengaliyojana

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

জল : প্রকৃতির চালিকাশক্তি

সুপ্রাচীনকাল থেকেই আমরা ভারতীয়রা জানি পৃথিবীতে প্রাণের প্রয়োজনে জলের কী মর্ম। পৌরাণিক বিশ্বাস—ক্ষিতি (পৃথিবী), অপ্ (জল), তেজ (অগ্নি/আলো), মরুৎ (বায়ু) ও ব্যোম (আকাশ)—এই পঞ্চভূত দিয়ে তৈরি হয়েছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। ঋগ্‌বেদ অনুসারে প্রাণের বিকাশ জল থেকে। 'শীতম্' (শীতল), 'শুচি' (পবিত্র), 'শিবম্' (উপকারি খনিজ ও মৌলিক উপাদান যুক্ত), 'ইষ্টম্' (স্বচ্ছ), 'বিমলম্ লহূ সদ্‌গুণম্' (অল্পতার মাত্রা যেন স্বাভাবিক সীমা না ছাড়ায়), ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের দরুন বিশুদ্ধ জলকে 'দিব্যজল' বলা হত। পাশাপাশি জলের ওষধিগুণও বহুল আলোচিত।

ভূ-পৃষ্ঠের দুই-তৃতীয়াংশ জলবেষ্টিত এবং মানব দেহের ৭৫ শতাংশও জল দিয়ে গঠিত—এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে পৃথিবীতে প্রাণধারণের উপাদানগুলির মধ্যে অন্যতম হল জল। মানবজাতির জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে কালক্রমে সভ্যতার বিবর্তনে জলের অবদান অনস্বীকার্য। কৃষিকার্য ও অন্যান্য প্রয়োজনে আমাদের পূর্বপুরুষরা জলের উৎস সান্নিধ্যে বসতি স্থাপন করেন, এইভাবেই গড়ে ওঠে ছোট ছোট শহর।

আমাদের অর্থনীতিতে এই অমূল্য সম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। শুধু কৃষি, শিল্প, পরিবহণই নয়, অরণ্য, বিনোদন ও পরিবেশের ক্ষেত্রেও জল এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু আধুনিক সমাজ আর আগের মত জলকে জীবনের জিয়নকাঠি হিসেবে মর্যাদা দেয় না। নদ-নদী থেকে সাগর-মহাসাগর, বিশ্বজুড়ে যথেচ্ছ অপব্যবহার ও অবহেলার ফলে জলদূষণ বাড়ছে এবং প্রায় সর্বত্রই বিশুদ্ধ জল দুর্লভ হয়ে উঠছে। গ্রামাঞ্চলের মানুষ, বিশেষত মহিলারা, মূল্যবান শ্রমদিবস গৃহস্থালীর প্রয়োজনে জলের সন্ধানে অপচয় করতে বাধ্য হচ্ছেন। শহরেও প্রায়শই জলের জন্য বিবাদ-বিসংবাদ লেগেই থাকে। খরার সময়ে জলের অভাবে কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদনশীলতা ব্যাহত হয় এবং অনেক সময়ে তা নিরুপায় কৃষকের আত্মহননের রূপ নেয়। আবার ঠিক একইভাবে, বছরের পর বছর ধরে অনেক এলাকাতেই বন্যার প্রকোপে ব্যাপক জীবন ও সম্পত্তি হানি নিয়মিত ঘটনা। এই চরম বৈপরীত্যই এখন আমাদের অর্থনীতির এক নিয়মিত বৈশিষ্ট্য।

যোজনা

পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে সারা দুনিয়ার বিশেষজ্ঞরা জল সংরক্ষণের নিত্যনতুন উপায় খুঁজতে ব্যস্ত। বিভিন্ন দেশের সরকারও জল সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে নীতি নির্ধারণ করতে ব্যস্ত। বন্যা ও খরার জেরে কৃষক ও সাধারণ মানুষকে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তার মোকাবিলার জন্য ভারত সরকারও বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সচেতনতার প্রসার ঘটিয়ে কৃষকদের উন্নতমানের সেচ পদ্ধতি বিষয়ে আগ্রহী করা গেছে। এমনই একটি প্রকল্প হল 'প্রধানমন্ত্রী সিঁচাই যোজনা'। আসন্ন সংকটের মোকাবিলা করতে বৃষ্টির জল সঞ্চয় ও বন্যার জলের ব্যবস্থাপনার মত জল সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে দেশের সর্বত্র ব্যাপকভাবে প্রচার চালানো হচ্ছে।

বৃহত্তর ক্ষেত্রে এক দিকে আশা করা হচ্ছে যে বাস্তুতন্ত্রের স্থিতাবস্থা বজায় রেখেই নদীর সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন নদীর উদ্বৃত্ত জল জলাভাব পীড়িত নদী অববাহিকায় সরবরাহ করে পরিস্থিতির উন্নতি সম্ভব হবে। অন্যদিকে, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সেচের কাজে ব্যবহারের জন্য বড় বড় নদীতে বাঁধ নির্মাণ করে প্লাবনের জল সঞ্চয় করে রাখা যেতে পারে। 'নমামি গঙ্গে' ও 'যমুনা অ্যাক্‌শান প্ল্যান'-এর মত প্রকল্পগুলিকে জলাভাব পীড়িত নদী বাঁচানোর সম্ভাব্য উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এখন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে তৎপর হতে হবে।

হিন্দিতে একটি প্রবাদ আছে "জল হ্যায় তো কাল হ্যায়" (আক্ষরিক অর্থে—জল আছে তো আগামীকাল আছে)—অর্থাৎ, জল যদি থাকে, তবেই আমাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত। সরবে সকলকে বোঝাতে হবে যে জল-চক্র ও জীবন-চক্র এক ও অভিন্ন। তাই, আজ থেকেই চলুন সকলে মিলে জলের প্রতিটি বিন্দু বাঁচিয়ে অমূল্য এই সম্পদ সংরক্ষণে উদ্যোগী হই।❑

অর্থনৈতিক উন্নয়নে জলসম্পদ ব্যবস্থাপনার ভূমিকা

*বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তিধর দেশগুলির মধ্যে ভারতের বিকাশ হার ইদানীং সবচেয়ে বেশি। এই বিকাশ হার বৃদ্ধির জন্য জলের মতো প্রাকৃতিক সম্পদের অবদান যথেষ্ট। আমাদের অদূরদর্শিতার জন্য জলের বিভিন্ন উৎস আজ বিপন্ন। এজন্য দায়ি জলের যথেচ্ছ ব্যবহার ও দূষণ। বিপদ ঘরের দরজায় কড়া নাড়ছে। এখনই সজাগ না হলে জলসংকট আরও ঘোরালো হয়ে উঠবে। মুখ থুবড়ে পড়বে অর্থনীতির বিকাশ—কলমচির আগাম হুঁশিয়ারি। সংকট কাটিয়ে ওঠার সুলুকসন্ধানও আছে আলোচ্য নিবন্ধে লিখছেন—*****সচ্চিদানন্দ মুখার্জি**

ভারতে গড় অর্থনৈতিক বিকাশ ২০০২-'০৩ থেকে এযাবৎ যথেষ্ট উঁচুতে থাকছে। ৭.২৮ শতাংশ।[১] এই বিকাশ শুধুমাত্র স্থায়ী মূলধন (মানুষের তৈরি মূলধন) ভোগ এর মদতে হচ্ছে না। একে সহায়তা জোগাচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদও।[২] পণ্য এবং পরিষেবার পাশাপাশি, উৎপাদন আর ভোগ প্রক্রিয়াও দূষণ ঘটায়। সৃষ্টি করে বর্জ্য পদার্থ। এই দূষণ ও বর্জ্য পদার্থ ছড়িয়ে পড়ে পরিবেশের মধ্যে (বাতাস, জল ও মাটি)। উপকরণ হিসেবে সরাসরি ব্যবহার ছাড়াও, পরিবেশ এই বর্জ্যের ধারক বা আধারের ভূমিকা নেয় এবং দূষণের বোঝা আত্তীকরণ করে। দূষণের ভার এই আত্তীকরণ ক্ষমতাকে ছাপিয়ে গেলে পরিবেশের অবক্ষয় (বাতাস ও জল দূষণ, মাটির অবনয়ন) ঘটে। পরিবেশের এই দাম না চোকানো বাস্তুতন্ত্র পরিষেবা এবং কিছু প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয় (যেমন, বায়ু জল ও মাটি দূষণ) বর্তমান জাতীয় হিসাব ব্যবস্থায় (সিস্টেম অব ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টস) ধরা হয় না। ফলে ভারতীয় অর্থনীতির আদত পরিবেশগত ধার-দেনা বা ঋণের পরিমাণ বোঝা দায়।[৩] অর্থাৎ, মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে জলের মতো প্রাকৃতিক সম্পদের (ক্ষয় ও অবক্ষয় উভয়ই) অবদান হিসাবে আসে না। এবং এর দরুন, দীর্ঘমেয়াদে উচ্চ অর্থনৈতিক বিকাশ অর্জনের সম্ভাবনা ব্যাহত হতে পারে (জল এবং/বা বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্র পরিষেবা লভ্যতার প্রতিবন্ধকতার রূপ নিয়ে) এবং/বা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হতে পারে (জল দূষণের দরুন সমাজের উপর জনস্বাস্থ্য খাতে ব্যয়ের বোঝা চাপিয়ে)। উৎপাদন এবং/বা ভোগ কর্মকাণ্ডের মাত্রার সঙ্গে দূষণ হ্রাস তাল মিলিয়ে না ঘটলে যারপরনাই জলদূষণ ঘটতে পারে। জলদূষণ হেতু ব্যয়ের বোঝা বইতে হয় সমাজকে[৪], জনস্বাস্থ্য বাবদ খরচ (জলদূষণের দরুন রোগবালাই ও মৃত্যুজনিত খরচপাতি)[৫] এবং পরিবেশ অবক্ষয় হেতু (জলদূষণ ও মাটির অবনয়ন) জীবিকাহানির কারণে। ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে রুজি-রোজগারের জন্য বহু মানুষ প্রাথমিক কর্মকাণ্ডের (কৃষি, পশুপালন, মাছচাষ) উপর নির্ভরশীল এখনও। জনস্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ ছাড়াও, পরিবেশ অবক্ষয়ের কারণে রোজগারপাতির এই ক্ষতি এসব দেশের পক্ষে এক বড় মাথাব্যথার বিষয় (মুখার্জি ও চক্রবর্তী, ২০১২)। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও চাহিদার দরুন প্রাকৃতিক সম্পদের এক উৎস এবং বর্জ্য পদার্থের ধারক বা পাত্র হিসেবে ভারতে পরিবেশের ওপর নির্ভরতা বাড়বে আরও। স্থানীয় পরিবেশগত প্রভাব ছাড়াও, ভারতের উপকূলবাসী ৩০ কোটি মানুষের জলবায়ুর রদবদলজনিত বিপন্নতা, বর্ষার অনিশ্চয়তা, হিমবাহের গলন ইত্যাদি আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

শুধুমাত্র জল নিরাপত্তা নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে জল ব্যবহারের মাত্রা; জল পরিবেশের পরিস্থিতি এবং জলসম্পদ ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতাও অর্থনৈতিক বিকাশ ও মানব উন্নয়নে প্রভাব ফেলে (কুমার ও অন্যান্য ২০০৮)। কুমার ও অন্যান্যরা (২০০৮ সাল) দেখিয়েছেন যে জল পরিকাঠামোয় লগ্নি, রীতিনীতি প্রচলন এবং নীতি সংস্কারের মাধ্যমে জল ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি, জল ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য, উন্নত জল পরিবেশ দ্বারা সার্বিক জলসম্পদ পরিস্থিতির উন্নতি একটি দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে সহায়তা করতে পারে। তাদের সমীক্ষায় অবশ্য এটাও প্রকাশ পেরেছে যে জল সংক্রান্ত সমস্যার কিনারায় অর্থনৈতিক বিকাশ এক প্রাক্-শর্ত নয়। বরং, মানব উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক বিকাশ অব্যাহত রাখতে দেশগুলির উচিত জল পরিকাঠামোয় লগ্নি, নীতি সংস্কার করা। গরম ও শুষ্ক ক্রান্তীয় অঞ্চলের দেশগুলিতে আরও দেখা গেছে, বড় মাপের জল সংরক্ষণ প্রকল্পে লগ্নি অর্থনৈতিক বিকাশে সহায়তা জুগিয়েছে। এছাড়াও, এর ফলে কমে অপুষ্টি ও শিশুমৃত্যুর প্রকোপ।

সম্ভাব্য প্রভাবের প্রেক্ষিতে জলসঙ্কটকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিপদ বলে উল্লেখ করেছে ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম (২০১৬ সাল)-এর গ্লোবাল রিস্কস রিপোর্ট। জলের আকালের কয়েকটি মাত্রা আছে—ভৌত,

অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত (জলের গুণমান সম্পর্কিত)। জলের চাহিদা বাড়ার জন্য দায়ি ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, ব্যাপক শহরায়ন, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রসার, ভোগের রকমসকম বদল, জীবনযাত্রার মানের উন্নতি, জলবায়ুর হেরফের, কৃষিতে সেচের বিস্তার, জল বেশি লাগে এমন শস্য চাষের দিকে ঝোঁক ইত্যাদি। জলের টানাটানির বড় কারণ গত কয়েক দশকে মিষ্টি জলের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি এবং চাহিদা ও জোগানের মধ্যে বড়সড় ফারাক। সামাজিক, পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে জলের অনটনের প্রভাব পরিমাপ করা যায়। জল মেলার বার্ষিক খতিয়ান থেকে সে বছরের বিভিন্ন সময়ে জল পাওয়ার বা না পাওয়ার হিসেব করা যাবে না। জলের অনটন এবং সেই সঙ্গে তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব তাই এ খতিয়ান খাটো করে দেখে (মেকনেন ও অন্যান্য, ২০১৬ সাল)। অত্যন্ত ঘনবসতি এলাকা বা সেচসেবিত কৃষি অঞ্চল অথবা এ দুটোই আছে এমন জায়গায় জলসঙ্কট তীব্র। ভারতে গাঙ্গেয় অববাহিকায় জলের জোগান ও ভোগ বিপ্রতীপ। জল যখন মেলে সবচেয়ে কম, তখন তার ভোগ যারপরনাই বেশি (মেকনেন ও অন্যান্য, ২০১৬ সাল)। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০৫ সাল ইস্তক মাসিক জলের জোগানের ভিত্তিতে এক হালফিল হিসেব অনুসারে বছরে নিদেনপক্ষে একমাস তীব্র জলকষ্টে ভোগে বিশ্বের ৪০০ কোটি মানুষ। এদের ১০০ কোটি ভারতের বাসিন্দা। আর গোটা বছর ধরে জলের নিদারুণ টানাটানিতে পড়ে ৫০ কোটি লোক। এদের মধ্যে ১৮ কোটি মানুষের বাস ভারতে। ভারতে সমস্যার ভয়াবহতা এই থেকেই স্পষ্ট।

জল ব্যবহার সবচেয়ে বেশি হয় সেচে। জলের টানাটানি তাই বিশেষ প্রভাব ফেলে কৃষিতে। জলাভাবের তীব্রতার উপর নির্ভর করে কৃষিতে তার কী প্রভাব পড়বে। কৃষির উৎপাদনশীলতা কমলে বা চরম পরিস্থিতিতে ফসল মার খেলে চাষি খোয়ায় তার রুজি। জলের ঘাটতির দরুন জীবিকার ক্ষেত্রে তার প্রভাব অবশ্য সব চাষির ক্ষেত্রে তুল্যমূল্য নয়। জলের অনটন কমানো ও তার সঙ্গে চাষির মানিয়ে নেবার ক্ষমতা বা স্ট্র্যাটেজি এবং সেই সঙ্গে কৃষকের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর এটা নির্ভর করে। শুখা ও আধা-শুখা এলাকায় জলাভাব কমাতে কম জল দরকার এহেন শস্য চাষ বেছে নেওয়ার ভূমিকা যথেষ্ট। জলের দুষ্প্রাপ্যতার প্রভাব কমাতে জল পাওয়া এবং বীজ বোনার আগে খরার সম্ভাবনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারলে কৃষক চাষের জন্য উপযুক্ত শস্য বেছে নিতে পারবে। জলের খামতির সঙ্গে মানিয়ে নেবার জন্য সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে চাষির সামনে উপার্জনের বিকল্প পথ খোলা থাকা। শুধুমাত্র চাষবাসের উপর ভরসা না করে থাকতে পারলে জল সংকটের মোকাবিলা করা চাষির পক্ষে সহজ হবে অনেকটা। কৃষিতে আয় কমলে তার প্রভাব পড়বে অর্থনীতির সব ক্ষেত্রে। অতি খরার দরুন খাদ্যের দাম বাড়লে দেখা দেবে মুদ্রাস্ফীতি। জলাভাবের ফলে বাড়ে আয়ের বৈষম্য। এ কারণে কারখানায় তৈরি জিনিস ও পরিষেবার চাহিদা যায় কমে। দীর্ঘমেয়াদে এই অবস্থা সার্বিক অর্থনৈতিক মন্দার মুখে ঠেলে দিতে পারে।

কলকারখানা ও পরিষেবা ক্ষেত্রে জলাভাবের প্রভাব নির্ভর করে তাদের জল খরচের পরিমাণের উপর। বস্ত্রশিল্প, চামড়া, খাবার ও পানীয় কারখানা, নানান শিল্পে জল লাগে প্রচুর। জলের টানাটানিতে পড়লে এদের ভোগান্তি সবচেয়ে বেশি। পরিষেবা ক্ষেত্রে বেশি নাকাল হয় হোটেল-রেঁস্তোরা, হাসপাতাল এবং নির্মাণ ক্ষেত্র। দক্ষিণ ভারতে কাপড় বোনা ও ছোপানোর তালুকে জল খরিদ করা হয় লাগোয়া গ্রামগুলি থেকে। কৃষির তুলনায় শিল্পে জল ব্যবহার অনেকটা কম হলেও কারখানার নোংরা জল-ময়লা গিয়ে মেশে কাছে পিঠের জমি এবং খালবিল, পুকুর ও নদীনালায়। জলের এই উৎসগুলি দূষিত হয়ে পড়ার দরুন অন্য কাজে তা ব্যবহার করা যায় না। এই দূষণ কমানোর ব্যয়ভার সংশ্লিষ্ট শিল্প ও পরিষেবা সংস্থার দায়িত্ব। খরচ এড়াতে বর্জ্য নিকাশের নির্দিষ্ট বিধিবিধান তারা লঙ্ঘন করে। তারা দায় ঠেলে দেয় সমাজের কাঁধে। এর নিটফল, মাটির নিচে-উপরে জলের দূষণ (মুখার্জি ও নেলিয়াত, ২০০৭)।

মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিরাপদ পানীয় জল মেলা অত্যাবশ্যক (রাষ্ট্র উন্নয়ন কর্মসূচি, ২০০৬ সাল)। ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নত মানের জলের জোগান ও পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থার সুযোগ সবার সামনে এনে দেওয়া স্থায়ী উন্নয়ন লক্ষগুলির অন্যতম। পয়েন্ট (দূষণের একটি চিহ্নিত উৎস) এবং মনপয়েন্ট (দূষণের ব্যাপ্ত উৎস) এই দুই থেকে দূষণের দরুন জলসম্পদ পানের পক্ষে অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। ভাবী প্রজন্মের জন্য পানীয় জলের নিরাপদ উৎস পরিবেশের দিক থেকে টিকিয়ে রাখা তাই খুব দুষ্কর। দূষিত পানীয় জল খেলে মানুষ হরেক জলবাহিত রোগের কবলে পড়তে পারে। জলবাহিত রোগবালাইয়ে মৃত্যু ও অসুস্থতাজনিত খরচ বেশ বেশি। দূষিত জল পানের বিপদ থেকে রেহাই পেতে সরকার এবং লোকজন দূষণ এড়ানোর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে লগ্নি করে—জল পরিশোধন, বিকল্প উৎস, বোতলের জল। গরিব মানুষের বিশুদ্ধ জলের জোগানের নাগাল মেলে না। জল শোধন করার মত ট্যাঁকের জোরও নেই তাদের। দূষিত জল থেকে ভোগান্তি তাদেরই সবচেয়ে বেশি।

চাষবাস, শিল্প ও অন্যান্য কাজে নদনদীর উজানে দেদার জল তুলে নেওয়ায় ভাটির দিকে ব্যবহারের জন্য অবশিষ্ট থাকে অল্পই। গরমকালে আরও বেহাল দশা। পর্যাপ্ত জল না মেলায় বহু নদীতে জলস্রোত হয়ে পড়ে অতি ক্ষীণ। বাস্তুতন্ত্রের মৌলিক কাজকর্ম, যেমন, মাটির নিচে জল ভরা, ভূ-তল ও ভূ-গর্ভস্থ জলের পারস্পরিক নির্ভরতা ব্যাহত হয়। ফলে জলের ক্ষয় আর অবনয়ন ব্যাপক আকার নেয়। ভারতের বহু এলাকায় মাটির

নিচে জলস্তর নেমে যাচ্ছে আশঙ্কাজনক হারে। বছরভর আখ, ধানের মত বেশি জল খরচের চাষে ঝোঁক, মাটির উপরের জলভিত্তিক সেচ ব্যবস্থায় লগ্নির অভাব, খালের জলের জোগানে অনিশ্চয়তা, খালের জল বণ্টনে রাজনৈতিক মাতব্বরি এবং ধনি শ্রেণির কব্জায় রাখার মানসিকতার ফলে সেচের জন্য মাটির নিচের জলের উপর নির্ভরতা বেড়ে চলেছে। ভূ-গর্ভস্থ জল তোলা হচ্ছে নির্বিচারে। নদীর উপর দিকে বৃষ্টির জল জমিয়ে রাখা এবং জলবিভাজিকা প্রকল্পে উৎসাহ জোগান হচ্ছে। এসবের মোদ্দাফল, ভাটির দিকে মাটির নিচে জলস্তর নামছে ক্রমশ (শ্রীনিবাসন ও লেলে, ২০১৬ সাল; পটেল ও অন্যান্য, ২০০৮ সাল)। জলসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ভূ-তল জল ভিত্তিক সেচ ব্যবস্থায় সরকারি লগ্নি বন্ধ করার অদূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি; সেচসেবিত কৃষি ও বিনা দামে বিদ্যুৎ জুগিয়ে ভূ-গর্ভস্থ জল তুলে সেচ ব্যবস্থায় মদত দেওয়া ইত্যাদি বর্তমান জলসঙ্কটের অন্যতম হেতু। সেচসেবিত কৃষি ব্যবস্থা গ্রহণ এবং জল খরচ বহুল শস্য চাষের দিকে ঝোঁকা জলাভাবের সঙ্গে চাষবাসের মানিয়ে নেবার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

এখন, বড় প্রশ্ন উঠে আসছে—(ক) ধান, গম, আখের মত জল খরচ বহুল চাষের দরকার আমাদের আছে কি? ফসল ওঠার পর খোলা মাঠে ফেলে রাখা বা সস্তা দরে তা রপ্তানি করা কতখানি যুক্তিযুক্ত? (খ) দেশের বহু এলাকা তীব্র জলসঙ্কটের কবলে, এহেন পরিস্থিতিতে জলের দাম ধার্যের বর্তমান নীতি কি চালিয়ে যাওয়া হবে? ভারতে জল ব্যবহারে দক্ষতা খুব কম। বিশ্ব গড়ের তুলনায় আমাদের জলের উৎপাদনশীলতা ঢের নিচে। এমনকি, লাতিন আমেরিকা, ক্যারিবীয় এবং সাহারা লাগোয়া আফ্রিকার দেশগুলি থেকেও আমরা পিছিয়ে। জলের দাম থেকে পুরো খরচ উশুল না হওয়া ইস্তক জল ব্যবহারে দক্ষতা বাড়বে না এবং জলের উৎপাদনশীলতা কম থেকেই যাবে।

রেখাচিত্র-১
জলের উৎপাদনশীলতা, মোট মিষ্টি জল উত্তোলন

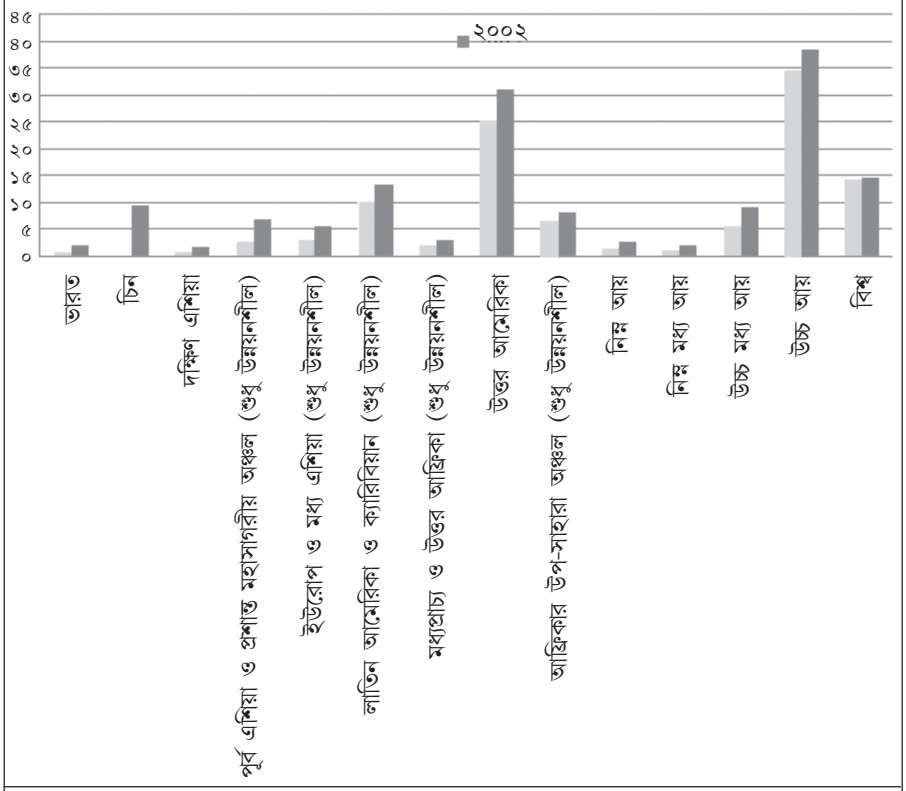

সূত্র : বিশ্ব ব্যাংকের ওয়ার্ল্ড ডেভলপমেন্ট ইন্ডিকেটর ডেটাবেস

জলাভাবের মতই, অর্থনীতিতে বন্যার ধাক্কাও বেজায়। ব্যাপক ফসল, সম্পত্তি এবং জীবনহানি ছাড়াও, বন্যার দরুন জলবাহিত রোগের বাড়াবাড়ি ঘটে। ভারতে নদনদীর অববহিকায় বন্যার আভাস দেবার জন্য সুপরিকল্পিত চর্চার নিতান্ত অভাব। এছাড়া, অর্থনীতিতে বন্যার অভিঘাতের হিসেব-নিকেশ করারও তেমন বালাই নেই। বন্যার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত ব্যয় বন্যা প্রতিরোধ পরিকাঠামো গড়ে তোলার খরচ থেকে ইতরবিশেষ হবে না। বাঁধ ও জলাধারে জল ধরে রাখার সীমিত ক্ষমতা, জলবায়ু পরিবর্তন ও বর্ষার সময় বিস্তর জল নদীতে এসে পড়ায় দেখা দেয় বন্যা পরিস্থিতি। দেশের শহরগুলিতে এখন বন্যা যেন বছরকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্জ্য জল নিকাশের পরিকাঠামো থেকে পৃথক এই বৃষ্টির জলভাসি দশা থেকে রেহাই পাবার পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি তেমন একটা। এমনকি, বর্জ্য জল নিকাশের পরিকাঠামো খুব জুতসই বলা চলে না। শহরের বর্জ্য জল সরাতে রীতিমতো হিমশিম অবস্থা। জল সরানোর প্রাকৃতিক উপায় নদীখাল এবং পুকুর, জলাভূমির মত সনাতন জল ধরে রাখার কাঠামোর ব্যবস্থাপনায় অযত্ন আর অবহেলার দরুন সমস্যা আরও ঘোরালো হয়েছে (শর্মা ও অন্যান্য, ২০১৫ সাল)। মিষ্টি জলের এক মূল্যবান উৎস হল বৃষ্টি। ঠিকঠাক ব্যবস্থা নিলে এই বৃষ্টির জল দূর থেকে জলের জোগানের উৎসের উপর নির্ভরতা কমাতে পারে। আমাদের শহরগুলিতে জলের চাহিদা বাড়ছে অতি দ্রুত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই জল আসে বহু দূর থেকে। সম্প্রতি হরিয়ানার মুনাক খাল থেকে জোগান বন্ধ করায় জলের দারুন হাহাকার বাড়ে দিল্লিতে। এ ঘটনা দেখিয়ে দেয় নিত্যদিনের জলের খাঁই মেটানোর জন্য দূরদূরান্তের উৎসের উপর শহরগুলি কতটা নির্ভরশীল।

জলের জোগান সুরক্ষিত ও তা বজায় রাখতে সমবেতভাবে পরিকল্পিত প্রচেষ্টায় শুধুমাত্র বর্তমান নয়, ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জগুলির কথা মনে রাখা দরকার। আগামী দিনে যেসব সমস্যা নিয়ে ভারতে বেশি করে মাথা ঘামাতে হবে, তার মধ্যে আছে : আন্তঃক্ষেত্র জল বণ্টনের চ্যালেঞ্জ, শহর ও শিল্পের জন্য জল চালান (দূরের উৎস থেকে) দেবার দরুন দ্বন্দ্ব মাথা চাড়া দেওয়া, মৌল বাস্তুতন্ত্র চাঙ্গা করার জন্য নদনদীর স্বাভাবিক জলস্রোত ফিরিয়ে আনা, জলসম্পদের সংরক্ষণ ও সুরক্ষা (নদী উপত্যকা ব্যবস্থাপনা), জলের চাহিদা মেটাতে শহর ও গ্রাম উভয় এলাকাতেই পানীয় জলের স্থানীয় উৎসের সুরক্ষা, শহরায়ন ও জলদূষণের বাড়বাড়ন্ত, উন্নয়ন প্রকল্পের দরুন পরিবেশে অভিঘাত ন্যূনতম করা (যেমন, শিল্প, খনি, পরিকাঠামো ও শহরোন্নয়ন) ননপয়েন্ট উৎসের দূষণ ও নতুন নতুন দূষণ পদার্থ (যেমন, ওষুধপত্র ও প্রসাধন দ্রব্যের অবশেষ, পারফ্লিউয়োবিনেটেড যৌগ) এবং পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর জলবায়ুর রদবদলজনিত অভিঘাত বা প্রভাব ইত্যাদি।❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক নয়াদিল্লির ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক ফাইন্যান্স অ্যান্ড পলিসি-র সহযোগী অধ্যাপক। হায়দরাবাদের ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট ও ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফর নেচার-এর ভারতীয় শাখার সঙ্গে যুক্তি ছিলেন। ইমেল : sachs.mse@gmail.com)

টীকা :

১ মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের কিশ হার (উপাদান মূল্যে) (২০০৪-'০৫ সালের মূল্য স্তরে), ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক, ২০১৪ সাল।

২ ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টস-এর বর্তমান সিস্টেমের রিপোর্টে বলা হয়েছে স্থায়ী মূলধন ভোগ (অবচয়) ২০০২-'০৩ সাল থেকে ২০১৩-'১৪ সালে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (উপাদান মূল্য)-এর ১০.৯৩ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩.১৩ শতাংশে।

৩ ভাবী প্রজন্মের কাছে পরিবেশগত ঋণ বলতে বোঝায় প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষয় ও পরিবেশ অবনয়নের অধীত পরিবেশগত মোট অভিঘাত (ও ই সি ডি)

৪ দূষণ কমানোর ব্যয় এড়িয়ে দূষিত বায়ু, জল এবং বন ও মাটির অবনয়নের প্রেক্ষিতে দূষণকারী ব্যয়ের ভার চাপিয়ে দেয় সমাজের ঘাড়ে।

৫ উদাহরণস্বরূপ ভারতে জলবাহিত রোগ বছরে ১৯৯২ সালের মূল্য স্তরে ৩১০ থেকে ৮৩০ কোটি মার্কিন ডলারের ভার চাপায় (ব্র্যান্ডন ও হম্ম্যান ১৯৯৫ সাল)। বিশ্ব ব্যাংক-এর জল ও স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচির অধুনা এক হিসেব মত ভারতে অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যবিধানের দরুন বছরে আর্থিক ক্ষতি ৫৩৮০ কোটি মার্কিন ডলার। এই অঙ্ক ২০০৬ সালে ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৬.৪ শতাংশের সমতুল।

উল্লেখপঞ্জি :

Brandon, Carter and Hommann, Kirsten (1995), "*The Cost of Inaction: Valuing the Economy-Wide Cost of Environmental Degradation in India*", Paper presented at the 'Modelling Global Sustainability' conference held in United Nations University, Tokyo, October 1995.

Kumar, M.D., Z. Shah, S. Mukherjee and A. Mudgerikar (2008), "*Water, Human Development and Economic Growth: Some International Perspectives*", in the proceedings of the IWMI-Tata Water Policy Research Program's Seventh Annual Partners' Meet, "Managing Water in the Face of Growing Scarcity, Inequity and Declining Returns: Exploring Fresh Approaches", ICRISAT Campus, Patancheru, April 2-4, 2008, Vol. 2, pp. 841-857.

Mekonnen, Mesfin M. and Arjen Y. Hoekstra (2016), "Four billion people facing severe water scarcity", *Science Advances*, Vol. 2, no. 2, e1500323. DOI: 10.1126/sciadv.1500323

Mukherjee, S. and D. Chakraborty (Eds.) (2012), "*Environmental Scenario in India: Successes and Predicaments*", Routledge, U.K.

Mukherjee, S., Z. Shah and M. D. Kumar (2010), "Sustaining Urban Water Supplies in India: Increasing Role of Large Reservoirs", *Water Resources Management*, Vol. 24, No. 10, pp. 2035-2055.

Mukherjee, S. and P. Nelliyat (2007), "*Groundwater Pollution and Emerging Environmental Challenges of Industrial Effluent Irrigation in Mettupalayam Taluk, Tamilnadu*", Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture, IWMI, Colombo, Sri Lanka

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) (undated), "*Glossary of Statistical terms: Environmental Debt*", Available HTTP: <https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=820> (accessed on 9 June 2016)

Patel, Ankit, M. Dinesh Kumar, O. P. Singh and R. Ravindranath (2008), "Chasing a Mirage: Water Harvesting and Artificial Recharge in Naturally Water-Scarce Regions", *Economic and Political Weekly*, Vol. 43, Issue No. 35, 30 Aug, 2008, pp. 61-71.

Reserve Bank of India (RBI) (2014), "*Handbook of Statistics on Indian Economy 2013-14*", RBI, Mumbai.

Sharma, Ashok K., Donald Begbie and Ted Gardner (editors) (2015), "*Rainwater Tank Systems for Urban Water Supply: Design. Yield, Health Risks, Economics and Social Perceptions*", IWA Publishing: London, UK.

United Nations (UN) (undated), 'Sustainable Development Goals', available at: http://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/ (accessed 8 November 2015).

Veena Srinivasan and SharachchandraLele (2016), "Why we must have water budgets", *The Hindu*, 29 March 2016.

Water and Sanitation Program (WSP) (undated), "*The Economic Impacts of Inadequate Sanitation in India*", The World Bank: New Delhi.

World Economic Forum (2016), "*The Global Risks Report 2016 (11th Edition)*", World Economic Forum, Geneva, Switzerland.

জলের জোগান বৃদ্ধি : সংরক্ষণ ও সচেতনতাই শেষকথা

*সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার অভাবই এ দেশে জলসংকটের প্রধান কারণ। না হলে ১,১৭০ মিলিমিটার বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত এবং ছোট-বড় অসংখ্য নদীর আশীর্বাদধন্য এই দেশে 'জলসংকট' অনেকটাই মনুষ্যসৃষ্ট। আবার বিভিন্ন স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সংকট মোচনের চাবিকাঠিও রয়েছে মানুষেরই হাতে। প্রয়োজন শুধু একটু বিচার বিবেচনা। লিখেছেন—***ড. ইন্দিরা খুরানা**

জলের তীব্র অভাবের কারণে বিশ্ব আর এক ভয়াবহ সংকটের মুখোমুখি এবং এই সংকট বিশ্বের শান্তি, নিরাপত্তা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথে বড় অন্তরায়। জলের সংকট আর্থ-সামাজিক বিকাশেও বাধা সৃষ্টি করে। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম (ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম) ২০১৬ সালের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন ঝুঁকি সম্পর্কিত যে প্রতিবেদনটি (গ্লোবাল রিস্ক রিপোর্ট) তৈরি করেছে তাতে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রার নিরিখে প্রথম দশটি ঝুঁকির তালিকার মধ্যে জলসংকট রয়েছে তৃতীয় স্থানে। জলের চাহিদা ইতোমধ্যে মাত্রাছাড়া বেড়ে চলেছে, তারপর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিভিন্ন কারণে জলের জোগান সংক্রান্ত সমস্যা আরও তীব্র আকার নেবে বলে জানানো হয়েছে বিশ্ব ব্যাংকের সাম্প্রতিক এই প্রতিবেদনে।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রায় ৪০০ কোটি মানুষ, অর্থাৎ বিশ্বের মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশকে প্রতি বছর অন্তত এক মাস তীব্র জলকষ্ট ভোগ করতে হয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে জল না পাওয়া গেলে ফসলের উৎপাদনশীলতা কমে যেতে পারে এবং ফসল নষ্টও হয়ে যেতে পারে। এর পরিণামে দেখা দিতে পারে খাদ্য সংকট, মূল্যবৃদ্ধি এবং ক্ষুধার প্রকোপ।

রাষ্ট্রসংঘের মতে ২০৫০ সালে ৯০০ কোটি বা তারও বেশি মানুষের খাদ্যের জোগান দিতে গেলে খাদ্য উৎপাদন ৬০ শতাংশ বাড়াতেই হবে। আবার খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত শক্তিসম্পদ এবং জল। এই দুই পরস্পর বিরোধী চাহিদা মেটানোর চ্যালেঞ্জটাও দিন দিন বাড়বে বই কমবে না। ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বজুড়ে জল সরবরাহের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ ঘাটতি দেখা দেবে। বিশ্বজুড়ে মিষ্টি জলের যা জোগান রয়েছে তার মোটামুটি ৭০ শতাংশই চলে যায় কৃষিক্ষেত্রে। আর দিন দিন বিশ্বজুড়ে মিষ্টি জলের যে সংকট বাড়ছে, তার নেপথ্যে এটাও একটা অন্যতম কারণ। ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বজুড়ে সেচের কাজে জলের ব্যবহার প্রায় ৬ শতাংশ বাড়বে বলে অনুমান।

"২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বজুড়ে জল সরবরাহের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ ঘাটতি দেখা দেবে। বিশ্বজুড়ে মিষ্টি জলের যা জোগান রয়েছে তার মোটামুটি ৭০ শতাংশই চলে যায় কৃষিক্ষেত্রে। আর দিন দিন বিশ্বজুড়ে মিষ্টি জলের যে সংকট বাড়ছে, তার নেপথ্যে এটাও একটা অন্যতম কারণ। ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বজুড়ে সেচের কাজে জলের ব্যবহার প্রায় ৬ শতাংশ বাড়বে বলে অনুমান।"

২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রসংঘ দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের ১৭-টি লক্ষ্য (সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল বা SDG)-সহ ২০৩০ সালের জন্য দীর্ঘস্থায়ী বিকাশের একটি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে ৫ নং লক্ষ্য হিসাবে সকলের জন্য পানীয় জলের জোগান ও স্যানিটেশনের সুযোগ-সুবিধা সুনিশ্চিত করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

ভারতের পক্ষে এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর কাজটা অত্যন্ত কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। তবে তার জন্য যত দ্রুত সম্ভব কিছু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

ভারতে জলসংকটের বর্তমান চিত্র

এ দেশে ২০১৬ সালে যে তীব্র জলসংকট দেখা দিয়েছে তার কিছু নজির এখন আমরা তুলে ধরব।

- তীব্র খরার প্রকোপ পড়েছে ভারতের এক-তৃতীয়াংশ জেলায়। দেশের ১০-টি রাজ্যের ২৫৬-টি জেলার প্রায় ৩৩ কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।
- ২০১৬ সালের মার্চে দেশের ৯১-টি প্রধান জলাধারে সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতার মাত্র ২৪ শতাংশ জল অবশিষ্ট ছিল।
- তীব্র খরা এবং সেই সঙ্গে ঋণের জালে জড়িয়ে কর্ণাটকে ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে প্রায় এক হাজার কৃষক আত্মহত্যা করেছেন।
- গুজরাটে আটটি জেলায় প্রায় ১ হাজারটি গ্রামের মানুষজন তীব্র জলকষ্ট ভোগ করছেন।

● পশ্চিম মহারাষ্ট্রের মিরাজ থেকে জলবাহী ওয়াগনের মাধ্যমে লাতুরের খরা কবলিত এলাকাগুলিতে জল সরবরাহ করা হচ্ছে। জল নিয়ে জনতার সংঘর্ষ বা দাঙ্গা ঠেকাতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে জলের উৎসগুলির চারপাশে মানুষের জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বর্ষা আসার আগে পর্যন্ত কুয়ো বা জলাধারগুলির কাছে একসঙ্গে পাঁচজনের বেশি মানুষের জড়ো হওয়া পুরোপুরি নিষিদ্ধ।

● মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশ জুড়ে বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলের জেলাগুলি এই নিয়ে পর পর তিনবার খরার শিকার হল। এখানকার জলের উৎসগুলির মোটামুটি ৫০ শতাংশই শুকিয়ে গেছে। দূর-দূরান্তে হেঁটে হেঁটে পানীয় জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে মহিলাদের। চাষবাস মার খাওয়ার দরুন ভিটেমাটি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন এখানকার বাসিন্দারা। বাড়ছে দারিদ্র্য আর ক্ষুধার প্রকোপ।

● প্রধান যে চারটি জলাধার থেকে হায়দরাবাদ শহরে জল সরবরাহ হয় সেগুলি সবই শুকিয়ে গেছে।

● পাহাড়ি শহরে তীব্র জলসংকট এবং অপরিস্রুত দূষিত জল সরবরাহের ফলে জন্ডিসের প্রকোপের কারণে খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে হিমাচলপ্রদেশের সিমলা। কর্মীদের হিসেব অনুযায়ী, এই শহরে প্রতিদিন ১ কোটি ৪০ লক্ষ লিটার জলের ঘাটতি থেকে যাচ্ছে, যার মাশুল গুণতে হচ্ছে শহরের স্থানীয় বাসিন্দাদের মোটামুটি ৮০-৮৫ শতাংশকে।

● মহারাষ্ট্রের পুণেতে জলের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে জলের ট্যাংকারই এখন সরকারের ভরসা।

● জলের অভাবে কলকারখানায় উৎপাদনের ক্ষতির খবরও আসছে বিভিন্ন রাজ্য থেকে।

✶ শিল্পনগরী তাজোলাতে সপ্তাহে পরপর দু'দিন উৎপাদন ছাঁটাই করতে হচ্ছে। এখানকার ৬০-৭০ শতাংশ ইউনিটেই উৎপাদনের জন্য প্রচুর জলের প্রয়োজন। এই ইউনিটগুলি রাসায়নিক দ্রব্য, সার, ওষুধপত্র, খাদ্য ও পানীয় এবং ধাতুর জিনিসপত্র উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত।

✶ মহারাষ্ট্রের শোলাপুর ও মারাঠওয়াড়ার প্রায় ১৩-টি চিনিকল বন্ধ হয়ে গেছে। জলের ঘাটতির সময় কাপড়কল ও রঙের কারখানাগুলিতে উৎপাদন বন্ধ করে দিতে হয়।

"১৪-টি বৃহৎ, ৫৫-টি মাঝারি ও ৭০০-টি অতিক্ষুদ্র নদী যে দেশকে বেষ্টন করে রেখেছে, যে দেশে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১,১৭০ মিলিমিটার এবং যে দেশে দীর্ঘদিন ধরে জল সংরক্ষণের প্রথা প্রচলিত, সে দেশে এই দুর্দশা মোটেই কাম্য নয় এবং একটু চেষ্টা করলেই তা এড়ানো যায়। কারণ, জলের অভাব নয়, জলসম্পদ সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতিই আদতে এই দুর্দশার জন্য দায়ি।"

✶ জলসংকটের দরুন পশ্চিমবঙ্গের ফারাক্কাতেও বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে।

বিভিন্ন রাজ্যে তীব্র জলসংকটের ফলে একদিকে যেমন ফসল নষ্ট হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে খাদ্য ও জীবিকার সন্ধানে দলে দলে মানুষ নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন এবং যাচ্ছেন। কখনও বা আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন। বাড়ছে মৃত্যু। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কলকারখানা। বেহাল হয়ে পড়ছে স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রগুলি। জলসংকটের ফলে মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছে সবচেয়ে বেশি। ১৪-টি বৃহৎ, ৫৫-টি মাঝারি ও ৭০০-টি অতিক্ষুদ্র নদী যে দেশকে বেষ্টন করে রেখেছে, যে দেশে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১,১৭০ মিলিমিটার এবং যে দেশে দীর্ঘদিন ধরে জল সংরক্ষণের প্রথা প্রচলিত, সে দেশে এই দুর্দশা মোটেই কাম্য নয় এবং একটু চেষ্টা করলেই তা এড়ানো যায়। কারণ, জলের অভাব নয়, জলসম্পদ সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতিই আদতে এই দুর্দশার জন্য দায়ি।

জলসংকট থেকে উদ্বৃত্ত জলের উল্টো পুরাণ

সুসমন্বিত, ধারাবাহিক এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রচেষ্টার মাধ্যমে খরা প্রতিরোধ তথা উদ্বৃত্ত জল জোগানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যাগুলির মোকাবিলাও করা যাবে এর মাধ্যমে। কিন্তু এই কঠিন কাজে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সহযোগিতা একান্তভাবে প্রয়োজন।

জলের সঙ্গে যে মানুষের ওতপ্রোত যোগ, জল ছাড়া জীবন যে অসম্ভব, সে ব্যাপারে সচেতন করে তুলতে প্রথমেই ধারাবাহিক এবং সর্বাত্মক প্রচারাভিযান চালানো প্রয়োজন। এতে সংশ্লিষ্ট সমস্ত অংশীদার এই বিরল সম্পদ সংরক্ষণের বিষয়টিকে জীবনের একটি আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করতে উৎসাহিত বোধ করবেন। জল সংরক্ষণমূলক কর্মকাণ্ড এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতার প্রসার প্রথম এবং প্রধান পদক্ষেপ। জলসম্পদ পরিচালন ব্যবস্থাপনায় তাদের শামিল করা এবং প্রতিশ্রুতি পালনে তাদের দায়বদ্ধ করে তোলার ওপরও জোর দিতে হবে।

জল সংকট থেকে উদ্বৃত্ত জলের ব্যবস্থা করার এই পথে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি বহুমুখী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। এর মধ্যে বাঁধের মতো সম্পদ সৃষ্টি যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে চাহিদা হ্রাস, বহুমুখী উদ্দেশ্যে জলের প্রতিটি বিন্দুর সদ্ব্যবহার এবং প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর মতো উদ্যোগ। এর কয়েকটি

চিত্র-১
ভারতে জলের জোগান : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

বর্তমান সময়—বেশিরভাগ অঞ্চল খরা কবলিত

২০৩০ সালের মধ্যে ভারতে জলের জোগানের চেয়ে চাহিদা ৫০ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে বলে পূর্বাভাস মিলেছে। শহর ও গ্রামাঞ্চলে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের সমন্বয় ঘটিয়ে তাকে উলটে দেওয়া যায়।

ভবিষ্যতের ভারত

খরা কবলিত

স্বাভাবিক জলের জোগান

নিয়ে আমরা এখানে বিস্তারিত আলোচনা করব।

● **যে পদক্ষেপগুলি অবিলম্বে গ্রহণ করা প্রয়োজন :** বর্তমান সংকটের মোকাবিলায় যে পদক্ষেপগুলি অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে—তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল।

(১) **গ্রামে গ্রামে খরার ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলা কমিটি গঠন :** পঞ্চায়েত সদস্য এবং গ্রামের সংশ্লিষ্ট সমস্ত স্বার্থগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের নিয়ে গ্রামগুলিতে এই কমিটি গঠন করতে হবে। খরা পরিস্থিতির ওপর নজরদারির পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং খরা প্রতিরোধে বিভিন্ন কাজকর্ম পরিচালনার দায়িত্ব নিতে পারে এই কমিটিগুলি।

(২) **আত্মহত্যা বন্ধে প্রতিশ্রুতি আদায় :** দুর্দশাগ্রস্থ গ্রামবাসীদের মনে ভরসা জোগাতে হবে যে, তারা একা নয় এবং সম্মিলিতভাবে তাদের এই মর্মে শপথ নিতে হবে যে কোনও পরিস্থিতিতেই তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নেবে না।

(৩) **যে সমস্ত এলাকায় পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে সেখানে জলের ট্যাংকারের ব্যবস্থা :** গ্রামের প্রত্যেকের কাছে যাতে নিরাপদ ও পরিস্রুত পানীয় জলের জোগান থাকে তা সুনিশ্চিত করতে হবে গ্রামবাসীদেরই। খরার মতো আপৎকালীন পরিস্থিতিতে পানীয় জলের বন্দোবস্ত করার সংস্থান রয়েছে পানীয় জল সরবরাহ ও স্যানিটেশন মন্ত্রকের কাছে। প্রয়োজনে এই ব্যবস্থার সুবিধা নিতে হবে।

(৪) **গবাদিপশু শিবিরগুলির জন্য জল ও পশুখাদ্যের ব্যবস্থা :** প্রকৃতি বিরূপ হলে মানুষ অভাবে পড়ে তাদের গবাদিপশু বিক্রি করে দিতে বা তাদের ফেলে চলে যেতে বাধ্য হয়। কেননা এই গৃহপালিত পশুগুলিকে খাদ্য বা পানীয় জোগানোর সামর্থ্য তাদের আর থাকে না। বুন্দেলখণ্ড অঞ্চল বা রাজস্থানে এরকম ঘটনা হামেশাই ঘটছে। পশু শিবিরগুলিতে পশুখাদ্য ও জলের ব্যবস্থা করা গেলে অভাবে পড়ে গবাদিপশু বিক্রির ঘটনা কমবে।

(৫) **খাদ্যের অধিকার নীতির প্রয়োগ :** গণ বণ্টন ব্যবস্থা এবং খাদ্যের অধিকার নীতির আওতায় গৃহীত অন্যান্য কর্মসূচির নিয়মিত পর্যালোচনার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি মানুষের কাছে যাতে খাদ্যশস্যের জোগান থাকে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। কারণ এটি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ।

(৬) **জল সংরক্ষণ কাঠামোগুলি সংস্কার/পুনরুদ্ধার ও নতুন কাঠামো তৈরি :** মাঠেঘাটে, জনবসতিতে, গ্রাম বা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ঝরে পড়া বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটা কাজে লাগানোর বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে গ্রামবাসীদের মধ্যে। এক ফোঁটা বৃষ্টির জলও যাতে নষ্ট না হয়। বৃষ্টির জল সংরক্ষণের ওপর বিশেষভাবে জোর দিতে হবে। বৃষ্টির জল সংরক্ষণের জন্য বেশকিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। যেমন—

বক্স-১
জল সংরক্ষণের কাজে দেশজুড়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উদ্যোগ

খরা কবলিত বিভিন্ন এলাকায় সেখানকার স্থানীয় জনগোষ্ঠী জল সঞ্চয়, জলের সদ্ব্যবহার ও পুনরুজ্জীবনের কাজে একটা নজির সৃষ্টি করেছে। আর এভাবেই তারা বেছে নিয়েছে নিজেদের সমস্যা সমাধানের পথ। এমনই কিছু দৃষ্টান্তের কথা তুলে ধরা হল এখানে।

- খরা কবলিত বুন্দেলখণ্ড, পারমার্থ অঞ্চলে স্থানীয় নাগরিক সমাজের একটি সংগঠন খরার কবলে পড়া পরিবারগুলির সাহায্যার্থে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এই উদ্যোগের অঙ্গ হিসাবে সংগঠনটি খরায় ঝুঁকি মোকাবিলা তথা বৃষ্টির জল সংরক্ষণের জন্য ১০০-টিরও বেশি পরিকল্পনা রচনা করেছে। সেই সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর যোগসূত্র গড়ে দিয়েছে এই সংগঠন। গ্রামের মধ্যে জল সরবরাহ এবং জল সংরক্ষণের বিভিন্ন উদ্যোগ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে 'জলসহেলি'-দের হাতে।
- অন্ধ্রপ্রদেশের ৭-টি খরাপ্রবণ জেলায় যে অন্ধ্রপ্রদেশ কৃষক পরিচালিত ভূ-গর্ভস্থ জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা (APFAMGS) প্রকল্প রূপায়ণের কাজ চলছে তার আওতায় কৃষকরা নিজেরাই তাদের ভূ-গর্ভস্থ জলসম্পদ ব্যবস্থাপনার কাজে হাত লাগিয়েছেন এবং প্রয়োজন মতো তাদের কৃষিকাজের ধরন বদলে নিয়েছেন।
- কৃষিকাজের জন্য তৈরি পুকুর, চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল জমার জন্য তৈরি জলাধার অর্থাৎ, পারকোলেশন ট্যাংক, চেক ড্যাম এবং ভূ-গর্ভে জলের কাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করে ২০০২ সালে গুজরাটের খরাকবলিত রাজসমাধিওয়ালা গ্রামে বছরে তিনটি ফসলের চাষও সম্ভবপর হয়েছে।
- মহারাষ্ট্রের আহমেদনগর জেলার হিওয়ারেবাজায় গ্রামের বাসিন্দারা শ্রমদান করে জলসম্পদ পরিচালনার একটি সুসংহত ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলেছেন। ২০০৪ সাল থেকে এখানে চালু হয়েছে বার্ষিক জল বাজেটের উদ্যোগ।
- রাজস্থানোর খরা প্রবণ লাপোরিয়া গ্রামে বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য অভিনব এক ধরনের বাঁধের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্থানীয় ভাষায় যাকে বলা হয় 'চৌকা'। এর ফলে পানীয় জল তো বটেই, এমনকী সংরক্ষণের জন্যও জলের জোগান বেড়েছে।

(ক) কৃষকরা তাদের কৃষিজমির চারপাশে 'মেড়বন্ধী' বা আল তুলে দিতে পারেন। এতে জল মাঠের মধ্যেই সঞ্চিত হবে, বাইরে গড়িয়ে যাবে না। এছাড়া বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য রিচার্জ পিট বা ভূ-গর্ভে জল পূরণের জন্য একটা ছোট গর্ত খুঁড়ে রাখা দরকার। খনন কূপগুলিকে আবর্জনামুক্ত রাখতে হবে, যাতে বৃষ্টি এলেই সেখানে জল জমা হতে পারে।

(খ) মোটামুটি সব গ্রামেই অন্তত একটি করে পুকুর, দিঘি, খনন কূপ বা জল সঞ্চয়ের অন্য কোনও কাঠামো যেন অবশ্যই থাকে। এই কাঠামোগুলির অবস্থা খতিয়ে দেখে প্রয়োজন মতো মেরামতি বা এগুলিকে পলিমুক্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে সংশ্লিষ্ট গ্রাম কমিটিকে। সমস্ত খাল, ঝরনা বা নদীকে রক্ষা করতে হবে এবং এগুলিকে ভূ-গর্ভে জল পূরণের মাধ্যম করে তুলতে হবে।

(গ) বৃষ্টির জল সংরক্ষণের জন্য পুকুর, দিঘি ইত্যাদির মতো নতুন কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। বর্ষা আসার পর গ্রামবাসীদের এটা লক্ষ্য রাখতে হবে যে, বৃষ্টির জল ঠিক কোন দিকে গড়িয়ে কোথায় জমা হচ্ছে। তাহলে ভবিষ্যতে তারা সেই মতো বৃষ্টির জল সংরক্ষণের কাঠামো নির্মাণ করতে পারবেন।

মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের (MNREGA) আওতায় বরাদ্দ অর্থ যাতে জল সংরক্ষণ কাঠামো নির্মাণ বা সেগুলিকে পুনরুজ্জীবনের কাজে লাগনো যায় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। এই খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ যাতে গ্রামবাসীদের হাতে সহজ এবং নির্বিঘ্নে পৌঁছায় তাও নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কারণ, এটিও সুপ্রিম কোর্টের একটি নির্দেশ। জল সংরক্ষণের কাজে সাংসদদের স্থানীয় এলাকা উন্নয়ন তহবিল (MPLAD) এবং সরকারের অন্যান্য আর্থিক সহায়তামূলক প্রকল্পের সুবিধাও নেওয়া যেতে পারে।

● **দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন পদক্ষেপ :** জল-সম্পদের উন্নয়নের কাজে বেশকিছু দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা গ্রহণ করাও প্রয়োজন। এর জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা এবং বড় অংকের অর্থের প্রয়োজন। তবে এই কাজও অসম্ভব নয়।

এ দেশের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১১০০ মিলিমিটার এবং বৃষ্টিপাত বেশিরভাগটাই মোটামুটি ১০০ ঘণ্টায়।

"নদীখাতগুলিতে জল পূরণের সুযোগ অনেক বেশি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ জলসম্পদের মধ্যে একটা ভারসাম্য গড়ে উঠবে এবং এর ফলে একদিকে যেমন নদীগুলিতে সারা বছর জল থাকবে, তেমনই অন্যদিকে ভূ-গর্ভস্থ জলস্তরও পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।"

জলের এই প্রাথমিক উৎসকে হয় সরাসরি ব্যবহার করতে হবে নয় তো এই জলের সাহায্যে ভূ-গর্ভস্থ জলস্তর বা ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলাশয়গুলিকে পূর্ণ করতে হবে। বৃষ্টির জলকে যদি ঠিকমতো কাজে লাগানো না যায় তাহলে তার পরিণাম একটাই—বর্ষার মরশুমে বন্যা এবং তারপরের মাসগুলিতে খরা আর জলকষ্ট। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের পথও একটাই—বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা ভেবে বৃষ্টির জল জমিয়ে জলের সঞ্চয় ভাণ্ডার গড়ে তোলা।

বৃষ্টির জল সংগ্রহ, সেই জল পরিস্রুত ও সঞ্চয় করা এবং পারিপার্শ্বিকের নিয়ম অনুযায়ী সেই জল পুনরায় প্রাকৃতিক জলচক্রের মধ্যে ফিরিয়ে দিতে হয়। ভারতের প্রতিটি অঞ্চলেই সেখানকার ভূপ্রকৃতির উপযোগী জল সংরক্ষণের কিছু সনাতন পদ্ধতি রয়েছে। এই পদ্ধতিগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে হবে। এই পদ্ধতিগুলিকে পরীক্ষা করে দেখে সেগুলি অনুকরণ করা যেতে পারে বা বর্তমান সময়ের চাহিদার উপযোগী করে তুলতে সেগুলিতে সামান্য কিছু পরিবর্তন আনতে হতে পারে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠী একযোগে জল সংরক্ষণের কাজে এগিয়ে এসেছেন দেশে এমন দৃষ্টান্ত কম নেই। জল সংরক্ষণের এই উদ্যোগের সঙ্গে কৃষি কাজের ধরনের পরিবর্তন এনে খরার বিপর্যয় তারা এড়াতে পেরেছেন। তাদের অনেকেই এই পদ্ধতি অবলম্বন করে পর পর কয়েক বছর খরার প্রকোপ থেকে বাঁচতে সক্ষম হয়েছেন (বক্স-১ দ্রষ্টব্য)।

কৃত্রিমভাবে জল পূরণের মাধ্যমে ভূ-গর্ভে জলের সঞ্চয় ভাণ্ডার গড়ে তোলা

বর্তমানে যে হারে ভূ-গর্ভে জল পূরণ বা রিচার্জ করা হয়, তার মাত্রা অন্তত পক্ষে দ্বিগুণ করা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক পদ্ধতি তো রয়েছেই, সেই সঙ্গে কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টির জলকে ভূ-গর্ভস্থ জলস্তরের দিকে প্রবাহিত করে অনায়াসে এই লক্ষ্যপূরণ সম্ভব। বৃষ্টির জল সংরক্ষণ এবং কৃত্রিম উপায়ে ভূ-গর্ভে জল পূরণের মাধ্যমে এক সঙ্গে দু'টি উদ্দেশ্য সাধিত হয়। প্রথমত, এর মাধ্যমে একদিকে যেমন প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল শোষণ করে নেওয়া যায়, তেমনি শুখা মরুশুমে এই জল ব্যবহারের পথও খোলা থাকে। বর্তমানে ফাঁকা জমির পরিমাণ ক্রমশই কমছে, বিশেষত শহরাঞ্চলে। এই পরিস্থিতিতে কৃত্রিম উপায়ে ভূ-গর্ভে জল পূরণের ব্যবস্থা জল সংকট মোকাবিলার পাশাপশি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জলের মানোন্নয়নের ক্ষেত্রেও সহায়ক হবে।

কৃত্রিমভাবে ভূ-গর্ভে জল পূরণ এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠস্থ জল

চুঁইয়ে চুঁইয়ে ভূ-গর্ভস্থ জলস্তরে প্রবেশ করে এবং এর ফলে প্রথমত, ভূ-গর্ভস্থ জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতিক ঘনত্ব হ্রাস প্রক্রিয়ার (অ্যাটিনিউয়েশন) মাধ্যমে জলের গুণমান আরও উন্নত হয়। নদী উপত্যকা এবং পাললিক সমভূমি অঞ্চলে অগভীর বালি এবং নুড়ি পাথরের স্তরের মধ্যে দিয়ে নদী বা হ্রদের জল প্রবিষ্ট করিয়েও ভূ-গর্ভের জলস্তর বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা যেতে পারে। নদী উপত্যকা, নল, পরিখা এবং কুয়োর মাধ্যমেও ভূ-গর্ভের জলস্তরে জল প্রবিষ্ট করা যেতে পারে।

ভূ-গর্ভে জলস্তরে কৃত্রিমভাবে ভূ-পৃষ্ঠস্থ জল প্রবাহিত করার কিছু গুণগত এবং কিছু পরিমাণগত সুবিধা রয়েছে। যেমন—

- নদীর যে জল ভূ-গর্ভে ঢুকছে বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় তা থেকে দূষণের মাত্রা কমে যায়।
- নদীর জল ভূ-গর্ভে সঞ্চিত থাকলে নদীর জলের সদ্ব্যবহার সুনিশ্চিত করা যায়। কারণ, নদীতে কোনও সময় কম জল থাকে আবার কোনও সময় বেশি। ভূ-গর্ভে জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা থাকলে এই দু'টি পরিস্থিতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকবে। হয় নদী, নয় তো ভূ-গর্ভের জলস্তর, অর্থাৎ সারা বছর ধরে কোনও না কোনও উৎস থেকে জলের জোগান বজায় থাকবে। সাধারণত কৃত্রিমভাবে পূর্ণ ভূ-গর্ভস্থ জলের ভাণ্ডার ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলের চেয়ে অনেক বেশি নিরাপদ, কারণ এই জলে দূষণের সম্ভাবনা খুব কম। তার ওপর জল সংরক্ষণ এলাকার যে সীমানা বিন্যাস করে দেওয়া হয়েছে, তাতে সংশ্লিষ্ট সীমানার অভ্যন্তরে ভূ-গর্ভস্থ জলে দূষণ ছড়ানোর সম্ভাবনা কমে গেছে।

নদীখাতগুলিতে জল পূরণের সুযোগ অনেক বেশি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ জলসম্পদের মধ্যে একটা ভারসাম্য গড়ে উঠবে এবং এর ফলে একদিকে যেমন নদীগুলিতে সারা বছর জল থাকবে, তেমনই অন্যদিকে ভূ-গর্ভস্থ জলস্তরও পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। দিল্লির জল পর্ষদের 'পাল্লা বন্যার জল পূরণ' কর্মসূচি এমনই একটি উদ্যোগ।

পর্যায়ক্রমে যদি এই জল পূরণের উদ্যোগ হাতে নেওয়া যায়, তাহলে বিপুল পরিমাণে জল সঞ্চয় করা যাবে। ড্যামের মতো কৃত্রিম সঞ্চয় ভাণ্ডার নির্মাণের ক্ষেত্রে অনেক সময় আর্থিক, পরিবেশগত বা সামাজিক সমস্যা এসে পড়ে, কিন্তু ভূ-গর্ভের জলস্তর পূরণের ক্ষেত্রে এমন প্রশ্নই নেই। কারণ, এটি পুরোপুরি একটি 'প্রাকৃতিক' ক্রিয়া। এই কারণেই কৃত্রিমভাবে ভূ-গর্ভের জলস্তর পূরণের যে কোনও উদ্যোগই বিপুল সম্ভাবনাময়।

গ্রাম ও শহরাঞ্চলের একেবারে ছোটখাটো ইউনিট থেকে রাজ্যস্তর পর্যন্ত বৃষ্টির জল সংক্ষণের উদ্যোগ যদি নেওয়া যায়—তার সম্ভাবনাও কিন্তু অপরিসীম (চিত্র-১ দ্রষ্টব্য)।

জল সংরক্ষণে ক্ষেত্রভিত্তিক উদ্যোগ

জল সংরক্ষণে বিশেষ করে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। কৃষিক্ষেত্রেই কিন্তু সবচেয়ে বেশি জলের ব্যবহার হয়।

- **কৃষিক্ষেত্র :** কৃষিক্ষেত্রে জলের ব্যবহার সংক্রান্ত একাধিক বিষয়ে নজর দিতে হবে। যেমন, জল ব্যবহারের ক্ষেত্রে দক্ষতার অভাব, সেচের জন্য ৩৮-৪০ শতাংশ ক্ষেত্রে খাল ও ৬০ শতাংশ ক্ষেত্রে ভূ-গর্ভস্থ জলের ওপর নির্ভরতা, জলের জোগান হ্রাস, জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধি, খাদ্যাভাসে রদবদল, খাদ্যের অধিকার নীতির আওতায় অঙ্গীকার পালনের দায়বদ্ধতা এবং জল পাওয়ার দাবি নিয়ে প্রতিযোগিতা—এগুলিই মূলত কৃষিক্ষেত্রের প্রধান সমস্যা। আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেচের জন্য জলের চাহিদা বৃদ্ধিরও আভাস মিলেছে।

কৃষিক্ষেত্রে জলের যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলি নেওয়া যেতে পারে।

(ক) **পরিমিত জলে চাষ সম্ভব এমন ফসল বাছাই :** আখ বা ধান চাষে প্রচুর পরিমাণে জলের প্রয়োজন। তাই যেসব এলাকায় পর্যাপ্ত জলের জোগান রয়েছে, একমাত্র সেখানেই এগুলির চাষ সম্ভব। এক্ষেত্রে স্থানীয় ফসলের চাষে কৃষকদের উৎসাহ দিতে হবে এবং সেই সঙ্গে এই ধরনের ফসলের জন্য একটা ন্যূনতম মূল্য ধার্য করতে হবে। সেই সঙ্গে এগুলির জন্য বাজার ধরার পাশাপাশি নয়া বিপণন কৌশলও স্থির করতে হবে।

(খ) **ক্ষুদ্রসেচে উৎসাহ দান :** ড্রিপ ও স্প্রিংকলার সেচের ক্ষেত্রে জলের প্রয়োজন হয় অনেক কম। আর এই ধরনের ক্ষুদ্রসেচ পদ্ধতি অবলম্বন করে ৪০ থেকে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত জল বাঁচানো যায়। সেচের সময়সূচি, জমি কর্ষণের ধরন, নতুন বসানো গাছের মূল রক্ষার জন্য গাছের গোড়ায় ভিজে খড়, পাতা ইত্যাদি দেওয়ার প্রক্রিয়া, সর্বোপরি জমির উর্বরতা বৃদ্ধির পদ্ধতি আদতে বাষ্পমোচনের হার বাড়াতে সাহায্য করে। এর ফলে ফসল যেটুকু জল পায় তার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার ঘটাতে পারে। এতে একদিকে যেমন ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, তেমনই অন্যদিকে জলের অপচয়ও রোধ করা যায়।

(গ) **ভূমি ও জলের যথাযথ ব্যবহার :** ভূমি ও জল সংরক্ষণ, শস্যের উপযোগী করে জমি তৈরি, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, কৃষি কাজে যে জল নষ্ট হয় তাকে পুনর্ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা, জমি কর্ষণের ধরনে এমনভাবে বদল আনা যাতে আরও বেশি পরিমাণে জল ভূ-গর্ভে ঢুকতে পারে, জমির চারপাশ দিয়ে জল যাতে গড়িয়ে না যায় তার ব্যবস্থা এবং মাটির আর্দ্রতা বাড়ানোর

সুসংহত ব্যবস্থাপনা এ মুহূর্তে একান্ত প্রয়োজন।

(ঘ) **লেজার প্রযুক্তির ব্যবহার :** উঁচু-নিচু জমিকে সমান করার কাজে এই প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। জমির উপরিভাগ সমান হলে বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম, জমিতে জল দাঁড়ানো বা ফলনের ওপর তার অনেকখানি প্রভাব পড়ে। এতে অন্তত ২০-৩০ শতাংশ জল বাঁচানো যায় এবং ফলনও বাড়ে কম করে ১০ শতাংশ।

(ঙ) **নিবিড় পদ্ধতিতে ধানচাষ :** নিবিড় ধানচাষের পদ্ধতিতে ৮-১২ দিনের মধ্যে মূলত চারাগাছগুলি বাড়ে। ফলে এই পদ্ধতিতে জলের চাহিদা প্রায় ২৯ শতাংশ কমানো যায়। আখচাষের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে।

● **শিল্পক্ষেত্র :** ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি-তে শিল্পক্ষেত্রের অবদান তাৎপর্যপূর্ণ। শিল্পক্ষেত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যম্ভাবীভাবে জলের চাহিদাও বাড়বে। বহুক্ষেত্রে কলকারখানাগুলিতে জলের অপব্যবহার হয়েছে। ছড়িয়েছে দূষণ। তার ফলেই জলের মান খারাপ হয়েছে। দেখা দিয়েছে জলসংকট।

প্রতিকারের পথ হিসাবে প্রথমেই শিল্পমহলের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটানো জরুরি। জল যে এখানে-সেখানে প্রচুর পড়ে থাকা কোন সস্তার সহায়-সম্পদ নয় তা বুঝতে হবে শিল্পকে। কারণ জলের সঙ্গে মৌলিক মানবাধিকার জড়িত এবং রীতিমতো প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হয়ে বহু দাবিদারের মধ্যে থেকে এই সহায়-সম্পদ অর্জন করতে হবে। জলের ওপর নির্ভরশীল শিল্পগুলিকে এখন জলের জন্য স্থানীয় কৃষক, গৃহস্থ পরিবার ও অন্যান্য ব্যবহারকারীদের সঙ্গে রীতিমতো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হচ্ছে।

তবে জলসংকট যেভাবে বাড়ছে সেদিকে লক্ষ্য রেখে শিল্পসংস্থাগুলি তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় জলের ব্যবহার কমাতে উৎসাহী হয়েছে। এটা অবশ্যই আশার কথা। সংস্থাগুলি তাদের 'ওয়াটার ফুটপ্রিন্ট' (কোনও পণ্য বা পরিষেবা উৎপাদন বা সরবরাহে যে পরিমাণ মিষ্টি জল ব্যবহৃত বা দূষিত হয়) কমাতেও এখন অত্যন্ত আগ্রহী। জল ব্যবহারে তাদের বিচক্ষণতা এবং এই মর্মে তাদের পণ্যের শংসাপত্র পেতেও সংস্থাগুলি আজ

"প্রতিকারের পথ হিসাবে প্রথমেই শিল্পমহলের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটানো জরুরি। জল যে এখানে-সেখানে প্রচুর পড়ে থাকা কোন সস্তার সহায়-সম্পদ নয় তা বুঝতে হবে শিল্পকে। কারণ জলের সঙ্গে মৌলিক মানবাধিকার জড়িত এবং রীতিমতো প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হয়ে বহু দাবিদারের মধ্যে থেকে এই সহায়-সম্পদ অর্জন করতে হবে।"

দরবার করছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পসংস্থাগুলির কাছে বেশকিছু বিকল্প রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

(ক) **জলের সদ্ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি :** জলের চাহিদা কমাতে গেলে প্রথমেই জল ব্যবহারের দক্ষতা বাড়াতে হবে, অর্থাৎ যথাসম্ভব কম জল ব্যবহার করে উৎপাদন যথাসাধ্য বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে যদি একটা যুক্তিসঙ্গত নিয়ম মেনে চলা যায় তাহলে শিল্প ইউনিটগুলিতে জলের ব্যবহার অন্তত পক্ষে ২৫-৫০ শতাংশ কমানো যাবে। জলের শীতলীকরণের বদলে বায়ুর শীতলীকরণ প্রযুক্তি গ্রহণ, যে সমস্ত সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি চালাতে বেশি জলের প্রয়োজন সেগুলি বদলে নেওয়া, বর্জ্য জলের রিসাইক্লিং ও শিল্পপ্রক্রিয়ায় তার পুনর্ব্যবহার, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ও তার ব্যবহারের মাধ্যমেও জলের অপচয় রোধ করা যেতে পারে।

(খ) **জীবনচক্র বিশ্লেষণ :** কোনও পণ্যের জীবনচক্রের শুরু থেকে শেষপর্যন্ত (কাঁচামালের আহরণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন উপাদানের প্রক্রিয়াকরণ, উৎপাদন, বিতরণ, ব্যবহার, মেরামতি, রক্ষণাবেক্ষণ ও অপসারণ) বিভিন্ন পর্যায়ে পরিবেশের ওপর কী প্রভাব পড়ছে তা মূল্যায়ন করা যায় এই ধরনের বিশ্লেষণে। 'শুরু থেকে শুরু' ('ক্রেডল টু ক্রেডল') শংসাপত্র পাওয়ার জন্য জল ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ শর্ত পূরণ করতে হয় সংশ্লিষ্ট শিল্পসংস্থাকে। 'ক্রেডল টু ক্রেডল' শংসিতকরণ প্রক্রিয়ার আওতায় 'ওয়াটার স্টেয়ার্ডশিপ' এমন একটি অংশ যে তকমা অর্জন করতে গেলে যেকোনও শিল্প প্রক্রিয়া বা সরবরাহ শৃঙ্খলে জলের অপচয় রোধ করে যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার ঘটাতে হয়। আর সেই সঙ্গে যে পরিবেশে শিল্পটি গড়ে উঠেছে সেই পরিবেশের উন্নতির জন্য পদক্ষেপ নিতে হয়। শংসতিকরণের ক্ষেত্রে পাঁচটি পর্যায় রয়েছে। যথা—প্রাথমিক, ব্রোঞ্জ, রুপো, সোনা এবং প্ল্যাটিনাম। প্রতিটি পর্যায়ে শিল্পসংস্থাগুলিকে জল সদ্ব্যবহারের মাপকাঠি অনুযায়ী বিচার করা হয়ে থাকে।

(গ) **সরবরাহ শৃঙ্খলে জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা :** শিল্পসংস্থাগুলি তাদের সরবরাহ শৃঙ্খলের জন্যও এবার জলসম্পদ ব্যবস্থাপনার উপযুক্ত পরিকল্পনা করছে। যেমন, WWF-এর সহযোগিতায় এইচ অ্যান্ড এম জলসম্পদ ব্যবস্থাপনার কিছু মূলনীতি স্থির করেছে, যার মধ্যে রয়েছে প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম তৈরি, ফ্যাশন সামগ্রী ও আণুষঙ্গিক কাঁচামাল তৈরির সময় পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি সম্বন্ধে নকশা তৈরি ও সোর্সিং-এর সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এর সাহায্যে। এছাড়াও রয়েছে

সংস্থার মালিকানাধীন কেন্দ্রগুলিতে জল সঞ্চয়ের সমস্ত সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা; চিন ও বাংলাদেশ নদী অববাহিকাগুলিতে উন্নততর জলসম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে স্থানীয় ও আঞ্চলিক সরকার, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও অন্যান্য সংস্থা-সহ সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষের হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করা এবং জলসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব সম্বন্ধে উপভোক্তাদের সচেতন করে তোলার মতো উদ্যোগ।

(ঘ) **ক্ষতিপূরণমূলক ব্যবস্থা :** জলসম্পদ ব্যবহারে কুশলতা বা দক্ষতার বৃদ্ধি ঘটিয়ে, সাইক্লিং-এর মাধ্যমে জলকে পুনর্ব্যবহারের উপযোগী করে তোলার পরও যেসমস্ত ক্ষেত্রে জলের ব্যবহার কমানো সম্ভব নয়, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে জলবিভাজিকা উন্নয়ন বা অনুরূপ উদ্যোগে বিনিয়োগের নীতির গ্রহণ করা হয়। ক্ষতিপূরণমূলক ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে বৃক্ষরোপণ বা দূরবর্তী কোনও স্থানে জলসম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগের ধারণা এখন ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

পরিশেষে

এ দেশে জল সংকটের পরিচিত ছবিটা অবশ্যই পাল্টে দেওয়া সম্ভব। তার জন্য দরকার সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা। এতক্ষণ যে ব্যবস্থাগুলি নিয়ে আলোচনা করা হল। তার মধ্যে সবগুলি না হোক কয়েকটিকে অনায়াসেই প্রয়োগ করা যেতে পারে। বৃষ্টির জলকে বর্তমান তথা ভবিষ্যতে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে সমস্ত বিকল্প পথ যদি খোলা রাখা না হয়, তাহলে দেশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নিয়ে হিসেব-নিকেশ অর্থহীন।❑

(**লেখক পরিচিতি :** লেখক আইপিই গ্লোবালের সঙ্গে যুক্ত। ইমেল : dr.indira.khurana@gmail.com এবং ikhurana@ipeglobal.com)
এই নিবন্ধে প্রকাশিত বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, এর জন্য আইপিই গ্লোবাল কোনওভাবেই দায়ি নয়।

তথ্য সূত্র :

1. World Bank. 2016. “High and Dry : Climate Change, Water, and the Economy.” World Bank, Washington, DC.
2. IPE Global and PHDCCL, 2016. Creating water abundance : Towards water security in India
3. Khurana Indira, Sen Romit and Jain Shilpi. 2015. Reflections on Manging Water : Earth’s Greatest Natural Resource. Assam : Ballipara Foundation.
4. https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2016/
5. http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit publicity/Information+and+Publicity/Press+Release/Chief+Minister/Kapil+Mishra-initiates_global-first-of-its-kind+Conserve+and=Use++Palla+Floodplain+Water-Harvesting+Project,+01st+June+2016
6. http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals
7. BBC, 2016. Is India facing its worst-ever water crisis. Onlinehttp://www.bbc.com/news/world-asia-india-35888535 [accessed on 14th April 2016]
8. Indian Express. 2016. Pune water crisis : PMC logs more than 17,000 tanker trips in one month. Online http://indianexpress.com/article/cities/pune/maharashtra-pune-drinking-water-crisis-2754392/ [accessed on 14th April 2016]
9. Indian Express. 2016. After jaundice outbreak, Shimla faces another crisis—that of water. Online http://indianexpress.com/artilce/cities/chandigarh/after-jaundice-outbreak-shimla-faces-another-crisis-that-of-water/ [accessed on 14th April 2016]
10. NDTV. 2016. Water Emergency In Hyderabad, The First In 30 Years. Online. http://www.ndtv.com/telangana-news/water-emergency-in-hyderabad-the-first-in-30-years-minister-ktr-tells-ndtv-1397447 [accessed on June 8, 2016]
11. Times of India. 2016. Only 24% water left in 91 key reservoirs. New Delhi : TOI
12. Times of India. 2016. 1000 Gujrat villages reel under drinking water crisis. Gandhinagar : TOI
13. Times of India. 2016. Water shortage to affect industrial output : Experts. Online http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/Water-shortage-to-affect-industrial-output-Experts/articleshow/51818065.coms {accessed on June 8, 2016]
14. The Economic Times. 2016. Second ‘Water train’ reaches Latur. Online http://articles.economictimes.indiatimes.com/2016-04-14/news/72322756 1 reaches-latur-miraj-wagons [accessed on June 8, 2016]
15. The Indian Express. 2016. Centre to SC : A third of Indian affected by severe drought. Online http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/its-centres-responsibility-to-warn-States-on-drought-supreme-court-maharashtra-latur-water-crisis-2761046/ [accessed on June 8 April 2015]

জলাভাব আর সেচে সরকারি লগ্নি

কিছু ভাবনাচিন্তা ও সুরাহার উপায়

*ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষির অংশভাগ কমছে ক্রমশ। এমন মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মাত্র ১৫ শতাংশের মত আসে কৃষি থেকে। কর্মসংস্থানে কিন্তু এর জুড়ি মেলা ভার। কৃষি থেকে রুজি-রোজগার জোটায় কর্মীবাহিনীর প্রায় ৫০ শতাংশ, ভারতের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব তাই হেলাফেলার নয়। অথচ বেশ কিছুকাল যাবৎ কৃষির বিকাশহার নগণ্য। এর কারণ বিবিধ। এ দেশের চাষবাস এখনও অনেকটা নির্ভর করে বৃষ্টির দয়াদাক্ষিণ্যের উপর। মাত্র ৪৫ শতাংশের মত চাষের জমিতে জোটে সেচের সুযোগ। আজকাল খরা দেখা দিচ্ছে বারবার। খরার আতান্তরে পড়ে কৃষির উপর নির্ভরশীল কোটি কোটি মানুষ। মুশকিল আসানে সরকারের সেচে লগ্নি বাড়ানো জরুরি। এক্ষেত্রে বড় ও মাঝারি প্রকল্পের বদলে ছোট সেচের পক্ষে সওয়াল করেছেন কলমচি—***সীমা বাথলা**

জলের সাংঘাতিক টানাটানিতে ভারত ইদানীং জেরবার। পঞ্চাশ শতাংশের বেশি জেলা ধুঁকছে খরায়। মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, ঝাড়খণ্ড ও তেলাঙ্গানার হাল সবচেয়ে খারাপ। জলের অনটন কোনও অঞ্চলে বেশি, কোথাওবা কম। ফসল, গবাদিপশু এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর জলাভাবের প্রভাবেও তাই আছে হেরফের। তা সত্ত্বেও, কঠিন এই পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার সুলুকসন্ধানে গোটা দেশ এককাট্টা। জলের কষ্টে আতান্তরে পড়েছে প্রায় ৩৩ কোটি মানুষ। শস্যহানির জন্য খরাত্রাণ কর্মসূচি চালু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তীব্র জলাভাবপীড়িত অঞ্চলে রেলপথে পাঠানো হচ্ছে জলের ট্যাঙ্কার। মাটির তলার জল সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সংকট মোকাবিলা করতে রাজ্যগুলি টাকাও পেয়েছে কেন্দ্রের কাজ থেকে।

খরা সমস্যা আজকাল বারবার দেখা দিচ্ছে। কৃষির ক্ষেত্রে এ এক দারুণ দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কেননা জলের প্রায় বারো আনাই লাগানো হয় সেচের জন্য। বৃষ্টির ঘাটতি ও সেই সঙ্গে গরমের জ্বলুনি-পুড়ুনিতে ফসলের দফারফা এবং খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। সেই সঙ্গে দেশে কৃষির উপর নির্ভরশীল বহু মানুষের জীবিকাতে আসবে আঘাত। প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনার আওতায় ছোট ও বড় সেচ প্রকল্পে লগ্নি বাড়ানোর জন্য ইতোমধ্যে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। প্রধানত বড় ও মাঝারি সেচ প্রকল্পে সরকারি লগ্নির ফলে সেচের সুযোগ ও কৃষির উৎপাদনশীলতা বেড়েছে কিনা খতিয়ে দেখা দরকার। না বাড়লে, পথ পালটানোর সময় এসেছে। ছোট এবং অতি ছোট সেচ ব্যবস্থায় লগ্নির প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। বিনিয়োগবাবদ খরচ থেকে আরও উসুল করার উপযুক্ত প্রযুক্তি গ্রহণ করা জরুরি। অপচয় রুখে জলের সুষ্ঠু ব্যবহারের দিকেও নজর দেওয়া চাই। এজন্য জল সংক্রান্ত রাজস্ব নীতি, যেমন—খাল ও মাটির নিচের জল ব্যবহারে লগ্নি ও ভরতুকির ক্ষেত্রে রদবদল আনা দরকার।

এই নিবন্ধে বড়, মাঝারি ও ক্ষুদ্র সেচে সরকারি অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ও এই বিনিয়োগের প্রান্তিক দক্ষতার হিসেব করা হয়েছে। জলের ঘাটতি দূর করার লক্ষ্যে সম্ভাব্য নীতিগত হস্তক্ষেপের বিষয়ে আলোকপাত করা এর উদ্দেশ্য। জল ও কৃষি, এ দু'টি রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়। তাই ১৯৮১-৮২ থেকে ২০১৩-১৪ ইস্তক বড় রাজ্যগুলিতে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে এ দুই ক্ষেত্রের জন্য ব্যয়বরাদ্দে বেশ বড়সড় ফারাক লক্ষ্য করা যায়। তথ্যের উৎস হচ্ছে ভারত সরকারের ফিন্যান্স অ্যাকাউন্টস ও এ্যাগ্রিকালচারাল স্ট্যাটিসটিক্স অ্যাট এ গ্লান্স। সরকারি খরচ সংক্রান্ত বিভিন্ন সময়কালের তথ্য ২০০৪-০৫-কে ভিত্তিবর্ষ ধরে প্রকৃত ব্যয়ে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ফিন্যান্স অ্যাকাউন্টস থেকে পাওয়া বিশদ তথ্যের ভিত্তিতে ভরতুকির হিসেব পাওয়া যায় সেচ ক্ষেত্রে মোট রাজস্ব আয় ও মোট চলতি এবং রক্ষণাবেক্ষণবাবদ ব্যয়ের ফারাক থেকে।

সেচে লগ্নির আন্তঃরাজ্য পার্থক্য ও তাদের দক্ষতা

কৃষির উৎপাদনশীলতা তরতর করে বাড়ানোর জন্য সরকারি ব্যয় প্রায় সব উন্নয়নশীল দেশে এক বড় নীতি ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য হয়। অধিকাংশ গরিব মানুষের ঘর-বসত গ্রামাঞ্চলে। জীবিকার জন্য কৃষি তাদের মূল ভরসা। গরিবি কমাতে তাই খেতখামারে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো এক মস্ত হাতিয়ার (মোসলে, ২০১৫)। প্রতিটি দেশে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও গরিবি কমানোর লগ্নি ও কৃষি উপকরণে ভরতুকি বাবদ সরকারি ব্যয়ের প্রভাবের বেশ ভালোরকম লেখাজোখা ও দলিল-দস্তাবেজ আছে (ফান, ২০০৮)। ভারতে কৃষি গবেষণা বিকাশ, বড়-মাঝারি-ছোট সেচ ও বিভিন্ন উপকরণ বাবদ ভরতুকি সত্তর ও আশির দশকে সবচেয়ে বেশি সুফল দিয়েছে। উচ্চ

ফলনশীল জাতের শস্য চাষ ও সরকারের এই লগ্নির দরুন বেড়েছে বেসরকারি বিনিয়োগ, শস্য উৎপাদন। ঘাটতি মিটিয়ে দেশ খাদ্যশস্যে স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে। নব্বই দশকে সেচে লগ্নি ও ভরতুকির জায়গায় গুরুত্ব পায় সড়ক ও শিক্ষা। ভরতুকি বাবদ ব্যয় লগ্নির দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার পক্ষে জোরাল যুক্তি ছিল (ফান, গুলাটি এবং থোরট, ২০০০)।

দু' হাজার সহস্রাব্দে অবশ্য দীর্ঘদিন যাবৎ চলা অল্পস্বল্প কৃষি বিকাশহার বাড়ানোর জন্য সেচে লগ্নির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। গত শতকের আশি ও নব্বই দশকের ৯৪৪০ কোটি থেকে লাফ দিয়ে প্রকৃত মূল্যস্তরে সেচে লগ্নি দাঁড়ায় ২৪০৪০ কোটি। অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, অবিভক্ত বিহার ও মধ্যপ্রদেশে সেচে লগ্নি বৃদ্ধির হার ছিল বেশি। আগেকার চলমাফিক এই ব্যয়ের মোটা অংশটা (৮১ শতাংশ) যায় মাঝারি প্রকল্পে। আর প্রায় ১৩ শতাংশ ছোট সেচ ব্যবস্থার জন্য। ক্ষুদ্র সেচবাবদ সরকারি ব্যয়ের মধ্যে পড়ে ভূতল ও ভূগর্ভস্থ অর্থাৎ মাটির উপর ও নিচের জল প্রকল্প, যেমন, নদী-খাল থেকে জলসেচ, নলকূপ, কুয়ো, পুকুর ইত্যাদি। সেচসেবিত এলাকার উন্নয়ন বাবদ ১ শতাংশ। বন্যা নিয়ন্ত্রণ খাতে ৫ শতাংশ। সেচখালের জন্য সামান্য কিছু ভরতুকি। ২০০৫-০৬ থেকে মধ্যপ্রদেশ, কেরালা, ওড়িশার পাশাপাশি দেশের উত্তরাঞ্চলের রাজ্যগুলি বড় সেচ প্রকল্পে লগ্নির উদ্যোগ নেয়। এর ফলে সেচ খাতের মোট ব্যয়ে মাঝারি প্রকল্পের মূলধনী ব্যয়ের অংশভাগ কমে দাঁড়ায় ৬২ শতাংশ। এবং বড় প্রকল্পের অংশ বেড়ে পৌঁছয় ১৯ শতাংশে। বড়-মাঝারি প্রকল্পে একত্রে লগ্নি বাড়ে তিন গুণ এবং তা আড়াই গুণ বাড়ে ছোট সেচে। ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের তুলনায় মাঝারি-বৃহৎ সেচ প্রকল্পে লগ্নির বার্ষিক বিকাশহার নিঃসন্দেহে বেশি।

মাঝারি সেচের তুলনায় ছোট সেচে লগ্নি কম। তবে মনে রাখতে হবে মাটির তলা থেকে জল তোলার জন্য চাষিদের জ্বালানি বাবদ ভরতুকি দিতে প্রচুর খরচ করতে হয় সরকারকে। এছাড়া, চাষিদের

সারণি-১
বড়-মাঝারি ও ছোট সেচে সরকারি লগ্নির প্রান্তিক দক্ষতা

রাজ্য	বড়-মাঝারি			ছোট		
	১৯৮১-৮৯	১৯৯০-৯৯	২০০০-১৩	১৯৮১-৮৯	১৯৯০-৯৯	২০০০-১৩
অন্ধ্রপ্রদেশ	০.৭১	০.১৫	২.৩৮	০.১০	০.০৩	০.২৯
অসম	০.০৫	–০.০০২	০.০১	০.০৮	০.০১	০.০৮
গুজরাট	০.৪৩	০.৭৩	০.৯৯	০.০০৩	০.০৭	০.২৯
হরিয়ানা	০.১০	০.০৩	০.০৭	০.০২	০.০১	–০.০২
হিমাচলপ্রদেশ	০.০০৪	০.০০২	০.০১	০.০২	০.০০৩	০.০২
জম্মু ও কাশ্মীর	০.০৩	–০.০৩	০.০১	—	০.০১	০.০৫
কর্ণাটক	০.৪১	০.৫৪	০.৯৯	০.০৮	০.০১	০.২১
কেরালা	০.৩৩	০.৫৮	১.০৩	০.০৬	০.০৩	০.২২
মহারাষ্ট্র	১.৬২	০.৭৭	০.৪৬	০.২৮	০.২৯	০.১২
ওড়িশা	০.৩৭	০.১১	০.০৫	০.০৭	–০.০১	০.২১
পাঞ্জাব	০.০৯	০.১১	–০.০৭	–০.০১	০.০০৪	০.০০১
রাজস্থান	০.৩১	০.১৬	–০.০৩	০.০৬	০.০২	০.০৫
তামিলনাড়ু	০.১৮	০.০৭	০.১৭	০.০১	০.০২	০.০৬
পশ্চিমবঙ্গ	০.১১	০.০৪	–০.০৩	—	০.০৪	০.০২
বিহার-ঝাড়খণ্ড	১.২২	–০.৪৬	০.৪৯	০.০২	–০.০৪	০.১৯
মধ্যপ্রদেশ-ছত্তিশগড়	০.৯৮	–০.০৯	০.৯৩	০.৩৫	–০.০৬	০.৫০
উত্তরপ্রদেশ-উত্তরাখণ্ড	০.৯৪	–০.২২	০.৬২	০.৩৫	–০.২৩	০.২২

টীকা : লগ্নির প্রান্তিক দক্ষতার হিসাব করা হয়েছে ক্রমবর্দ্ধমান মূলধন-উৎপাদন অনুপাতের ভিত্তিতে।

মূলধনী সরঞ্জাম কেনার জন্য ভরতুকি ছাড়া ছোট সেচ ব্যবস্থার বরাতে রাজ্যের প্রত্যক্ষ লগ্নি জোটে না বললেই চলে।

সেচে লগ্নির হার বেশ মোটা পরিমাণের মনে হলেও, সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে মোট বিনিয়োগ ও ব্যয়ে (মূলধনী + রাজস্ব) এর অংশ যাচ্ছ কমে। প্রতিটি রাজ্যেই এই এক কাহিনী। গত শতকের আশির দশকে, ১৭-টি বড় রাজ্যে সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ খাতে সরকারি লগ্নি ছিল মোট বিনিয়োগের ৫০ শতাংশ। নব্বই দশকে তা কমে দাঁড়ায় ৪১ শতাংশে। দু' হাজার সহস্রাব্দে আরও কম ৩২ শতাংশ। এই সময়কালে, মোট ব্যয়ে সেচের অংশভাগ ৬.৯ শতাংশ থেকে নেমে আসে ৪.২ শতাংশে। সেচ ও সেই সঙ্গে কৃষি উন্নয়নে রাজ্যগুলি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব দেওয়ায় খাল থেকে চাষের জমিতে আরও জল জোগানোর দিকটি উপেক্ষিত হয়েছে। কৃষিতে উৎপাদনশীলতার ক্রমাবনতির এ এক অন্যতম কারণ।

সেচে সরকারি লগ্নির ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বড়সড় ফারাকও চোখে পড়ে বৈকি! অপেক্ষাকৃত সচ্ছল রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাত, কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্র সেচবাবদ হেক্টরপিছু খরচ করে ২০০০ টাকা। বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান এবং ওড়িশার মত কম আয় ও কৃষিপ্রধান রাজ্যের তুলনায় এই ব্যয় বেশি। হিমাচলপ্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীর, কেরালা ও পাঞ্জাব ছাড়া বেশ কয়েকটি রাজ্যে হেক্টরপিছু ভরতুকি ১০০০ টাকার কম (রেখাচিত্র-১ দ্রষ্টব্য)।

লগ্নি বাড়ার ফলে ইদানীং কয়েক বছর ওড়িশা, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাত এবং কর্ণাটকে খালসেচের এলাকা বেড়েছে। দেশে ২০০০-০১ সালে সেচবাবদ ব্যয়ের অংক ছিল ১০,৪০০ কোটি টাকা। ২০১৩-১৪ সালে তা দাঁড়ায় ৩৪০০০ কোটি টাকায়। এতটা ব্যয় বাড়ার প্রেক্ষিতে খালসেচের এলাকা বৃদ্ধির পরিমাণ নগণ্য। এছাড়া, মূলত চাষির মালিকানাধীন নলকূপের তুলনায় সরকারি খাল থেকে সেচের সুযোগ মেলা জমির এলাকা ঢের ঢের কম।

সরকারি হিসেব মোতাবেক, দেশে সেচের সম্ভাবনা আছে ১৩ কোটি ৯৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে। এর মধ্যে ৫৪ শতাংশ জমিতে সেচের সুবিধে মিলবে ভূতল বা মাটির উপরের জল থেকে। বাদবাকি ৪৬ শতাংশের উৎস হবে মাটির নিচের জল। এযাবৎ সেচের সুযোগ পাচ্ছে সাকুল্যে মাত্র ৬ কোটি ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার হেক্টর জমি। যা কিনা, মোট চাষের জমির ৪৫.৫ শতাংশ। ভাবগতিক তাই খুব নৈরাশ্যজনক। সবচেয়ে বেশি, ৬১.৭ শতাংশ সেচ হয় নলকূপ থেকে। খালের অংশভাগ ২৬.৩ শতাংশ। পুকুর থেকে সেচ মেলে ২.৫৯ শতাংশ। বাদবাকিটা অন্যান্য উৎস থেকে। ২০০০ সহস্রাব্দে সেচসেবিত এলাকা সাড়ে পাঁচ কোটি হেক্টর থেকে বেড়ে হয়েছে ৬ কোটি ২ লক্ষ ৫০ হাজার হেক্টর। তাজ্জব ব্যাপার, সেচের সুবিধে পাবার এলাকা এতটা বৃদ্ধি নাকি মূলত 'অন্যান্য উৎস'-এর অবদান। খালের দ্বারা সেচসেবিত এলাকার প্রসার প্রায় থমকে থাকায় পরিস্থিতিটা এক বিপদ সংকেত। সেচের উৎস হিসেবে রাজ্যগুলির বড় ভরসা নলকূপ (রেখাচিত্র-২ দ্রষ্টব্য)।

লগ্নি তো বাড়ন্ত, সেই সঙ্গে বড় বড় প্রকল্প সম্পূর্ণ করতে অযথা কালক্ষেপহেতু রাজ্যগুলি সেচের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পিছিয়ে পড়ছে। বড়-মাঝারি ও ছোট সেচে পৃথকভাবে লগ্নির প্রান্তিক দক্ষতার (মারজিনাল এফিশিয়েন্সি অফ ইনভেস্টমেন্ট-এমইআই) দশকওয়াড়ি হিসেব তুলে ধরা হয়েছে সারণি-১-এ। গত শতকের আটের দশকে এই এমইআই ছিল বেশ উচ্চ। নয়ের দশকে তা যথেষ্ট নেমে যায়। গুজরাত ও কেরালা ছাড়া সব রাজ্যেই। ২০০০ সহস্রাব্দে অবশ্য অবস্থার বেশ উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষত অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, কেরল, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশে। ক্ষুদ্র সেচে এমইআই অপেক্ষাকৃত ভালো এবং প্রায় সব রাজ্যে উন্নতি ঘটেছে। মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা ও পঞ্জাব অবশ্য এব্যাপারে দলছাড়া।

কৃষির উৎপাদনশীলতায় সরকারি ব্যয়ের প্রান্তিক দক্ষতার চড়া পতন নিয়ে বাথলা ও অন্যান্যের পর্যবেক্ষণের সঙ্গে এই ফলাফলের তালমিল আছে। নয়ের দশকে লগ্নির প্রান্তিক

রেখাচিত্র-১
সেচে হেক্টরপিছু লগ্নি ও ভরতুকি (টাকা গড় ২০০০-১৩)

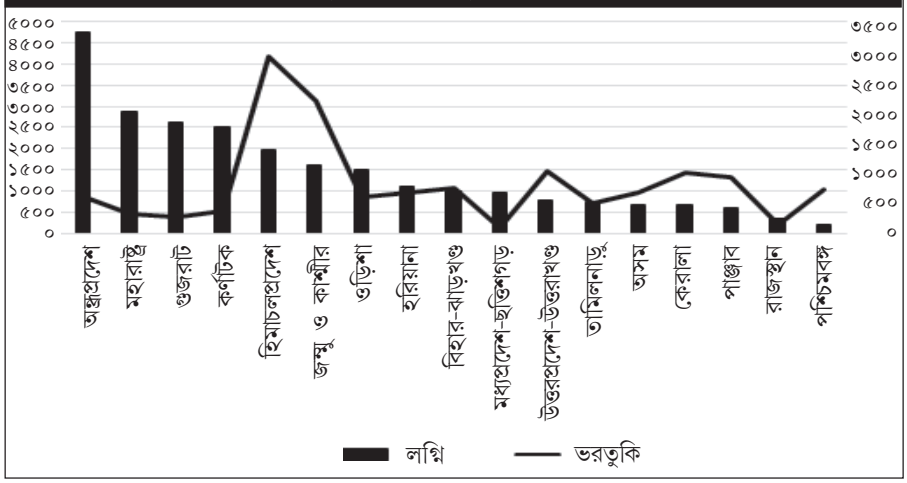

লাভ ছিল ১.৪১। ২০০০ সহস্রাব্দে তা নেমে দাঁড়ায় মাত্র ০.১২ শতাংশে। ব্যক্তিগত মালিকানার নলকূপে লগ্নির ক্ষেত্রে কিন্তু ছবিটা বিপরীত। এক্ষেত্রে প্রান্তিক লাভ চারগুণ বেশি। আরও দেখা গেছে, মাঝারি ও বড় সেচ প্রকল্পের তুলনায় ছোট প্রকল্পে সেচ ক্ষমতা সৃষ্টির অনুপাত ঢের বেশি। নীতি প্রণেতাদের অবশ্যই উচিত ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে অগ্রাধিকার দেওয়া। কেননা, কুয়োয় ফের জলভর্তি, খরার প্রকোপ কমানো ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প পালন করে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। এজন্য গ্রামাঞ্চলে শক্তি ক্ষেত্রে লগ্নি বাড়ানো আবশ্যক। এর পাশাপাশি, মাটির নিচের জল অত্যধিক তুলে ফেলা আটকাতে কিছু নীতি নিয়ন্ত্রণ এবং বাধা-নিষেধ থাকাও জরুরি।

অগ্রগতির হালহকিকৎ

স্বাভাবিক বর্ষার আভাস থাকায়, আবহাওয়া দপ্তরের রিপোর্ট খতিয়ে দেখে মনে করা হচ্ছে এ বছর কৃষি খরা পরিস্থিতি সামলে নিতে পারবে। আপাত ঠেকানো অবশ্য বড় কথা নয়, চাই দীর্ঘস্থায়ী সমাধান। প্রথম কথা, বড়-মাঝারি সেচ প্রকল্পে সরকারি লগ্নি থেকে প্রত্যাশিত রিটার্ন বা সুফল মিলছে না। রাজ্যগুলিকে তাই চলতি প্রকল্প দ্রুত সম্পন্ন করতে ও লগ্নির দক্ষতা বাড়াতে অবশ্যই তৎপর হতে হবে। সম্ভাব্য সব ক্ষেত্রে মাঝারি-বড় সেচ থেকে সম্পদ সরিয়ে এনে তা বরাদ্দ করতে হবে ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র সেচে। জল ব্যবহারে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বিন্দু ও ছিটানো (ড্রিপ অ্যান্ড স্প্রিংকলার) সেচের মত ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থায় লগ্নি বাড়ানো দরকার। বিশেষত, আখ ও কলার মত সেচবহুল চাষে জল খরচ বাঁচাতে বিন্দু ও ছিটানো সেচ খুব কার্যকর। এই সেচের বিকাশে রাজ্যগুলি নানাভাবে চেষ্টা চালাচ্ছে। দিচ্ছে ভরতুকি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই সেচ খুব একটা বিস্তার লাভ করেনি। এই সেচ চালু হয়েছে পাঁচ শতাংশেরও কম চাষের জমিতে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, জল খরচ বাঁচাতে, চাষের খরচ কমাতে ও ফলন বাড়াতে ক্ষুদ্র সেচ বেশ কাজের। তবে এই প্রযুক্তি বিস্তারের পথে বাগড়া দিচ্ছে গোড়ার দিকে চড়া মূলধনী ব্যয়, ভরতুকি মেলার হ্যাপা, ছোট জোত ইত্যাদি ইত্যাদি। সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে ভরতুকি চাষিদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক সময়ে ভরতুকি না মিললে বা বড় চাষিরা তাতে থাবা বসালে সহায়সম্বলহীন লক্ষ লক্ষ ছোট ও প্রান্তিক চাষির পক্ষে এই প্রযুক্তির নাগাল পাওয়া শক্ত। ক্ষুদ্র সেচ সংক্রান্ত জাতীয় মিশনকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

সেচ ও বিদ্যুতে ভরতুকির বাড়তি খরচে কৃষি উৎপাদনশীলতা বাড়ে। সেই বৃদ্ধি অবশ্য ভরতুকির ১০০ শতাংশ রিটার্নের চেয়ে কম। ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কিন্তু ভরতুকি তুলে দিয়ে সরকারি সেই ব্যয় লগ্নির ক্ষেত্রে বরাদ্দ করা প্রায় অসম্ভব বলে

রেখাচিত্র-২
খাল ও নলকূপ থেকে সেচপ্রাপ্ত এলাকার শতাংশ (টাকা গড় ২০০০-১১)

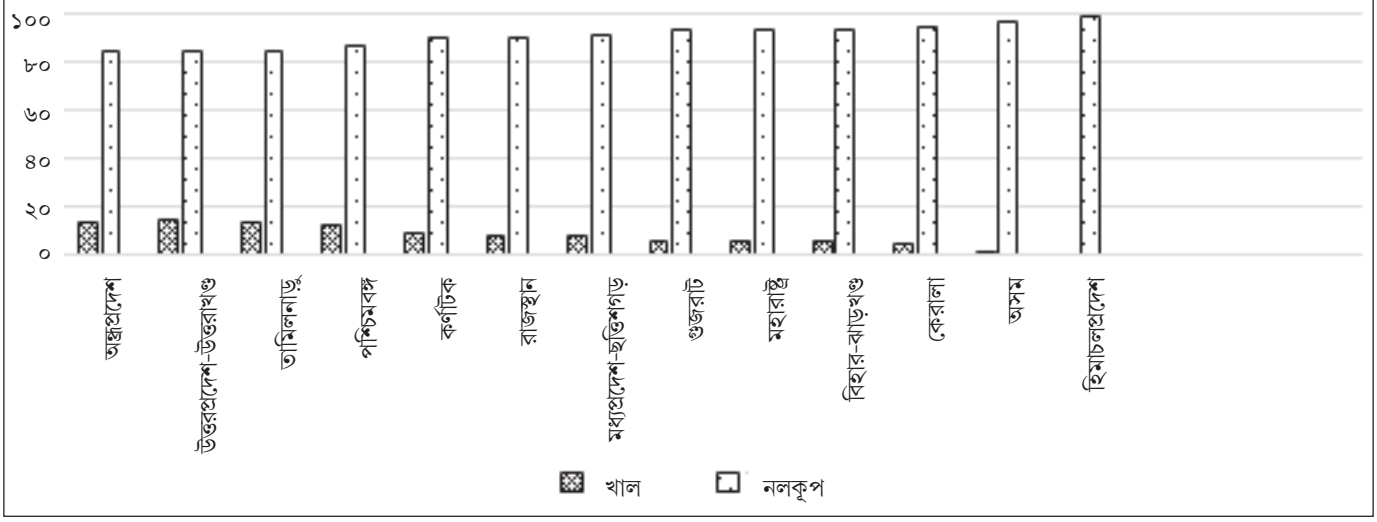

মনে হয়। এছাড়া, কৃষিপ্রধান কিছু গরিব রাজ্য উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য চাষিদের উৎসাহিত করতে ভরতুকিকে সহজ পথ মনে করে। অতিরিক্ত জল খরচে লাগাম টানার জন্য ওই সব রাজ্য ও চাষিদের মধ্যে ভরতুকি বণ্টন যুক্তিসংগত করা দরকার। আরও কয়েকটি ব্যবস্থার পরামর্শ দিয়েছেন গুলাটি (২০১৬)। যেমন, খালের জল ও বিদ্যুতের জন্য মিটার বসানো, জল ও বিদ্যুৎ ব্যবহার কমালে চাষিদের ইনসেনটিভ দেওয়া। আরেক বিকল্প হল, বেশি জ্বালানিব্যয়ী পাম্পসেট বদলে ফেলা। জ্বালানি সাশ্রয়ী পাম্পসেট বসাতে পারলে প্রায় ৩০ শতাংশ শক্তি বাঁচানো সম্ভব। সবশেষে, জল সরংক্ষণের গুরুত্ব সবিশেষ উল্লেখ্য। জল সংরক্ষণ প্রচেষ্টা জোরদার করতে বাড়াতে হবে উপযুক্ত প্রযুক্তির প্রয়োগ। এর পাশাপাশি, কম জলে উৎপাদনক্ষম ও খরা সইবার উপযুক্ত শস্য চাষের প্রসার ঘটলে সংকট মোকাবিলা করা সহজ হবে।

বৃষ্টির জল ধরে রাখা ও জল ব্যবস্থাপনার জন্য এক বড় প্রকল্প 'কাকতিয়া' শুরু করেছে নবগঠিত রাজ্য তেলাঙ্গনা। এই প্রকল্পের আওতায় পুরনো পুকুর ও হ্রদ সংস্কার করে আগের চেহারায় ফিরিয়ে আনার কাজ চলছে। বৃষ্টির জল জমিয়ে রাখার জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা পেতে ইজরায়েলের সঙ্গে ভারতের চুক্তি এক্ষেত্রে এক সঠিক পদক্ষেপ। আমাদের প্রধানমন্ত্রী চান, আরও বেশি জমিতে সেচের সুযোগ, কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি বজায় রাখা ও কৃষি আয় দুগুণ বাড়ানো। উপরে উল্লিখিত উদ্যোগগুলি রূপায়িত হলে এসব ক্ষেত্রে অনেকটা এগোন যাবে। এখন দরকার, ঠিক সময়ে লগ্নির জন্য রাজ্য সরকারগুলির তরফে জোরাল অঙ্গীকার এবং এই কাজকে মিশন বা ব্রত হিসেবে নেওয়া।❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক অধ্যাপক, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, নয়াদিল্লি। ইমেল : seema.bathla@gmail.com)

তথ্যসূত্র :

Bathla, S., (2014) Public and Private Capital Formation and Agricultural Growth: State-wise Analysis of Inter-linkages during Pre- and Post-reform Periods. *Agriculture Economics Research Review,* 27(1), Jan-June.

Bathla, S. Bingxin Y, Thorat S.K. and Joshi. P.K. (2015), Accelerating Agricultural Growth and Poverty Alleviation through Public Expenditure: The Experience of India, Paper presented at International Conference of Agricultural Economists, July 29, Milan, Italy.

Fan, S. (2008) (Ed.) *Public Expenditures, Growth and Poverty: Lessonsfrom Developing Countries.* Oxford University Press, New Delhi.

Fan, S., Gulati, A., Thorat, S.K., (2008) Investment, Subsidies and Pro-poor Growth in Rural India. *Agricultural Economics,* 39: 163-170.

Government of India, National Accounts Statistics (various issues), Central Statistical Organisation.

Government of India. Agricultural Statistics at a Glance (various issues), Ministry of Agriculture.

Government of India, (various issues), Finance Accounts, Ministry of Finance.

Gulati, Ashok, *C::016)* From Plate to Plough: Drop by careful drop May 9, The Indian Express.

Mosley (2015), The Politics of what Works for the Poor in Public Expenditure and Taxation in S.Hickey et al. (ed), *The Politics of Inclusive Development: interrogating the Evidence,* Oxford University Press.

Viswanathan, P. K., Kumar, M. Dinesh, Narayanamoorthy, A. (Eds.) (2016), *Micro irrigation Systems in India: Emergence, Status and Impacts.* Springer.

2nd Edition

প্রকাশিত হল WBCS SCANNER

বইটি সম্পাদনা করেছেন সামিম সরকার

WBCS ২০১৫ প্রিলিম পরীক্ষায় **WBCS SCANNER** থেকে ৬০ টির ও বেশি প্রশ্ন কমন। প্রথম সংস্করনের দ্রুত নিঃশেষের কারণে এবং ছাত্র ছাত্রীদের অনুরোধে সম্পূর্ণ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত রূপে দ্বিতীয় সংস্করন প্রকাশ হল —

বইটির বৈশিষ্ট্য —●৪৫০০+ প্রশ্ন-উত্তর।●বিগত ১৮ বছরের ডব্লুবিসিএস প্রিলির প্রশ্নের সমাধান।●বিগত বছরের প্রশ্নের সমস্ত অপশনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যা বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় এসেছে। ●প্রতিটি বছরের প্রশ্নের বিষয় ভিত্তিক এবং টপিকভিত্তিক বিশ্লেষণ।●কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্টাডি-ম্যাট। ●কি চাইছে প্রিলিম? ● নেগেটিভ নিয়ন্ত্রণের উপায়। ●মডেল মকটেস্টের সেট। ●মেনস্- এর প্রশ্নপত্রের সমাধান বাংলা এবং ইংরেজি পত্র সহ (২০১৪ এবং ২০১৫)।

প্রাপ্তিস্থান: কলেজস্ট্রীট - শপ নং -১০, কলেজ স্কোয়্যার (সাউথ) (14A, সূর্যসেন স্ট্রীটের বিপরীতে)

কলকাতা-৭০০০১২ ফোন : 7031842001

WBCS-2014 একটি মাত্র সেন্টার থেকে সফল ১২০ জনেরও অধিক।

After qualifying Mains, I was a little bit tensed, confused to be more accurate, as it was my first interview of any kind. This hazziness led me to knock the doors of Academic Association. The mock interviews of Academic were very helpfull and made it easier for me to shrugg off blurry nervousness, dodge a dubious questions, not lose my cool. I am throughly thankfull to Academic Association for my success.

– Suprakash Das, DSP(Rank-10), WBCS - 2014

Only two attempts were left when I decided to appear at W.B.C.S Examination. ACADEMIC ASSOCIATION played a pivotal role in building my self confidence through mock tests and mock interviews.I sailed for through this exam on my first attempt thanks to this institutes proper guidance. My message to future aspirants is remain focussed, believe in your self and enjoy the preparation phase.

– Arindam Datta, Food & Supply(Rank- 10), WBCS - 2014

Interview is required to asses the personality of the Individual and to determine whether he is fit for the job. Interview does not actually need any preparation. Its all about the mind set. Take it not as an interview but as a discussion where you want to show your views/opinions along sides logical rationals.

Read news papers have opinions. Flash smile always and show them that you are actualy enjoying it.

– **Mohtashim Akhtar, DSP(Rank-06),** WBCS-2014

I had a dream and I fulfilled it. My journey from a humble family boy to a part of Bureaucracy has been a saga of incessant struggle for a rightful achievement. Those people who played the magnetic role in my success are firstly my parents who sacrified a lot. I secondly my friends who helped me in need and the third and most important-my teachers and last but not the least in the Midas - touch of Academic Association. Right from the beginning to the end I was associated directly or indirectly with this institute and specially Samim Sir which provided me the right road-map to get into WBCS(Exe). I express my heartfelt gratitude to this institute for their WBCS-oriented mock-tests and mock-interviews.

– **Subhajit Jana**, Executive -WBCS 2014

পোস্টাল কোর্স

দূরবর্তী ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে আমাদের **'Inclusive Postal Course'** । পাবেন প্রিলি ও মেনসের প্রতিটি বিষয়ের ওপর কমনযোগ্য উৎকৃষ্ট মানের নোটস। সঙ্গে থাকছে অজস্র ক্লাশ টেস্ট এবং মকটেস্ট। **নোটসগুলি তৈরি করেছেন ডব্লুবিসিএস বিশেষজ্ঞরা এবং সম্পাদনা করেছেন সামিম সরকার।** মেদহীন, টু দ্য পয়েন্ট, আপ-টু-ডেট এবং কোয়ালিটি নোটসগুলি আপনার সাফল্যকে সুনিশ্চিত করবে। সঙ্গে থাকছে বেশ কিছু ক্লাস করার সুযোগও। **কোয়ালিটির সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করতে না চাইলে আপনার নিশ্চিত গন্তব্য হবে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন।**

৫০% নেই?? বি এড নেই?? বি কম পাশ??
SSC-এর দরজা বন্ধ??
WBCS এর দরজা খোলা সবার জন্য
WBCS-2017-এর নতুন ব্যাচ শুরু হচ্ছে শীঘ্রই।
এখানে পাবেন **WBCS** টপারদের টিপস এবং বিশেষ স্ট্রাটেজিক ক্লাশ।

WBCS-2016 মেনস মক্ টেস্ট

কোর্সটিতে আছে —● ১০০ নম্বরের৩০টি মক টেস্ট ● ৪০-৫০ টি ক্লাস টেস্ট ●সম্পূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স নোটস্ ● সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এবং ই.ভি.এস-এর নোটস্ ● সামিম স্যারের স্ট্র্যাটেজি ক্লাস।

WBCS - 2016 মেনস ক্লাব

যারা এবার মেনস্ দেবেন, তারা মাত্র ৪০০ টাকার বিনিময়ে নিতে পারেন মেনস ক্লাবের সদস্যপদ। এতে পাবেন— ●সম্পূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ●WBCS অফিসারদের দ্বারা সম্পাদিত Sci & Tech এবং EVS স্টাডি ম্যাট ● কিছু মকটেস্ট ও কিছু মক ইন্টারভিউ দেওয়ার সুযোগ।

Academic Association

The Self Culture Institute, 53/6 College Street (College Square), Kolkata - 700073

✆ 9674478644
✆ 9038786000

Website : www.academicassociation.in■Centre: ✸Uluberia-9051392240✸Barasat-9800946498 ✸Birati-9674447451✸Berharampur-9474582569✸Darjeeling-9832041123✸Midnapur-9474736230

বন্যা ব্যবস্থাপনা : বাঁধ ও জলাধারের ভূমিকা

ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু এবং বৃষ্টিপাতের প্রকৃতির মধ্যে ব্যাপক তারতম্য লক্ষণীয়। এ দেশের বিপুল আয়তন এবং অঞ্চলভেদে বিবিধ ভৌগোলিক ও অবস্থানগত বৈচিত্র্যের দরুনই এমনটা হয়ে থাকে। কাজেই, দেশের একাংশ যখন ভয়াবহ বন্যা কবলিত, ঠিক তখনই অন্য অংশ খরার প্রকোপে ধুঁকছে—মোটেই বিরল ঘটনা নয়। অনেক সময় এমনটাও দেখা যায় যে, বছরের একই সময়ে একটি রাজ্যের মধ্যেই একাংশ প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে বন্যা কবলিত, অন্য অংশ অনাবৃষ্টির কারণে খরা পীড়িত। সুতরাং, ভারতে জলসম্পদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর অসম বণ্টন। উপরন্তু, বন্যাকালীন পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠছে। নদী অববাহিকা অঞ্চলে মানুষের দখলদারিজনিত কর্মকাণ্ডের দরুন। আমাদের জলসম্পদের যথাযথ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় আমরা যে কার্যত ব্যর্থ—দেশে ঘন ঘন খরা এবং বন্যা পরিস্থিতির মাধ্যমে তা প্রতিফলিত। কীভাবে জলাধার ও বাঁধের পরিকল্পিত নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ বন্যার প্রকোপ হ্রাসে সহায়ক হয়ে উঠতে পারে তা নিয়ে বর্তমান নিবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন—**এম. এস. মেনন**

বিশ্বের জনসংখ্যার ১৬.৯ শতাংশের বাস ভারতে। এদিকে মোটের উপর বিশ্বের মোট জলসম্পদের মাত্র চার শতাংশ এবং ভূখণ্ডের মাত্র আড়াই শতাংশ আছে ভারতের দখলে। আবার যদি এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত মিষ্টি জল (fresh water) সম্পদের পরিমাণের দিকে নজর দিই—তবে অঞ্চলভেদে বেশ তারতম্য চোখে পড়ে। অর্থাৎ, দেশের কোনও কোনও অঞ্চলে ব্যাপক পরিমাণে মিষ্টি জল পাওয়া যায়, কোথাও কোথাও পরিমাণে তা বেশ কম, কোথাও বা জলের চূড়ান্ত অভাব। পাশাপাশি বছরের বিভিন্ন সময়েও প্রাপ্ত জলের পরিমাণে উল্লেখযোগ্য ফারাক চোখে পড়ে। একই অঞ্চলে বছরের বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে মিষ্টি জলসম্পদ পাওয়া যায়। ভারতের জনসংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে এবং এই বিপুল সংখ্যক মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় জলের চাহিদাও দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে। জনসংখ্যার বেশ উল্লেখযোগ্য একটি অংশ উন্নতমানের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত এবং সেই সংখ্যাটিও ক্রমবর্ধমান। একারণেও জলের চাহিদা হু হু করে বাড়ছে। এদিকে প্রায় প্রত্যেক বছর বন্যা ও খরার কারণে জীবনহানি এবং জনবসতির চরম ক্ষয়ক্ষতি হয়েই চলেছে। এসবই এক অর্থে জলসম্পদ ক্ষেত্রের সামনে বেশ বড় মাপের চ্যালেঞ্জ বিশেষ। পাশাপাশি, পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বিঘ্নিত না করে দীর্ঘস্থায়ীভাবে (অর্থনৈতিক) বৃদ্ধি হার ধরে রাখাটা সুনিশ্চিত করাও এ দেশের জলসম্পদ ক্ষেত্রের সামনে অত্যন্ত কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

খরা ও বন্যার সমস্যা

ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৪ হাজার বিলিয়ন ঘনমিটার (Billion Cubic Metres) বারিধারাপাত হয়ে থাকে। এদিকে এ দেশের নদীগুলিতে গড়ে বার্ষিক (জল) প্রবাহের যে হিসাব পাওয়া যায় তা হল, মাত্র ১৯৫৩ বিলিয়ন ঘনমিটার (BCM)। দু'টি পরিসংখ্যানের মধ্যে এই বিশাল তফাতের কারণ দ্রুত বাষ্পীভবন এবং মাটির আর্দ্রতা। দেশের এক-তৃতীয়াংশ ভৌগোলিক অঞ্চল অধিকার করে আছে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা (GBM) নদী অববাহিকা এবং দেশের মোট দুই-তৃতীয়াংশ জলসম্পদই এই নদী অববাহিকা অঞ্চলের অবদান। অতএব বাদবাকি ভূখণ্ডকে অবশিষ্ট পরিমাণ জলসম্পদ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এদিকে, বর্ষা মরসুমে জুন থেকে সেপ্টেম্বর—এই চার মাসেই দেশের নদীগুলিতে ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ বারিধারা প্রবাহিত (run-off) হয়। সুতরাং, ভরা বর্ষায় মিলছে পর্যাপ্তের থেকেও অনেক বেশি পরিমাণ জল, যা কার্যত বিবিধ ক্ষয়ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং গরমকালে তীব্র জলসঙ্কট। বৃষ্টিপাতের এই ধরনধারণ এবং প্রকৃতিগত পরিবর্তনে কোনও রদবদল ঘটানো তো সম্ভব নয়; কাজেই হয় আমাদের একে নিয়তি বলে মেনে নিতে হয়, অথবা এর থেকে পরিত্রাণের ফন্দি-ফিকির খুঁজে বার করতে হয়। আগেই বলা হয়েছে যে, এ দেশে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের সিংহভাগ হয় মাত্র কয়েক মাসে এবং কার্যত তার দরুনই সারা বছরের জন্য জল মেলে। কাজেই বর্ষা মরসুমে অতিরিক্ত এই জলকে যদি জলাধারে জমা রেখে সারা বছর ধরে প্রয়োজন মাফিক ছাড়া হয়, নিঃসন্দেহে তা ভয়াবহ খরা ও বন্যার হাত থেকে নিস্তার পেতে সহায়ক হবে।

ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু এবং বৃষ্টিপাতের প্রকৃতির মধ্যে ব্যাপক তারতম্য লক্ষণীয়। এ দেশের বিপুল আয়তন এবং অঞ্চলভেদে বিবিধ ভৌগোলিক ও অবস্থানগত বৈচিত্র্যের দরুনই এমনটা হয়ে থাকে। কাজেই, দেশের একাংশ যখন ভয়াবহ বন্যা কবলিত, ঠিক তখনই অন্য অংশ খরার প্রকোপে ধুঁকছে—মোটেই বিরল ঘটনা নয়। অনেক সময় এমনটাও দেখা যায় যে, বছরের একই সময়ে একটি রাজ্যের মধ্যেই একাংশ

প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে বন্যা কবলিত, অন্য অংশ অনাবৃষ্টির কারণে খরা পীড়িত। সুতরাং, ভারতে জলসম্পদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর অসম বণ্টন। বছরের একেক সময় দেশের একেক জায়গায় এর পরিমাণ একেক রকম। অর্থাৎ, জলসম্পদের খামতি বা বাড়তি পরিমাণ এক স্থানীয় তথা বিক্ষিপ্ত সমস্যা।

উপরন্তু, বন্যাকালীন পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠছে নদী অববাহিকা অঞ্চলে মানুষের দখলদারিজনিত কর্মকাণ্ডের দরুন। এ ধরনের কার্যকলাপের ফলে, উচ্চ অববাহিকা অঞ্চলে যেসব খাত বেয়ে বৃষ্টির জল (উপর থেকে) নদীতে এসে পড়ে, সেগুলির অবনয়নের দরুন নদীর জলের সঙ্গে অধিক পরিমাণে পলি বাহিত হচ্ছে। এই পলি জমে জমে নদীর নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলে জলধারণ ক্ষমতা যথেচ্ছ হ্রাস পাচ্ছে তথা বন্যা পরিস্থিতি তীব্র আকার ধারণ করছে। সেখানে জনবসতিগুলিতে ঘটছে জীবন ও সম্পত্তি হানি।

আমাদের জলসম্পদের যথাযথ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় আমরা যে কার্যত ব্যর্থ—দেশে ঘন ঘন খরা এবং বন্যা পরিস্থিতির মাধ্যমে তা প্রতিফলিত। একথা নতুন করে আর বলার প্রয়োজন নেই যে, বাস্তুতন্ত্রের একটি অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল জল। অথচ, খরার প্রকোপে দেশের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল ধুঁকতে না থাকলে অথবা বিপুল পরিমাণ এলাকা ও জনবসতি বন্যা কবলিত হয়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি না হওয়া পর্যন্ত 'জল' নিয়ে আমরা মোটেই মাথা ঘামাই না। আবার এরকম সঙ্গিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে, অতীতের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে উপযুক্ত দীর্ঘস্থায়ী কোনও সমাধানের পথে হাঁটি না। বরং ক্ষতিগ্রস্থ মানুষজনের কাছে সামান্য কিছু ত্রাণ পৌঁছে দিয়ে পরের বছর আবার একই সঙ্গিন পরিস্থিতির সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত ইস্যুগুলি দিব্যি ভুলে মেরে দি।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনায় অতীত উদ্যোগ

গত শতকের পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে বন্যা ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন প্রথম অনুভূত হয়। ১৯৫৪ সালে চালু হয় জাতীয় বন্যা ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি। সেসময় সর্ব মোট প্রায় ৬ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে প্রায় ৩ মিলিয়ন হেক্টর এলাকাকে বন্যার হাত থেকে সুরক্ষিত করা হয়। ১৯৫৪ সালে যে নীতি এজাহার (Policy Statement) তৈরি করা হয়,তাতে জাতির সামনে লক্ষ্য রাখা হয়—বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশকে বন্যার প্রকোপ থেকে মুক্ত করা। যাই হোক পরবর্তীকালে এটা বোঝা গিয়েছিল যে, বন্যার ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে সম্পূর্ণ পরিত্রাণ পাওয়া বাস্তবে সম্ভব নয়। এর জন্য একদিকে যেমন দায়ি পূর্বানুমান করা যায় না এমন কিছু (অপ্রত্যাশিত প্রাকৃতিক বিপর্যয় জাতীয়) ঘটনাক্রম; তার সাথে মানুষের অবিবেচক কিছু কর্মকাণ্ড যুক্ত হয়ে পরিস্থিতি যারপরনাই ঘোরালো হয়ে পড়ে। তাই সে পথে না হেঁটে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, বন্যাগ্রস্ত বসতি ও মানুষজনকে যথাসম্ভব সুরক্ষাকবচ দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হবে। প্রায়োগিক দিক থেকে বাস্তবসম্মত এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে যুক্তিসঙ্গত হতে হবে এই সুরক্ষাকবচ। এজন্যই বন্যা ব্যবস্থাপনার সাথে সাথে বন্যার পূর্বাভাস, বন্যা সতর্কতা জারি ইত্যাদির উপর প্রভূত জোর দেওয়া হয়।

সংশ্লিষ্ট ইস্যুগুলি পর্যালোচনার জন্য জাতীয় এবং রাজ্যস্তরে বেশ কিছু সংখ্যক কমিটি গঠন করা হয়। শেষপর্যন্ত ভারত সরকার ১৯৭৬ সালে রাষ্ট্রীয় বাঢ় (বন্যা) আয়োগ (RBA) নামে একটি সংস্থা তৈরি করে। ১৯৫৪ সাল থেকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা পেতে যেসব উদোগ গ্রহণ করা হয়েছিল, সেগুলির পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন করার ভার দেওয়া হয় এই সংস্থাকে। দেশের জলসম্পদের সর্বোচ্চ এবং বহুমুখী সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে বন্যা সমস্যার সমাধানে একটি ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রয়োজন অনুসারে রদবদল ঘটাতে পরামর্শদানেরও দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। আয়োগ গঠনের সময় বন্যাপ্রবণ বলে চিহ্নিত করা হয় ৩৪ মিলিয়ন হেক্টর এলাকাকে। এর মধ্যে ১০ মিলিয়ন হেক্টর এলাকায় আগে থেকেই বন্যার হাত থেকে রক্ষা পেতে যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করা হয়ে গিয়েছিল। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদী অববাহিকা অঞ্চল এবং উপদ্বীপীয় নদীগুলির উপকূলবর্তী ব-দ্বীপ—মূলত এই দুই অঞ্চলে বেশি সংখ্যক বন্যাপ্রবণ এলাকা রয়েছে। আয়োগ বেশ কয়েকটি সুপারিশ করে। দেখা যায়, কোনও কোনও নির্দিষ্ট এলাকা প্রায় প্রতি বছরই বন্যা কবলিত হয় এবং সেসময় ওইসব এলাকা থেকে মানুষজনকে সরিয়ে নিয়ে যেতে তথা তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হয় নিয়মিতভাবে। এজন্যই আয়োগ বন্যাপ্রবণ সমতল অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করা ও বন্যার পিছনে মানুষের যেসব কর্মকাণ্ড অনুঘটকের কাজ করে তা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিবিধ সুপারিশ করে।

পরবর্তীকালে, ১৯৯৬ সাল নাগাদ কেন্দ্র কয়েকটি আঞ্চলিক টাস্ক ফোর্স বা কর্মীগোষ্ঠী গঠন করে। রাষ্ট্রীয় বাঢ় আয়োগের সুপারিশগুলির প্রভাব পর্যালোচনা করার জন্য এবং কিছু স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্যসাধক পন্থাপদ্ধতি/ উদ্যোগ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্যই এই সব টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়। টাস্ক ফোর্সগুলি বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক পন্থাপদ্ধতির পাশাপাশি বড়মাপের বেশকিছু প্রকল্প (Flood moderation project) নির্মাণের সুপারিশ করে; বিশেষত দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। একইসাথে বন্যাপ্রবণ এলাকায় মানুষের দখলদারি জাতীয় কর্মকাণ্ডের উপর লাগাম পরাতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বন্যাপ্রবণ সমতল অঞ্চল সংক্রান্ত আইন (Flood Plain Zoning Act) কার্যকর করতেও বলা হয়।

১৯৯৯ সালে জলসম্পদ সংক্রান্ত জাতীয় আয়োগ বা National Commission for Water Resources আরও লক্ষ্য করে যে, জলাধার (storage dam) এবং বাঁধ (embankment) বিশালাকার বন্যাপ্রবণ এলাকাকে কার্যকর সুরক্ষা প্রদান করতে পারে। বন্যা প্লাবিত এলাকায় মানুষের দখলদারি জাতীয় কর্মকাণ্ড প্রতিহত করতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে "Flood Plain Zoning Act" লাগু করা জরুরি বলেও এই আয়োগ সুপারিশ করে।

২০০৪ সালে গঙ্গা নদী এবং ব্রহ্মপুত্র নদে নজিরবিহীন বন্যার ঘটনা কেন্দ্রকে বন্যা

প্রতিকারের উপায় বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করতে বাধ্য করে। এই কর্মীগোষ্ঠী বন্যা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত উদ্যোগগুলি ফলপ্রসূ করতে কেন্দ্রকে আরও বেশি করে ভূমিকা নিতে সুপারিশ করে। পরিকল্পনা কমিশনের পরিচালন গোষ্ঠীও তখন কেন্দ্রের আরও বেশি হস্তক্ষেপের উপর জোর দেয় এবং একটি কেন্দ্রীয় বন্যা ব্যবস্থাপনা সংস্থা গঠনের কথা বলে।

২০১২ সালে জাতীয় জল নীতিতে জলাধারগুলি (reservoir)-তে জল জমা ও ছাড়ার বিষয়ে এমন পন্থাপদ্ধতি অনুসরণ করার সুপারিশ করা হয় যাতে তা বন্যা প্রতিরোধে তথা বন্যার মরসুমে পলি জমার পরিমাণ হ্রাস করতে কার্যকর হয়। এতে সম্ভাব্য জলবায়ু পরিবর্তনের কথা মাথায় রেখে বিবিধ চূড়ান্ত কৌশল অবলম্বনেরও পরামর্শ দেওয়া হয়। যেমন—জলাধারগুলির জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

বন্যার ক্ষয়ক্ষতি প্রশমন কর্মকাণ্ড

নদী তার খাত উপচে তীরভূমি তথা প্রান্তিক এলাকা জলপ্লাবিত করার কারণেই মূলত বন্যার নিমিত্ত ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। এই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমাতে বন্যা রোধের বিবিধ পন্থাপদ্ধতি হাতে নিয়ে হবে। এর মধ্যে পড়ছে বন্যা প্রবাহ (Flood flows) অর্থাৎ, যে অতিরিক্ত পরিমাণ জল প্রবাহের কারণে বন্যা হয়, তা জমা রেখে নিয়ন্ত্রণের জন্য জলাধার (storage dam) নির্মাণের মতো কাঠামাগত পন্থাপদ্ধতি। তথা বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে নদীর জল প্রবাহকে লাগাম পরানো, যাতে খাত উপচে নদী তীরবর্তী এলাকা জলপ্লাবিত না হয়। সংশ্লিষ্ট এলাকার খালসমূহের সংস্কারসাধন এবং জল নিকাশী ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটালে তা বন্যা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হতে পারে। কিছু কিছু এলাকায় (জল) নিকাশী সমস্যা তীব্র হওয়ায় সেই সব অঞ্চলে বাঁধ নির্মাণ বাঞ্ছনীয় নয়। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলির পৃষ্ঠতল উঁচু করে নিকটবর্তী সড়কে সংযুক্ত করার জন্য প্রকল্প হাতে নিতে এবং রূপায়িত করতে হবে।

১৯৫৪ সালে জাতীয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (National Flood Control Programme) চালু হওয়ার পর থেকেই বড় মাপে বন্যা নিয়ন্ত্রণ উদ্যোগ হাতে নেওয়া হয়। সেই সময় থেকে এযাবৎ ৩৫ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি দীর্ঘ বাঁধ নির্মাণ হয়েছে এবং ৩৯ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি দীর্ঘ জল নিকাশী নালার সংস্কারসাধন করা হয়েছে। এছাড়াও ৭ হাজারেরও বেশি গ্রামের পৃষ্ঠতল উঁচু ও সুরক্ষিত করা হয়েছে। এ ধরনের আরও বিবিধ সুরক্ষা কার্যের আওতায় আনা হয়েছে আরও অন্তত ২৭০০ শহর/গ্রামকে। এই সময়পর্বে বেশকিছু সংখ্যক জলাধারও নির্মাণ করা হয়েছে। যেগুলির সম্মিলিত সর্বোচ্চ জলধারণ ক্ষমতা প্রায় ২৫০ বিলিয়ন ঘনমিটার (BCM)।

জলাধারের সাহায্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ামন

শুধুমাত্র বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য নিয়ে জলাধার নির্মাণ করা হলে বছরের বিভিন্ন সময়ে কী পরিমাণ জল তাতে সঞ্চিত রাখা হবে, সে ব্যাপারে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে কাজ করতে হবে। নদীতে যেসব মাসে জলের প্রবাহ বেশি,তখন জলাধারে কম পরিমাণে জল ধরে রাখতে হবে। জলাধারের ধারণ ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে হবে ভবিষ্যতে বন্যাকালীন অতিরিক্ত জল প্রবাহকে জমা রাখতে। একবার বন্যা পরিস্থিতি কেটে গেলে, ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় জল ছেড়ে জলাধারের জলস্তর হ্রাস করে পরের বছরের বন্যার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যাই হোক, কেবল বন্যা পরিস্থিতি সামলে দেওয়ার জন্য এ ধরনের প্রকল্প সাধারণত আর্থিক দিক থেকে যুক্তিগ্রাহ্য নয়। অন্যদিকে, সেচ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যেসব বহুমুখী প্রকল্পের পরিকল্পনা করা হয়, তার সাথেই বন্যা নিয়ন্ত্রণের সুবিধাদি জুড়ে নিলে কাজের কাজ হয়। প্রাথমিক উদ্দেশ্য যদি কেবল সেচ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়—তবে সেপ্টেম্বর নাগাদ যাতে জলাধারে তার ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী সর্বোচ্চ পরিমাণ জল জমিয়ে ফেলা যায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। যদি বন্যা নিয়ামন-সহ বহুমুখী উদ্দেশ্য-সাধক প্রকল্প পরিকল্পনা করা হয়, তবে জলাধারকে সুপরিকল্পিতভাবে কাজে লাগিয়ে সম্ভাব্য যাবতীয় প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে সর্বোচ্চ লাভ ওঠানোর দিকে নজর দিতে হবে। এক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে প্রকল্পের ঘোষিত উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রেত সুফল। কাজেই, বর্ষা মরসুমে বন্যা সমস্যার মোকাবিলা করতে অর্থনৈতিক দিকে থেকে যুক্তিসঙ্গত একটি সমাধানপন্থা হল বিষয়টিকে সেচ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া। অর্থাৎ, বন্যাকালীন অতিরিক্ত জলকে সঞ্চিত রেখে বৃষ্টিহীন মরসুমে সেচের কাজে ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে তার যথাযথ ব্যবহার। এভাবেই কোনও ঘোষিত সেচ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পও বন্যার প্রকোপ নিয়ামনে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে—(নদীতে) উচ্চ জল প্রবাহকালীন সময়পর্বে জলাধারে উদ্বৃত্ত জল জমিয়ে রেখে।

তবে সমস্যাও রয়েছে। পরিকল্পিত বা অপরিকল্পিত যেভাবেই হোক, যখন একটি বহুমুখী প্রকল্প অধীন জলাধারকে বন্যা প্রকোপ নিয়ন্ত্রণের কাজে ব্যবহার করা হয়, প্রায়শই সংশ্লিষ্ট (প্রকল্প) কর্তৃপক্ষ কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হন। বিশেষত, সেপ্টেম্বর মাসে— যাকে বলা হয় জলাধারের 'Filling season'-এর শেষপর্বে যদি বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রে জল প্রবাহের পূর্বাভাস-এর উপর ভিত্তি করে তথা সুবিবেচনা মতো কর্তৃপক্ষ যদি উচ্চ জলাধারের জল স্তর কমিয়েও রাখেন, তাহলেও সমালোচনার সম্ভাবনা থেকেই যায়। কারণ, যদি পরে প্রয়োজনীয় জলস্তর বাড়িয়ে নেওয়া সম্ভব না হয় তথা ফলস্বরূপ (সেচ ও বিদ্যুৎ) চাহিদা পূরণে ঘাটতি থেকে যায়। একইভাবে, যদি কর্তৃপক্ষ জলাধারের জল স্তর আগেই যথেষ্ট কমিয়ে না রাখেন, তবে বন্যা পরিস্থিতির মুখে অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত জল ধারণ করতে না পারায় নদীর নিম্ন অববাহিকা অঞ্চল বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এক্ষেত্রেও সমালোচনার মুখে পড়ার সমান সম্ভাবনা। বৃহৎ বাঁধ নির্মাণের বিরোধী—এমন স্বনিয়োজিত প্রতিবাদীর সংখ্যাটা এ দেশে নেহাৎ কম নয়। এরা তৎক্ষণাৎ ঘটনাটিতে 'মনুষ্য সৃষ্ট বন্যা' আখ্যা দিয়ে সংশ্লিষ্ট (জল)

পেশাদারদের আক্রমণে ময়দানে নেমে পড়েন। এরকম বহু 'কেস' দেখা গেছে, যেখানে বাঁধ প্রকল্পে এরকম পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহি করতে তলব পর্যন্ত করা হয়েছে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণে সুফলদায়ী কিছু বড় মাপের প্রকল্প

আগেই বলা হয়েছে, ১৯৫৪ সালে জাতীয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি চালু হওয়ার পর থেকেই বড় মাপে বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হতে থাকে। তখন থেকেই বাঁধ নির্মাণ, নদীখাতের/খালের সংস্কারের পাশাপাশি বহু জলাধারও নির্মাণ করা হয়— দরকার মতো উদ্বৃত্ত জলরাশি জমা রাখা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য নিয়ে। যাই হোক, এখনও পর্যন্ত আমাদের সাফল্যের সূচক নিচের দিকেই। বর্ষা মরসুমে জল প্রবাহের বার্ষিক মাত্র ১০ শতাংশের সামান্য কিছু বেশি আমরা ধরে রাখতে সক্ষম। জলসম্পদ বিকাশ প্রকল্পগুলি রূপায়ণের রাস্তায় বাধা অনেক। পরিবেশগত, আর্থ-সামাজিক এবং আরও অন্যান্য ইস্যু। গত কয়েক দশক ধরেই দেশে কেবল উদ্বৃত্ত জল ধরে রাখার জন্য জলাধার নির্মাণের কাজে অগ্রগতি হচ্ছে অত্যন্ত ধীর গতিতে। ফলত, আমরা এখনও বন্যা ও খরার ধাক্কায় জল নিয়ে নাজেহাল।

১৯৫৪ সালের জাতীয় কর্মসূচি চালু হওয়ার পর দেশে যেসব বড় মাপের প্রকল্প সম্পূর্ণ করা হয়েছিল—সেগুলি বন্যা নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট সুফল দেয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের মাধ্যমে নির্মিত বিভিন্ন বাঁধ ও জলাধার; মহানদীর উপর হিরাকুঁদ বাঁধ; তাপি নদীতে উকাই বাঁধ এবং শতদ্রু নদী বরাবর ভাকরা বাঁধ। এগুলির কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এখানে আলাদা করে তুলে ধরা হল। এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট নদীগুলি থেকে বন্যা সৃষ্টি করতে পারে এমন মরসুমি জলরাশি জলাধারে জমা রেখে বাঁধের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিতমাত্রায় ছাড়া হয়। এভাবেই নদীর নিম্ন অববাহিকায় স্থিত গ্রাম ও শহরগুলিকে বন্যার হাত থেকে সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়। অনেক ক্ষেত্রে, দেখা যায় হয়তোবা বন্যা পরিস্থিতিতে তৈরি হল অনেককাল পরে। ২৫ বছরে একবার। এদিকে দীর্ঘদিন ধরে বন্যা না হওয়ায় নদীর একেবারে তীরেই ঘন মনুষ্যবসতি গড়ে ওঠে, এমনকী অনেক ক্ষেত্রে (শুকিয়ে যাওয়া) প্রধান নদীখাতের মধ্যেও মানুষজন দিব্যি বসবাস-চাষাবাদ শুরু করে দেয়। কিন্তু বাঁধের সুরক্ষার বিষয়টি মাথার রেখে জলাধার তথা বাঁধ থেকে নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় জল ছাড়াটা সবিশেষ জরুরি হয়ে পড়ে। এর সঙ্গে যদি বন্যা পরিস্থিতি যোগ হয় তাহলে ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির সমূহ সম্ভাবনা। মেকাবিলার একমাত্র উপায় হল বন্যা সমতল অঞ্চল আইন (Flood Plain Zoning Act) লাগু করা।

● **হিরাকুঁদ বাঁধ :** মহানদীর ওপর ১৯৫৭ সালে নির্মিত এই বড় আকারের বাঁধটি মূলত মাটি ও ইট-বালি-সিমেন্ট-এর মতো উপাদানে তৈরি। এর জলধারণ ক্ষমতা ৫২২২ মিলিয়ন ঘনমিটার (MCM)। বর্ষা মরসুমে বন্যার প্রকোপ নিয়ন্ত্রণ করতে এর সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতার সমপরিমাণ জল ধরে রাখা হয়। পরবর্তীতে এই জমা জলরাশি সেচের কাজে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই বাঁধ নির্মাণের আগে মহানদী ব-দ্বীপ অঞ্চল প্রায় প্রত্যেক বছর বন্যা কবলিত হত।

● **দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন-এর অধীন বাঁধসমূহ :** দামোদর এবং বরাকর নদীতে বন্যার প্রকোপ কমাতে এবং সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট নদী দু'টিতে ৪-টি বাঁধ নির্মাণ করা হয়। বাঁধ চারটি হল— কোনার, মাইথন, পাঞ্চেত এবং তিলাইয়া। এদের সম্মিলিত বন্যা জলরাশি ধারণ ক্ষমতা ১৬০৩ মিলিয়ন ঘনমিটার। ১৯৫৮ সাল থেকে এগুলি কাজ করে চলেছে। এমনকী মাইথন এবং পাঞ্চেত বাঁধ নির্মাণকালীন নক্শা অনুযায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণে ততখানি কার্যকরী না হলেও দামোদরের নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলে যথেষ্ট উল্লেখনীয়ভাবে বন্যার প্রকোপ কমানো গেছে—চারটি বাঁধের সম্মিলিত অবদান-স্বরূপ।

● **উকাই বাঁধ :** তাপি (তাপ্তি) নদীর উপর ১৯৭৭ সালে উকাই বাঁধ নির্মাণের কাজ শেষ হয়। এর জলধারণ ক্ষমতা ৬৬১৫ মিলিয়ন ঘনমিটার। তাপি নদীর নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলকে বন্যা প্লাবিত হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে তথা সুরাট শহরকে বন্যার কবল থেকে নিস্তার দিতে এই বাঁধ অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে। এই প্রকল্প থেকে সেচ-এর সুবিধা এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের মতো অন্যান্য সুফলও পাওয়া যাচ্ছে।

● **ভাকরা বাঁধ :** শতদ্রু নদীতে যখন ভাকরা বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়, সেসময় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে খরা ব্যবস্থাপনার উপর জোরদার গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। কাজেই বাঁধ নির্মাণের সময় প্রধান বিবেচ্য বিষয়টি ছিল সেচের সুফল পাওয়া, বন্যা নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামানো হয়নি। তাসত্ত্বেও এই বাঁধে সঞ্চিত বিশাল পরিমাণ জলরাশি—৭১৯০ মিলিয়ন ঘনমিটার, সবসময়ই এমনভাবে ব্যবহার করা হতে থাকে যে নদীর নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলগুলিতে বন্যার প্রকোপ উল্লেখযোগ্য হারে কমে যায়। নির্মাণ শেষে এই বাঁধ চালু করা হয় ১৯৬৩ সালে। পরবর্তী প্রথম কয়েক বছরে বন্যা সৃষ্টি করতে পারত এমন সম্পূর্ণ জলরাশিকে এই বাঁধের মাধ্যমে আটকে দেওয়া হয়। শতদ্রু নদের ৬৫ শতাংশ 'catchment' (অর্থাৎ, যেসব খাতবাহিত হয়ে বৃষ্টির জল নদীতে এসে পড়ে) তিব্বত (চিন)-এ অবস্থিত। কাজেই এর উচ্চ প্রবাহে মাঝে মাঝেই যে হড়কা বান আসার খবরাখবর পাওয়া যায় তা শেষমেষ নদীর নিম্ন অববাহিকা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। কাজেই যতক্ষণ না যথার্থে বন্যা হয়েছে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল মোটের উপর নিরাপদই ছিল। এরকম সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল ২০০০ সালে। সেসময় শতদ্রু নদের জল স্তর স্বাভাবিকের ১৫ মিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। তিব্বতে সাময়িকভাবে নদীর গতিপথে বাঁধার সৃষ্টি হওয়ায় এবং মেঘভাঙ্গা বৃষ্টির কারণে হড়কা বান নেমে এসে পরিস্থিতি এত ঘোরালো করে তোলে। ভাকরা বাঁধের উচ্চ প্রবাহ অঞ্চল এই বন্যার কারণে প্রভাবিত হয় বটে, তবে বন্যার জলরাশি সম্পূর্ণ শোষণ করে নেয় ভাকরা বাঁধ। জলধারণ ক্ষমতার

সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছানোর পর অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় সেই জল ছাড়া হয়েছিল, ফলত নিম্ন অববাহিকায় পাঞ্জাব সমভূমিকে বন্যার ধ্বংসলীলা থেকে বাঁচানো সম্ভব হয়।

সাম্প্রতিক অতীতে, ভাগীরথী (গঙ্গা)-তে তেহরি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের মতো বড় মাপের প্রকল্পের কারণেই হৃষিকেশ এবং হরিদ্বারে বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস সম্ভব হয়। উত্তরাখণ্ড অঞ্চলে হড়কা বানের কারণে এই বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। তেহরি ড্যাম এমন আচমকা এসে পড়া ২.৫ লক্ষ কিউসেক বন্যা জলরাশি শোষণ/ধারণ করেছিল। ফলত, জলাধার কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সেকারণেই এই উদ্বৃত্ত জলের কিছুটা অংশ (মাত্র ৭ শতাংশেরও কম) নদীখাতের নিম্ন প্রবাহে ছাড়া হয়। একইভাবে নর্মদা নদীর উপর নির্মিত সর্দার সরোবর প্রকল্পও বন্যার জলরাশি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিম্ন অববাহিকায় বন্যার প্রকোপ তথা ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করতে কার্যকর ভূমিকা নেয়।

এই প্রসঙ্গেই আর একটি কথাও উল্লেখ করতে হয়। ভারতীয় নদীগুলির আন্তঃসংযুক্তিকরণ প্রকল্প নিয়ে যে কথাবার্তা চলছে তা হয়তো দেশে ঘন ঘন বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি ও খরার প্রকোপকে হ্রাস করতে অনেকাংশে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে। সংক্ষেপে বলা যায়, এই প্রকল্পের মাধ্যমে বেশ কিছু সংখ্যক জলাধার/বাঁধ নির্মাণ করা হবে; একই সাথে সারা দেশ জুড়ে ক্যানাল ব্যবস্থার একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করা হবে। এই পরিকাঠামোর মাধ্যমে ব্রহ্মপুত্র ও অন্যান্য মুখ্য নদীগুলির বন্যাকালীন উদ্বৃত্ত জলরাশির অভিমুখ পরিবর্তন করে দেশের জলাভাবপীড়িত অঞ্চলে পাঠানো হবে। এভাবেই ভারতে জলসম্পদের সুষম বণ্টন এবং সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার সম্ভব হতে পারে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বন্যার থেকে কিছুটা মাত্রায় সুরক্ষা প্রদান বাস্তবে অসম্ভব নয়। ঘন ঘন যাতে বন্যা না হয়। তথা বন্যাকালীন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করে তা করা যেতে পারে। এজন্য যেটা করতে হবে, তা হল মুখ্য নদীগুলিতে বিভিন্ন স্থানে জলাধার ও বাঁধ (Storage dam) নির্মাণ—যাতে এতে উদ্বৃত্ত বন্যা জলরাশি শোষণ ও সঞ্চিত রেখে নিম্ন অববাহিকার নদী খাতে নিয়ন্ত্রিতমাত্রায় পরে ছাড়া যায়। প্রস্তাবিত IRL (Indian River Linking) অর্থাৎ, ভারতীয় নদীগুলির আন্তঃসংযুক্তিকরণ প্রকল্প ভয়াবহ বন্যা সমস্যার সমাধানে একটি বিকল্প উপায় হয়ে উঠতে পারে। যাই হোক, বন্যার হাত থেকে পুরোপুরি নিষ্কৃতি দিতে সক্ষম—এমন কোনও সর্বজনীন সমাধান নেই। কাজেই উদ্বৃত্ত বন্যা জলরাশি সঞ্চিত করে রাখার জন্য জলাধার/বাঁধ নির্মাণের পাশাপাশি আর যে ব্যাপারে দেশকে মনোনিবেশ করতে হবে তা হল বিভিন্ন ধরনের কৌশল (strategy) অবলম্বন। বন্যা বিধৌত সমতলের দক্ষ ব্যবস্থাপনা এর অন্যতম। বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে বিপর্যয়ের জন্য আগেভাগে তৈরি থাকতে হবে এবং তৎক্ষণাৎ বন্যাত্রাণে নেমে পড়ার মতো পরিকাঠামো গড়তে হবে। এছাড়াও বন্যার পূর্বাভাস, বন্যা সতর্কতা জারি এবং এরকম আরও অ-কাঠামোগত পন্থাপদ্ধতি; যেমন—বিপর্যয়ে ত্রাণ, বন্যা বিধ্বস্ত জান মালের বিমা ইত্যাদি বিষয়ে নজর দিতে হবে। এভাবেই বন্যার কারণে ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করে বন্যার প্রকোপ কমানো সম্ভবপর হবে।❑

(**লেখক পরিচিতি :** লেখক জল বিশেষজ্ঞ। জলসম্পদ সংক্রান্ত জাতীয় আয়োগ-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং কাজ করেছেন পরিকল্পনা আয়োগে—জলসম্পদ সংক্রান্ত পরামর্শদাতা হিসাবে। ইমেল : msmenon30@gmail.com)

তথ্য সূত্র :

1. Dr. K. L. Rao : India's Water Wealth-Orient Longman Limted, 1975.
2. Ministry of Water Resources : Report of the Rashtreeya Barh Ayog, 1980.
3. Ministry of Water Resources : Reports of Task Forces on Flood Management, 1997.
4. Ministry of Water Resources : Report of the National Commission for Integrated Water Resources Development Plan, 1999.
5. Ministry of Water Resources : National Water Policy, 2012.
6. Central Water Commission : Water Resources at a Glance, 2016.

জলাভূমি সংরক্ষণ ও রামসর কনভেনশন

একটি আঞ্চলিক প্রাসঙ্গিকতা

*যে কোনও জলাভূমিরই গুরুত্ব অপরিসীম। জলাভূমির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবহার বিকাশশীল ও অনুন্নত দেশগুলিতে বেশ ব্যাপক। মনে রাখা দরকার, জলাভূমির এই ব্যবহার ও ব্যবহারিক মূল্য কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি। স্বল্পমেয়াদি বা তাৎক্ষণিক মূল্য আপাতদৃষ্টিতে অপেক্ষাকৃত কম। জলাভূমির আশেপাশে বসবাসকারী ও সরাসরি উপকৃত জনগোষ্ঠী জলাভূমির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বংশানুক্রমিকভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম। তাই তারা জলাভূমির ব্যবহারে সংযত ও যত্নবান এবং সংরক্ষণ সম্বন্ধে দায়িত্বশীল। অল্প সময়ে অত্যাধিক লাভ না হওয়ায় জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য বহিরাগত গোষ্ঠী, এমনকী রাজনৈতিকভাবে নির্বাচিত সরকারও উদাসীন হয়ে পড়ে। তবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জলাভূমি সংরক্ষণের ধারণা ও উদ্যোগটি বেশ পুরোনো। সার্বিকভাবে ভারতের রামসর সাইটগুলি তথা আলাদা করে পূর্ব কলকাতা জলাভূমির সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক নিয়ে বর্তমান নিবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন—***ড. চন্দ্রিমা সিন্‌হা**

ভারতে জলাভূমির বৈচিত্র্য বিস্তীর্ণ। এই জলাভূমি আমাদের নানারকমের বাস্তুতান্ত্রিক পণ্য আর পরিষেবা উপহার দিয়ে থাকে। জলাভূমির বৈচিত্র্য নির্ভর করে এর উৎপত্তি, ভৌগোলিক অবস্থান, জলের পরিমাণ, মুখ্য প্রজাতি (key species), মাটি ও পলির প্রকৃতির ওপর। বর্তমানে বিশ্বে মোট ১২৭৫ মিলিয়ন হেক্টর জলাভূমি আছে, যার অর্থনৈতিক মূল্য আমেরিকান মুদ্রায় ১৫ ট্রিলিয়ন ডলার।

উৎপত্তি অনুসারে জলাভূমি নানাপ্রকারের হতে পারে; যেমন—coastal wetlands বা সামুদ্রিক জলাভূমি, Estuarine বা মোহনাসন্নিহিত জলাভূমি, হ্রদ বা Lacustrine, নদী সংলগ্ন বা Riverine এবং Palustraine বা খাল-বিল-জলা জাতীয়।

যে কোনও জলাভূমিরই গুরুত্ব অপরিসীম। জলাভূমির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবহার বিকাশশীল ও অনুন্নত দেশগুলিতে বেশ ব্যাপক। এইসব দেশে জলাভূমির আশেপাশে বসবাসকারী মানুষজন নিজেদের দৈনন্দিন চাহিদাপূরণের জন্য জলাভূমির প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। জলাভূমিকে স্থানীয় মানুষ মূলত দুইভাবে ব্যবহার করে থাকে। প্রথমত, পরিবারের দৈনন্দিন চাহিদাপূরণ, যেমন—মাছ/শামুক/ঝিনুক (প্রোটিনজাতীয় খাদ্য), সবুজ শাক (ভিটামিন), ওষধি, গবাদিপশুর খাদ্য, বাসস্থান তৈরির সামগ্রী (হোগলা, শন ইত্যাদি), জ্বালানি, গৃহস্থালীর জন্য জলের ব্যবহার (পানীয় জল, স্নান, বাসনপত্র ধোওয়া, কাপড় কাচা, গবাদি পশুর স্নান ও পানীয়, ধর্মীয় আচার পালন ইত্যাদি)। দ্বিতীয়ত, বাণিজ্যিক কারণে জলাভূমির ব্যবহার; যেমন—কৃষিক্ষেত্রে সেচব্যবস্থা, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, মাছচাষ (fish farming) ও মাছধরা (capture fishery), ধানচাষ, পানিফল চাষ, শালুক-পদ্ম-শোলা-হোগলা-মাখানা চাষ ও বিক্রি, পর্যটন ও বিনোদন শিল্প, জলপথে পরিবহণ। এমনকী জল ব্যতিরেকে কলকারখানা-শিল্প কিছুই সম্ভব নয়। জলাভূমির বাণিজ্যিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ছাড়াও বহিরাগত এবং অর্থনৈতিকভাবে অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল ও বিনিয়োগে সক্ষম গোষ্ঠী যুক্ত থাকে। জলের ব্যবহারের জন্য ব্যবহারকারীকে বিনিময় মূল্য (price) দিতে না হলেও, এটা ধরে নেওয়া যায় যে ওই জলসম্পদ ব্যবহারের জন্য উপলব্ধ না থাকলে, তা বাজারদরে বাজার থেকে ক্রয় করতে হত। অর্থাৎ, সেক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি হয়। বিকাশশীল বা অনুন্নত দেশে যে জনগোষ্ঠী জলাভূমির আশেপাশে থাকে ও জীবনযাত্রার জন্য জলাভূমির ওপর নির্ভরশীল, তারা আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল হয়ে থাকে। কারণ, ওই অঞ্চলে সাধারণত উপার্জনের সুযোগ সীমাবদ্ধ। প্রাকৃতিক সম্পদের অভাবে ব্যয় বৃদ্ধি জলাভূমির উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার গুণমান (Quality of life) অনেকাংশেই হ্রাস করে। এ দু'টি ব্যবহার হল জলাভূমির প্রত্যক্ষ ব্যবহার। জলাভূমির পরোক্ষ ব্যবহারও প্রচুর। পরোক্ষ ব্যবহার বলতে বোঝায়, যেসব ব্যবহারের জন্য টাকার সাপেক্ষে অর্থনৈতিক মূল্য নির্ধারণ করা একটু জটিল। যেমন—জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ (জল ছাড়া সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বা রয়েল বেঙ্গল টাইগারের অস্তিত্ব সম্ভব নয়, আবার জল, ম্যানগ্রোভ আর রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছাড়া সেখানে পর্যটন শিল্পের বিকাশও সম্ভব নয়); বন্যা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ; সাংস্কৃতিক মূল্য সংরক্ষণ (cultural value conservation); প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য রক্ষা (aesthetic value maintenance) ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের উত্তরাধিকার রক্ষার দায়িত্ব (bequest value)।

এই পরোক্ষ ব্যবহারগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং একথা অনস্বীকার্য যে এই পরোক্ষ ব্যবহারগুলির কোনও বিকল্প সম্ভব হয় না।

এখানে মনে রাখা দরকার, জলাভূমির এই ব্যবহার ও ব্যবহারিক মূল্য কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি। স্বল্পমেয়াদি বা তাৎক্ষণিক মূল্য আপাতদৃষ্টিতে অপেক্ষাকৃত কম। জলাভূমির আশেপাশে বসবাসকারী ও সরাসরি উপকৃত জনগোষ্ঠী জলাভূমির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বংশানুক্রমিকভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম। তাই তারা জলাভূমির ব্যবহারে সংযত ও যত্নবান এবং সংরক্ষণ সম্বন্ধে দায়িত্বশীল। যে গোষ্ঠী জলাভূমিতে বহিরাগত ব্যবহারকারী (বিশেষত, যারা জলাভূমিকে বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহার করেন) বা ব্যবহারকারী নয় এমন stakeholder যেমন—রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধি, রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র সরকার), তাদের কাছে দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহারিক মূল্যের গুরুত্ব কম, বা একেবারেই নেই। অল্প সময়ে অত্যাধিক লাভ না হওয়ায় জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য বহিরাগত গোষ্ঠী, এমনকী রাজনৈতিকভাবে নির্বাচিত সরকারও উদাসীন হয়ে পড়ে। অত্যাধিক ব্যবহার এবং সরকারি নীতিগত উদাসীনতা ও স্থানীয় ব্যবহারীর জলাভূমি সংরক্ষণের যথাযথ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব থাকার জন্য জলাভূমি হয়ে পড়ে বিপন্ন।

উন্নত দেশগুলিতে জলাভূমি সংরক্ষণ সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা

উন্নত দেশগুলির অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক অবস্থা বিকাশশীল দেশগুলির তুলনায় স্থিতিশীল হওয়ায়, জলাভূমির গুরুত্ব নিরূপণ ও সংরক্ষণ চিন্তাধারাও অনেকাংশে ভিন্ন। উন্নত দেশগুলিতে মোটামুটিভাবে সংগত জীবনযাত্রার মান রক্ষা করা ও দীর্ঘমেয়াদি বিকাশ (sustainable development) বজায় রাখার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় ও নীতিগতভাবে যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়। এই কারণেই জলাভূমি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বিষয়টি উন্নত দেশে বিশেষ গুরুত্ব পায়। পক্ষান্তরে বিকাশশীল বা অনুন্নত দেশগুলিতে জীববৈচিত্র্যের আপেক্ষিক ও প্রত্যক্ষ বাজার মূল্য কম হওয়ায় বা যথাযথ মূল্য নির্ধারিত না হওয়ায় সংরক্ষণ নীতি যথেষ্ট জোরালো হয় না। জীববৈচিত্র্যের বিচরণ পরিসীমাকে আবার কোনও ভৌগোলিক সীমা বা দেশের গণ্ডিতে আবদ্ধ করা যায় না। যেমন, পরিযায়ী পাখি বা পরিযায়ী মাছ প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে এক দেশ থেকে আরেক দেশে অনায়াসে পৌঁছে যায়। উন্নত দেশে বসবাসকারী পরিযায়ী প্রাণীদের যাতায়াতের পথে পড়ে (flyway/passage) বিকাশশীল/অনুন্নত দেশে অবস্থিত এমন ক্ষণস্থায়ী বাসস্থান (temporary habitat) ক্ষতিগ্রস্ত বা অবলুপ্ত হলে উন্নত দেশগুলির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রক্রিয়া ব্যহত হয়। যেমন, সাইবেরিয়া থেকে শীতকালে উড়ে আসা পাখিরা যদি ভারতে এসে প্রয়োজনীয় বাসস্থান না পায়, কিংবা মায়নামার থেকে সাঁতরে আসা ইরাবতী ডলফিন চিলিকায় প্রয়োজনীয় লবণাক্ততা না পায়, ওই প্রাণীগুলির স্বাভাবিক জীবনচক্র বিপর্যস্ত হয় বইকী। তাই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমস্ত দেশগুলিতে একযোগে জলাভূমি সংরক্ষণ ও পারস্পরিক সহায়তা প্রদানের

সারণি-১
ভারতের রামসর সাইট

নাম	অবস্থান	তালিকাভুক্তির দিন	আয়তন (বর্গ কিমি)
১। অষ্টমুড়ি	কেরালা	১৯.০৮.০২	৬১৪
২। ভিতরকণিকা	ওড়িশা	১৯.০৮.০২	৬৫০
৩। ভোজ জলাভূমি	মধ্যপ্রদেশ	১৯.০৮.০২	৩২
৪। চন্দ্রতাল	হিমাচল প্রদেশ	৮.১১.০৫	০.৪৯
৫। চিলিকা	ওড়িশা	১.১০.৮১	১১৬৫
৬। দীপরবিল	অসম	১৯.০৮.০২	৪০
৭। পূর্ব কলকাতা জলাভূমি	পশ্চিমবঙ্গ	১৯.০৮.০২	১২৫
৮। হারিকে	পাঞ্জাব	২৩.০৩.৯০	৪১
৯। হোকেরা	জম্মু-কাশ্মীর	৮.১১.০৫	১৩.৭৫
১০। কাঞ্জলি	পাঞ্জাব	২২.০১.০২	১.৮৩
১১। কেওলাদেও ন্যাশানাল পার্ক	রাজস্থান	০১.১০.৮১	২৮.৭৩
১২। কোলেরু লেক	অন্ধ্রপ্রদেশ	১৯.০৮.০২	৯০১
১৩। লোকতাক লেক	মণিপুর	২৩.০৩.৯০	২৬৬
১৪। নলসরোবর	গুজরাট	২৪.০৯.১২	১২৩
১৫। পয়েন্ট ক্যালিমার	তামিলনাড়ু	১৯.০৮.০২	৩৮৫
১৬। পং ড্যাম	হিমাচল প্রদেশ	১৯.০৮.০২	১৫৬.৬২
১৭। রেনুকা লেক	হিমাচল প্রদেশ	৮.১১.০৫	০.২০
১৮। রোপার লেক	পাঞ্জাব	২২.০১.০২	১৩.৬৫
১৯। রুদ্রসাগর লেক	ত্রিপুরা	৮.১১.০৫	২.৪
২০। সম্বর লেক	রাজস্থান	২৩.০৩.৯০	২৪০
২১। সুনিরসার-মানসর লেক	জম্মু-কাশ্মীর	০৮.১১.০৫	৩.৫
২২। সষ্টমকোটা	কেরালা	১৯.০৮.০২	৩.৭৩
২৩। সোমোরিরি	জম্মু-কাশ্মীর	১৯.০৮.০২	১২০
২৪। আপার গঙ্গা রিভার (ব্রিজঘাট থেকে নারোরা)	উত্তর প্রদেশ	০৮.১১.০৫	২৬৫.৯
২৫। ভেম্বানাদ কল	কেরালা	১৯.০৮.০২	১৫১২.৫
২৬। উলার লেক্	জম্মু-কাশ্মীর	২৩.০৩.৯০	১৮৯

বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়।

আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় জলাভূমি সংরক্ষণের উদ্যোগ কিন্তু বেশ পুরোনো। বিশ্বে জলাভূমি সংরক্ষণের প্রথম আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ নেওয়া হয় ১৯৬২ সাল পরবর্তী সময়ে। এই বিষয়ে International Waterfowl and Wetlands Research Bureau (IWRB, বর্তমানে Wetlands International) এবং নেদারল্যান্ড সরকার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়, এবং একটি আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্রের খসড়া তৈরি করা হয়। ১৯৭১ সালে ইরানের রামসর শহরে বিশ্বের দরবারে পেশ করা হয় জলাভূমি সংরক্ষণের প্রথম আন্তর্জাতিক চুক্তি—"Convention on Wetlands of internation importance especially as waterfowl habitats" ১৯৭২ সালে আঠারোটি দেশের প্রতিনিধিরা এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। প্রাথমিকভাবে এই চুক্তিতে জলাভূমির উপর নির্ভরশীল পাখি, বিশেষতর পরিযায়ী পাখির বাসস্থান সংরক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হয়। ১৯৭৫ সালে রামসর কনভেনশানটি চালু হয়। রামসর সচিবালয়ের তথ্যানুসারে, ১০৫২-টি রামসর সাইট ইউরোপে, ২৮৯-টি এশিয়ায়, ৩৫৯-টি আফ্রিকায়, ১৭৫-টি দক্ষিণ আমেরিকায়, ২১১-টি উত্তর আমেরিকায় ও ৭৯-টি ওশিয়ানিয়া মহাদেশে অবস্থিত।

ভারত ও রামসর কনভেনশান

ভারত ১৯৮২ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি এই চুক্তিতে যোগ দেয়। ওড়িশার চিলিকা হ্রদ ও রাজস্থানের কেওলাদেও জাতীয় উদ্যান ভারতের প্রথম দুই রামসর সাইট। ১৯৯০ সালে আরও চারটি জলাভূমি, সম্বর লেক (রাজস্থান), লোকতাক লেক (মণিপুর), হারিকে লেক (পঞ্জাব) ও উলার লেক (জম্মু ও কাশ্মীর এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমানে দেশের মোট ২৬-টি জলাভূমি এই তালিকাভুক্ত। (সারণি-১ দ্রষ্টব্য)

এই রামসর কনভেনশানের চুক্তিবদ্ধ দেশ (contracting parties) জলাভূমি সংরক্ষণে নিম্নলিখিত বিষয়ে দায়বদ্ধ।

চিলিকা হ্রদ :
ভারতের প্রথম রামসর সাইট

● জলাভূমির বিচক্ষণ ব্যবহার (wise use) সুনির্দিষ্ট করার জন্য জাতীয় পরিকল্পনা (national plan), নীতি (policy) এবং আইন (legislation), পরিচালন ব্যবস্থা এবং সাধারণ মানুষকে এই বিষয়ে অবগত করা।

● যোগ্য জলাভূমিকে আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ (wetlands of international importance) বা রামসর সাইট হিসাবে চিহ্নিতকরণ ও তার যথাযোগ্য পরিচালনের ব্যবস্থা করা।

● একসাথে দুই ভিন্ন দেশে অবস্থানকারী (trans boundary) জলাভূমি ও জলাভূমিতন্ত্রে বা উভয়দেশে অবস্থানকারী জীব প্রজাতির সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক সাহায্য প্রদান।

রামসর কনভেনশানের নিয়ম অনুযায়ী, চুক্তিবদ্ধ দেশ প্রথমে নিজ দেশের আন্তর্জাতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ জলাভুমিকে চিহ্নিত করবে তথা তার সংরক্ষণ ও বিচক্ষণ ব্যবহার (wise use)-কে নিশ্চিত করবে। রামসর কর্তৃপক্ষ স্বীকৃত হলে ওই বিশেষ জলাভূমিটি আন্তর্জাতিক মর্যাদাপূর্ণ রামসর তালিকাভুক্ত হয় এবং সংরক্ষণ ও পরিচালনের জন্য বিশ্বের জলাভূমি বিশেষজ্ঞদের গবেষণালব্ধ ব্যবহারিক জ্ঞান ও পরামর্শ লাভ করার যোগ্যতা অর্জন করে। যদি কোনও স্থানীয় কারণে, প্রযুক্তগত উন্নয়ন, দূষণ বা মানুষের হস্তক্ষেপ জনিত কারণে রামসর তালিকাভুক্ত জলাভূমিটির বাস্তুতান্ত্রিক চরিত্র পরিবর্তিত হয় বা জলাভূমিটি বিপন্ন হয়—সেই দেশ তক্ষণাৎ বিষয়টি রামসর কর্তৃপক্ষ-এর গোচরে আনবে এবং বিপন্ন রামসর সাইট একটি বিশেষ তালিকা—মনট্রেক্স রেকর্ড (Montreux record)-এর আওতাভুক্ত হবে। বর্তমানে এদেশে রাজস্থানের কেওলাদেও ন্যাশনাল পার্ক, ভরতপুরে অবস্থিত জলাভূমি ও মণিপুরে ইম্ফল সংলগ্ন লোকতাক লেক মনট্রেক্স রেকর্ডভুক্ত। ওড়িশার চিলিকা হ্রদ, যেটি আদতে স্বল্প লবণাক্ত হ্রদ (এখানে বঙ্গোপসাগরের লবণাক্ত জল ও মহানদীর শাখা-প্রশাখা বাহিত মিষ্টিজলের সংমিশ্রণ ঘটে) এবং এক অনন্য সাধারণ জীব বৈচিত্র্যের সমাহারের ধারক ও বাহক। চিলিকা হ্রদ ও বঙ্গোপসাগরের যোগাযোগকারী একমাত্র সমুদ্রখাড়িটি পলি জমে জমে হয়ে বন্ধ হয়ে যায় এবং সমুদ্রের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে চিলিকার জলের লবণাক্ততা কমে যায় নাটকীয় ভাবে। বিপন্ন হয় চিলিকার জীবজগৎ (ইরাবতী ডলফিন, অজস্র পরিযায়ী পাখি ও মাছ)। বাগদা চিংড়ি উৎপাদন, যা ছিল বৈদেশিক মুদ্রা আমদানির উপায়, তা একেবারেই কমে যায়। চিলিকার ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী বিপন্ন হয়ে পড়ে, এলাকা

ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয় বহু মৎসজীবি। এই অবস্থায় ১৯৯৩ সালে চিলিকাকে মনট্রেক্স রেকর্ডের আওতায় ফেলা হয়। পরে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী চিলিকা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (CDA) একটি নতুন সমুদ্রখাড়ি খনন করে ও পুরোনো মুখটির সংস্কার সাধনের মাধ্যমে, চিলিকা লবণাক্ততা ফেরত পায় ও সমস্যার সমাধান হয়। ২০০২ সালে চিলিকাকে মনট্রেক্স রেকর্ড থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয়।

পূর্ব কলকাতা জলাভূমি (East Kolkata Wetlands)

রামসর কনভেনশানটি জলাভূমির ইকোলজিকাল বা বাস্তুতান্ত্রিক চরিত্র ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্য তৈরি হলেও পরে 'wise use' বা জলাভূমির বিচক্ষণ ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হয় এতে। মানব সমাজের হিতার্থে জলাভূমির ব্যবহারকে রামসর কর্তৃপক্ষ স্বীকার করে নিয়েছে। একটাই শর্ত, জলাভূমির চরিত্র পরিবর্তন না করে সুসংহত বা দীর্ঘমেয়াদি (sustainable) ব্যবহার। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত পূর্ব কলকাতার জলাভূমি বা East Kolkata Wetlands বিশ্বে একমাত্র রামসর সাইট, যেটি 'wise use' বা বিচক্ষণ ব্যবহারের জন্যই ২০০২ সালে রামসর সাইট তালিকাভুক্ত হয়েছে। ১২,৫০০ হেক্টরের এই জলাভূমিটি Resource recovery বা পুঁজি পুনরুদ্ধার ব্যবস্থার বিশ্ববিখ্যাত মডেল। কলকাতা শহরের তরল বর্জ্য পদার্থ এই জলাভূমিতে মাছচাষ, ধানচাষ ও সবজি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় ও প্রাকৃতিক উপায়ে পরিশোধিত হয়।

বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করা যাক্, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল করপোরেশান রোজ প্রায় ৬০০ মিলিয়ন তরল বর্জ্য পদার্থ ও ২,৫০০ মেট্রিক টন কঠিন বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন করে। এই তরল বর্জ্য পদার্থ বিভিন্ন পাম্পিং স্টেশনের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ নিকাশী নালা বাহিত হয়ে পূর্ব কলকাতার দিকে প্রবাহিত হয় এবং সেখান থেকে আবার পাম্পিং স্টেশানের মাধ্যমে মাটির ওপরের খোলা নালা DWF (Dry Weather Flow Channel) ও SWF (Storm Water Flow Channel)-এর দ্বারা প্রবাহিত হয়ে ঘুষিঁঘাটা লক্ গেটের মাধ্যমে কুলটি নদীতে গিয়ে পড়ে। ভূ-গর্ভস্থ নিকাশী নালা মুলত গৃহনিকাশী ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় এই ময়লা জল জৈব উপাদান, নাইট্রোজেন, পটাশিয়াম ও ফসফরাস সমৃদ্ধ। DWF দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় ছোট ছোট নালার মাধ্যমে এই ময়লা জল টেনে নেওয়া হয় মাছচাষের জন্য নির্মিত ভেড়িতে। এই ময়লা জল ভেড়িতে মাছের খাদ্য-প্ল্যাংকটন উৎপাদনকারী সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া, এই ভেড়ির পুকুরগুলিতে ময়লা জল সূর্যালোকের সাহায্যে সবুজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন সমৃদ্ধ হয়। অর্থাৎ, পূর্ব কলকাতার জলাভূমি হল এমন একটি সিস্টেম, যেখানে ময়লা জল পরিশোধিত হয় (নিউট্রিয়েন্ট লোড হ্রাস পায় ও জল অক্সিজেন মাত্রা বৃদ্ধি পায়)। এর সাথে পাওয়া যায় প্রতিদিন ১৫০ টন তাজা সবজি ও বছরে ১০,৫০০ টন মাছ। প্রায় ৫০,০০০ লোকের রুজি-রোজগার এই ময়লা জলের ওপর নির্ভরশীল। যে কোনও উন্নত শহরে তরল বর্জ্য পদার্থ পরিশোধন করতে কোটি কোটি টাকা খরচ করতে হয়, সেখানে কলকাতার বর্জ্য পদার্থযুক্ত ময়লা জল কোটি কোটি টাকা উপার্জনে সক্ষম। বিশ্বের দরবারে জলাভূমি ব্যবহারের এটি একটি অভূতপূর্ব উদাহরণ। কলকাতা শহরের অধিবাসীরা তেমন একটা ওয়াকিবহাল না হলেও সারা বিশ্বের জলাভূমির বিশেষজ্ঞরা কিন্তু এই জলাভূমিটির দিকে বিশেষ নজর রাখেন ও এখনকার স্থানীয় মানুষের Indigenious বা দেশীয় জ্ঞান থেকে শিক্ষালাভ করে নিজ দেশে ব্যবহারের সুযোগ খোঁজেন।

"যে কোনও উন্নত শহরে তরল বর্জ্য পদার্থ পরিশোধন করতে কোটি কোটি টাকা খরচ করতে হয়, সেখানে কলকাতার বর্জ্য পদার্থযুক্ত ময়লা জল কোটি কোটি টাকা উপার্জনে সক্ষম। বিশ্বের দরবারে জলাভূমি ব্যবহারের এটি একটি অভূতপূর্ব উদাহরণ। কলকাতা শহরের অধিবাসীরা তেমন একটা ওয়াকিবহাল না হলেও সারা বিশ্বের জলাভূমির বিশেষজ্ঞরা কিন্তু এই জলাভূমিটির দিকে বিশেষ নজর রাখেন ও এখনকার স্থানীয় মানুষের Indigenious বা দেশীয় জ্ঞান থেকে শিক্ষালাভ করে নিজ দেশে ব্যবহারের সুযোগ খোঁজেন।"

পূর্ব কলকাতার জলাভূমি সংরক্ষণ ও সুষ্ঠ পরিচালন ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে রামসর কনভেনশনের নির্দেশিকা মেনে তৈরি হয়েছে East Kolkata Wetland Management Authority বা পূর্ব কলকাতা জলাভূমি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ। এই সংস্থাটির নিম্নলিখিত দায়িত্বগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে।

- জলাভূমির সীমারেখা নির্দিষ্ট করা।
- জলাভূমির ইকোলজিক্যাল বা বাস্তুতন্ত্রের চরিত্র ও জমির ব্যবহার ও জমির দখল সংক্রান্ত পরিবর্তনগুলির ওপর নজরদারি।
- জলাভূমির সীমারেখার মধ্যে অবৈধ নির্মাণকাজ প্রতিরোধ করা।
- জলাভূমির সংরক্ষণ ব্যহত করে এমন খনন কাজ, বিস্ফোরণ বা জলাভূমির ক্ষতিকর যে কোনও কাজ কারবার বন্ধ করা।
- দূষণ নিয়ন্ত্রণ করে জীব বৈচিত্র্য রক্ষা করা।
- জলাভূমি সংক্রান্ত গবেষণা চালিয়ে যাওয়া ও অন্যান্য রামসর সাইটগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।
- জলাভূমির সংরক্ষণ সম্বন্ধে সচেতনতা তৈরি করা।
- ময়লা জলে মাছচাষ ও পরিবেশ সচেতন পর্যটন (Eco-tourism)-কে উৎসাহিত করা।

এবার সমস্যার কথায় আসি। পূর্ব কলকাতার জলাভূমিটি কলকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত। বর্ধিত জনসংখ্যা ও আয় বৃদ্ধি তথা ঋণ গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির কারণে ক্রয়

ক্ষমতা বৃদ্ধির দরুণ শহর কলকাতায় বাসস্থানের চাহিদা বাড়ছে। ফলে শহরের পরিসীমা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। পূর্বে যে জায়গা শহর-বহির্ভূত ছিল, তা এখন বাড়িগাড়ি সমৃদ্ধ ব্যস্ত শহুরে জায়গায় পরিণত হয়েছে। বাসস্থান সংস্থানের চাহিদার সাথে বেড়েছে রাজনৈতিক মদতপুষ্ট জমি মাফিয়াদের আধিপত্য, ময়লা জলের দাম নেই, কিন্তু শুকনো জমির দাম বাড়ছে হু হু করে। আগেই বলেছি, সরাসরি জলাভূমির ব্যবহারকারী নয়, এমন বহিরাগত গোষ্ঠীর কাছে জলাভূমির দীর্ঘমেয়াদি তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব নয়। অতএব রামসর কনভেনশানটি জমি মাফিয়াদের জ্ঞান ও বিশ্লেষণের অনেকটাই বাইরে। তাই ইস্ট ক্যালকাটা ওয়েটল্যান্ডস (কনসারভেশান অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট) অ্যাক্ট, ২০০৬ থাকা সত্ত্বেও অবৈধ নির্মাণ চলতেই থাকছে।

জলাভূমি সংরক্ষণের দ্বিতীয় সমস্যাটি হল মালিকানা (ownership) সংক্রান্ত। ব্রিটিশ আমলে বিশেষ আইন বলে যে কোনও বনাঞ্চল সরকারি সম্পত্তি বলে বিবেচিত হত, এবং স্থানীয় মানুষকে বন-সম্পত্তি ব্যবহার থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করা হত। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এই আইনটি পরিবর্তিত হয় ও বনাঞ্চলের ওপর মানুষের মালিকানা স্বীকৃত না হলেও বনসম্পদের ওপর মানুষের ব্যবহারের অধিকার স্বীকৃত হয়। কিন্তু বনাঞ্চলের মালিকানা সরকারের হাতে থাকায় সংরক্ষণ নীতি তৈরি ও প্রণয়নের ক্ষেত্রে জটিলতা কম হয়। কিন্তু জলাভূমির ক্ষেত্রে সেইরূপ সরকারি মালিকানা না থাকায় আইন থাকলেও তার ব্যবহারিক প্রয়োগ মুশকিল হয়ে পড়ে। যদি কোনও জলাভূমির মালিকানা বিশেষ ব্যক্তির কাছে থাকে, অর্থাৎ, জলাভূমিটি যদি ওই ব্যক্তির নামে রেজিষ্ট্রিকৃত হয়, তবে ব্যবহারকারির উপর ব্যবহার শর্ত চাপিয়ে দিলে মালিকানা থাকা সত্ত্বেও ব্যবহারকারির স্বাধীনতা ব্যহত হয়। সেক্ষেত্রে ব্যবহারকারি কোনওভাবেই খুশি হতে পারে না। বিশেষত, সরকার কর্তৃক জমির প্রক্রিয়া হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে সমস্যাটি সম্যক্ জটিল আকার ধারণ করে। পূর্ব কলকাতা জলাভূমির ক্ষেত্রে রামসর সাইট চিহ্নিত অঞ্চলে যে কোনও স্থায়ী নির্মাণ অবৈধ। এবার যে মানুষগুলো ওই অঞ্চলে বাস করছে, তাদের আর্থিক সঙ্গতি থাকলেও বাড়ির ছাঁদ পাকা করার অনুমতি মিলছে না, বা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তির ক্ষেত্রে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছে না। পূর্ব কলকাতার জলাভূমির ২৬৪-টি ভেড়ির মধ্যে বেশির ভাগই ইজারা বা লিজ দেওয়া হয় মাছচাষের জন্য। এবার যদি অপ্রতুল ময়লা জলের যোগান বা মাছচাষের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি মালিক বা ইজারা নেওয়া সাময়িক মালিকদের না থাকে এবং মাছচাষ যদি যথেষ্ট লাভজনক না হয়, সেক্ষেত্রে হস্তান্তরের ওপর নিষেধাজ্ঞা বা নিয়ন্ত্রণ থাকলে মালিক কিন্তু সর্বদিক দিয়ে বঞ্চিত হয়। একথা মনে রাখা দরকার, ব্যাংক থেকে পুঁজি সংগ্রহের জন্য ঋণ চাইলে, কোনও স্থায়ী সম্পত্তি বন্ধক হিসাবে বা co-lateral রাখতে হয়। মাছচাষের পুকুর কিন্তু co-lateral রাখা সম্পত্তি হিসাবে বিবেচিত হয় না, হলেও নির্ধারিত মূল্য অনেক কম হয়। অর্থাৎ সরকার জলাভূমির ব্যবহারকারিকে ব্যবহার জনিত কিছু সুযোগসুবিধা না দিয়ে খালি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে আন্তর্জাতিক চুক্তির দায় শুধুমাত্র ব্যবহারকারির ওপরেই বর্তায়, যার দায়িত্ব নিতে ব্যবহারকারি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অপারগ। খোলা বাজারে এই জলাজমি বিক্রি করার সুযোগ না থাকায়, স্বল্প মূল্যের বিনিময় জমি মাফিয়াদের কাছে বে-আইনি জমি হস্তান্তর হয়ে যায়, এই গোষ্ঠী রাজনৈতিক মদতপুষ্ট ও শক্তিশালী হওয়ায় এই ধরনের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা কিন্তু সত্যিই কঠিন।

সরকারি স্তরেও যথেষ্ট সচেতনার অভাব চোখে পড়ে। কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রক এই চুক্তি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, জাতীয় নীতি প্রণয়ন ইত্যাদির সাথে যুক্ত থাকলেও রাজ্য সরকারের যোগদান কিন্তু সীমিত। সমন্বয়ের অভাব থাকায় সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কী করা যায় আর কী করা যায় না সে বিষয়ে রাজ্য সরকারের সচেতনতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। রামসর তালিকাভুক্তির পূর্বে এই জলাভূমি বুজিয়ে ওয়ার্ল্ড ট্রেন্ড সেন্টার তৈরি, তালিকাভুক্তির পরে এয়ারপোর্ট নির্মাণ বা আলিপুর চিড়িয়াখানা স্থানান্তরের সরকারি পরিকল্পনার কথা শোনা গিয়েছিল। বর্তমানে তো এই বিশেষ জলাভূমিটিকে রামসর তালিকামুক্ত করে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার ও নির্মাণে অবাধ সম্মতি দেওয়ার কথাও আলোচিত হচ্ছে। আশঙ্কার কথা, প্রস্তাবিত নতুন জলাভূমি সংরক্ষণ আইন, ২০১৬ (Wetlands Conservation Rule, 2016)-তে রাজ্য সরকারকে জলাভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আরও ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে। যদিও রামসর কনভেনশানের চুক্তি অনুযায়ী, ভারতের রামসর সাইটগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং নীতি প্রণয়ন জাতীয় স্তরে হওয়ার কথা। কেন্দ্র সরকার জলাভূমি সংরক্ষণের সব দায়িত্ব রাজ্য সরকারের ওপর চাপিয়ে দিলে সংরক্ষণ কতখানি নিরপেক্ষ ও কার্যকরী হবে সে বিষয়ে আশঙ্কা থেকে যায় বইকী। এই পরিস্থিতিতে এটাই দেখার বিষয় যে, সরকার পূর্ব কলকাতা জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নেয় কি না, অথবা ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত লোভের কাছে হার স্বীকার করে, জলাভূমিটিকে রামসর তালিকামুক্ত করে মানুষের এই অনন্য ও অভিনব প্রয়াসটিকে ধ্বংস করে। সেক্ষেত্রে বিশ্বের দরবারে নিঃসন্দেহে মাথা হেঁট হয়ে যাবে আমাদের। তবে সন্দেহ নেই, রামসর তালিকাভুক্ত পূর্ব কলকাতা জলাভূমিটি আন্তর্জাতিক তকমা পাওয়া সত্ত্বেও আজ ভীষণভাবে বিপন্ন। ❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক EIILM-এর সহকারী অধ্যাপক। ইমেল : sinha.chandrima@gmail.com)

স্বচ্ছ যুগ

গঙ্গা তীরবর্তী সব গ্রাম পঞ্চায়েত হবে ‘উন্মুক্তস্থানে শৌচকর্ম মুক্ত’

উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গ—এই পাঁচ রাজ্যে গঙ্গার তীরে অবস্থিত সবক’টি গ্রাম ‘উন্মুক্তস্থানে শৌচকর্ম মুক্ত’ (ওপেন ডেফেকেশন ফ্রি বা ODF) করতে কেন্দ্রীয় পানীয় জল ও স্বচ্ছতা মন্ত্রক, যুব কার্যক্রম ও ক্রীড়া মন্ত্রক এবং জলসম্পদ, নদী বিকাশ ও গঙ্গা পুনরুজ্জীবন মন্ত্রকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, আরও বেশি জোর দিচ্ছে। পাঁচ রাজ্যে ১,৬৫১-টি গ্রাম পঞ্চায়েত তথা ৫২-টি জেলা মিলিয়ে গঙ্গার তীরে মোট ৫,১৬৯-টি গ্রাম অবস্থিত।

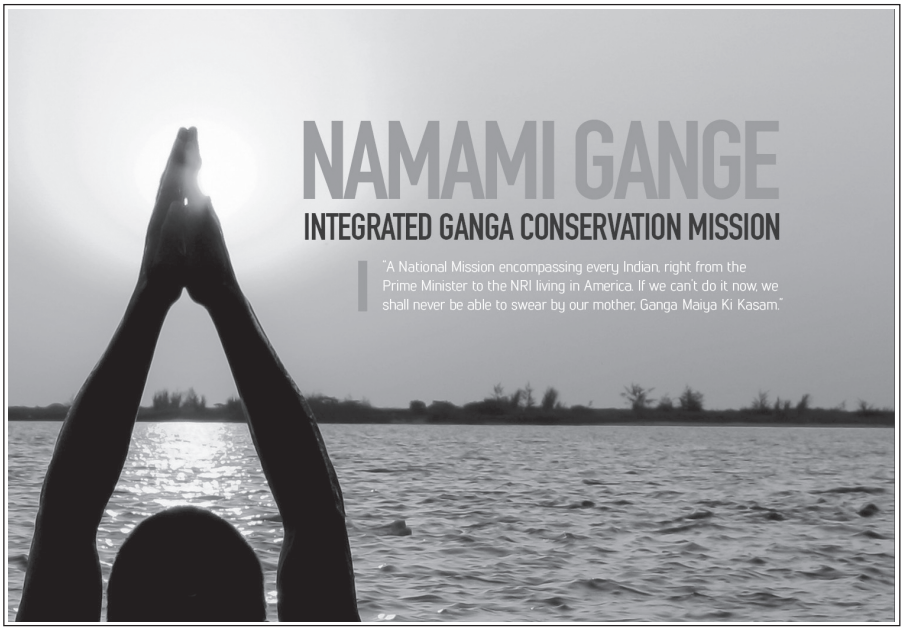

এই প্রকল্প ***স্বচ্ছ*** ভারত অভিযান, স্থানীয় ***যু***ব নেতা ও নমামি ***গঙ্গে*** প্রকল্পের মিলিত প্রয়াস বলে এর নামকরণ হয়েছে “স্বচ্ছ যুগ”।

যুব কার্যক্রম মন্ত্রক ও নেহরু যুব কেন্দ্র সংগঠনের সমন্বয়ে, ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস, নেহরু যুব কেন্দ্র ও জাতীয় সেবা প্রকল্প (এনএসএস)-এর মতো যুব সংস্থার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক স্থানীয় যুব স্বেচ্ছাসেবকদের এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে যাতে তাঁদের সাহায্যে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের আওতায় এই ৫২-টি জেলায় ‘অভ্যাস বদল প্রচারাভিযান’ চালানো যায়।

প্রত্যেক জেলায় একজন করে নোডাল অফিসার (সংযোগ ও সমন্বয়ের জন্য নিয়োজিত বিশেষ আধিকারিক) নিয়োগ করা হয়েছে, যিনি জোর কদমে নিজের জেলা ‘উন্মুক্তস্থানে শৌচকর্ম মুক্ত’ করার প্রচেষ্টার পাশাপাশি গ্রামে কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং সাধারণত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার মাধ্যমে গ্রামে “স্বচ্ছতা”-র উপরও বিশেষ নজর দেবেন। পাঁচ রাজ্যে গঙ্গা পাড়ের গ্রামগুলির সর্বত্রই স্থানীয় প্রশিক্ষকদের ‘ভার্চুয়াল ক্লাসরুম’ (ইন্টারনেট সংযুক্ত বা অনলাইন শ্রেণিকক্ষ)-এর মাধ্যমে উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মের অভ্যাস বদলের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগতভাবে বার্তা দেওয়ার জন্য সর্বাঙ্গীণ ও বিস্তৃত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

প্রথম ‘ভার্চুয়াল ক্লাসরুম’-এর সূচনা হয় ২০১৬ সালের ৭ জুন—বিহারের ১২-টি জেলায় পাঁচ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণকালে প্রতিটি কেন্দ্রের ৫০ জন করে যুব স্বেচ্ছাসেবক জুড়ে যান প্রশিক্ষকের সঙ্গে। এই প্রশিক্ষণ ক্লাসে পারস্পরিক মতবিনিময় ও ক্ষেত্র পরিদর্শনের সংমিশ্রণ। ব্যাপকহারে স্থানীয় তরুণ-তরুণীদের যোগদান সুনিশ্চিত করে যুব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি সহায়তা করবে।

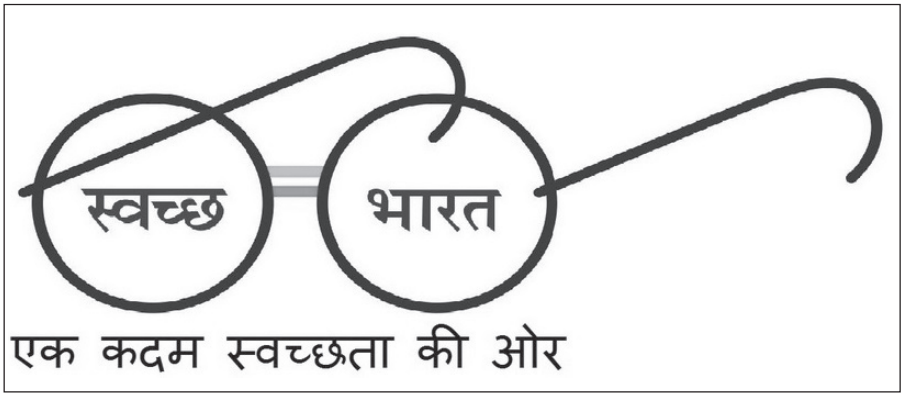

আফগান-ভারত মৈত্রী বাঁধ

নজিরবিহীন পরিকাঠামো প্রকল্প সম্পন্ন হল

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৪ জুন পূর্ব আফিগানিস্তানের হেরাট প্রদেশে আফগান রাষ্ট্রপতি ড. আশরফ ঘানিকে পাশে নিয়ে আফগান-ভারত মৈত্রী বাঁধ (সালমা বাঁধ) উদ্বোধন করলেন। আফগান-ভারত মৈত্রী বাঁধ একটি বহুমুখী প্রকল্প যার উদ্দেশ্য ৪২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন, ৭৫ হাজার হেক্টর জমির সেচ, জল সরবরাহ ও আফগানিস্তানের মানুষদের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া। একবার করে আফগানিস্তান সরকার প্রদত্ত হেলিকপ্টারে চেপে প্রকল্পস্থলে যেতেন। ভারত থেকে উপকরণ ও উপাদান প্রথমে সমুদ্রপথে ইরানের বন্দর-ই-আব্বাস বন্দরে পৌঁছাত। তারপর সেখানে থেকে ১২০০ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে তা পৌঁছাত ইরান-আফগান সীমান্তে 'ইসলাম কিলা'-এ এবং এই সীমান্ত চৌকি থেকে আরও ৩০০ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে তা পৌঁছাত প্রকল্পস্থলে। পড়শি

আফগানিস্তানের হেরাট প্রদেশে চিস্ত-ই-শরিফ নদীর উপর সালমা বাঁধ ভারত সরকারের একটি নজিরবিহীন পরিকাঠামো প্রকল্প। এই প্রকল্প রূপায়িত ও বাস্তবায়িত করেছে ভারত সরকারের জলসম্পদ, নদী বিকাশ ও গঙ্গা পুনরুজ্জীবন মন্ত্রকের আওতাধীন সংস্থা 'ওয়াটার অ্যান্ড পাওয়ার কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড'।

প্রকল্পস্থল হেরাট শহরের ১৬৫ কিলোমিটার পূর্বে এবং সেখানে পৌঁছানোর জন্য কোনও পাকা রাস্তা নেই। নিরাপত্তাজনিত কারণে প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার ও টেকনিশিয়ানরা মাসে দেশগুলি থেকে সিমেন্ট, স্টিল, বিস্ফোরক, ইত্যাদি আফগানিস্তানে আমদানি করা হত।

বাঁধটির সর্বোচ্চ জলধারণ ক্ষমতা ৩৩ মিলিয়ান ঘনমিটার। উচ্চতা ১০৪.৩ মিটার, দৈর্ঘ্য ৫৪০ মিটার ও তলদেশের প্রস্থ ৪৫০ মিটার।

ভারত সরকার প্রকল্পের আর্থিক খরচ বহন করেছে। অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ১,৫০০ ভারতীয় ও আফগান ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মী-কুশলীদের কয়েক বছরের কঠিন পরিশ্রমের ফসল এই প্রকল্পের সাফল্য।❑

জল নিয়ে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে ভারতের সমঝোতা

একটি খণ্ডচিত্র

স্থল সীমাযুক্ত প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে আন্তর্দেশীয় বা আন্তর্জাতিক নদী নিয়ে বহু সময়ে ভারতের মত পার্থক্য হয়েছে। দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা বা চুক্তির মধ্য দিয়ে মতানৈক্যের কৌশলগত সমাধান সূত্র খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে বিবাদমান উভয় রাষ্ট্রই। এভাবে বহু সমস্যার সমাধানও সম্ভব হয়েছে। জলসম্পদ ও সেই সূত্রে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, সেচ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে বিভিন্ন সময়ে ভারত একাধিক চুক্তি, সমঝোতায় এসেছে, যার ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভবান হয়েছে উভয় দেশই। এরকম কয়েকটি সমঝোতা নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন—**ড. সপ্তর্ষি মিত্র**

মানব সভ্যতার ইতিহাসে জলসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। সভ্যতার অগ্রগতি বিকশিত হয় জলসম্পদকে কেন্দ্র করে। প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতা, মেসোপটেমিয়া সভ্যতা সবই ছিল নদীকেন্দ্রিক। নগরায়ন থেকে শিল্পায়ন—পরিব্যপ্তি নির্ভর করে জলসম্পদের চাহিদা ও জোগানের উপর। জলসম্পদের অন্যতম প্রধান উৎস নদী ও সাগর। সমুদ্রের বৈশিষ্ট্য, সমুদ্রপথ, সমুদ্রসম্পদ, আন্তর্জাতিক সমুদ্ররেখা সমুদ্রপথের উপর অধিকার তথা গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ—এসবই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বিশ্ব রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে। অন্যদিকে, নদী প্রাকৃতিক ভূমিরূপের অংশ হলেও সভ্যতার সাথে এর সম্পর্ক নিবিড়। প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকেই এই সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। নদীভিত্তিক সমাজজীবন, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, উন্নয়নের ধরন, সংস্কৃতি বিশেষ অর্থ বহন করে। প্রাকৃতিকভাবে নদীখাত মূলত পর্বত, পাহাড় বা মালভূমি থেকে উৎপত্তির পর ঢাল অনুযায়ী প্রবাহিত হয়ে সমুদ্র, হ্রদ বা অন্য কোনও বড় নদীতে গিয়ে পড়ে। একটি নদী যদি একাধিক রাজ্য বা দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তাকে যথাক্রমে আন্তঃরাজ্য বা আন্তর্দেশীয় নদী বলে। এই আন্তর্দেশীয় বা আন্তর্জাতিক নদীর উপর একাধিক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়। নদীর যে অংশ যে দেশের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলে সেই অংশের উপর সেই দেশের অধিকার বিস্তৃত থাকে। আন্তর্জাতিক নদীগুলি প্রভাবিত করে সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিল্প ও উন্নয়নের ধারাকে, ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে তৈরি হয় নদীর উপর অধিকার কায়েম ঘিরে বিবাদ। এই বিবাদ মীমাংসার জন্য সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলি সংশ্লিষ্ট নদী বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে, তার জল বণ্টন নিয়ে বিভিন্ন সমঝোতা বা চুক্তিতে যেতে বাধ্য হয়। এধরনের চুক্তির মূল উদ্দেশ্য একাধিক দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কোনও নদীর জলধারাকে কী প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রণ করা হবে তা ঠিক করা। পাশাপাশি, এই সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়গুলিকে চিহ্নিত ও নির্দিষ্ট করা।

দক্ষিণ এশিয়ার ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, চীন ইত্যাদি দেশে বিশ্বের অন্যান্য বহু রাষ্ট্রের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে জলসম্পদের ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে, এই দেশগুলিতে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হওয়া সত্ত্বেও প্রায়শই জলের অভাব দেখা দেয়। এর মূল কারণ সার্বিক জল সংরক্ষণ ব্যবস্থার ঘাটতি ও পরিকল্পনা রূপায়ণে ব্যর্থতা। ভারত বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৬.৯ শতাংশ; ভূ-খণ্ডের প্রায় আড়াই শতাংশ ও মোট জলসম্পদের ৪ শতাংশ অধিকার করে আছে।

স্থল সীমাযুক্ত প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে আন্তর্দেশীয় বা আন্তর্জাতিক নদী নিয়ে বহু সময়ে ভারতের মত পার্থক্য হয়েছে। দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা বা চুক্তির মধ্য দিয়ে মতানৈক্যের কৌশলগত সমাধান সূত্র খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে বিবাদমান উভয় রাষ্ট্রই। এভাবে বহু সমস্যার সমাধানও সম্ভব হয়েছে। তবে আজও এমন কিছু বিষয় রয়ে গেছে, যেমন—জলস্তরের বৃদ্ধি, হিমবাহের গলন, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, নদীর স্বাভাবিক গতিপথের পরিবর্তন যার প্রভাব চুক্তি করে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। ভারত মূলত দু'টি আন্তর্জাতিক জলচুক্তি সম্পাদিত করেছে। (১) ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৬০ সালে স্বাক্ষরিত 'সিন্ধু জলচুক্তি', (২) ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ১৯৯৬ সালে স্বাক্ষরিত 'গঙ্গা জলবিভাজন চুক্তি'।

এছাড়াও জলসম্পদ ও সেই সূত্রে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, সেচ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে বিভিন্ন সময়ে ভারত একাধিক চুক্তি, সমঝোতায় এসেছে, যার ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভবান হয়েছে উভয় দেশই। এরকম কয়েকটি সমঝোতা নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

ভারত ও নেপাল : জল সমঝোতা

ভারতের উত্তরে অবস্থিত স্থলবেষ্টিত রাষ্ট্র নেপাল, ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং নেপালের জলসম্পদ ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ।

নেপালের জলসম্পদ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা অর্থনৈতিক দিক থেকে ভারত-নেপাল সম্পর্ককে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছে। বর্তমানে নেপালের জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৮০,০০০ মেগাওয়াট, যার একটি বড় অংশই তারা ভারতকে বিক্রি করে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভারত-নেপাল সম্পর্কের সূত্রপাত হয় ১৯২০ সালে মহাকালী নদীর উপর সারদা ব্যারেজ নির্মাণের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে, ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মহাকালী নদীর সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে ভারত ও নেপাল সরকার 'মহাকালী' চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'পঞ্চেশ্বর বহুমুখী নদী প্রকল্প' (Pancheswar Multipurpose Project) নির্মাণ করা; যা প্রায় ৫৫০০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ধরে। ভারত ও নেপালের যৌথ বিশেষজ্ঞ দল দ্বারা এই প্রকল্প নির্মাণের কাজটি সম্পন্ন হয়। প্রকল্পের মাধ্যমে ভারতে এক মিলিয়ন হেক্টর ও নেপালের ০.৭ মিলিয়ন হেক্টর কৃষিজমি সেচ ব্যবস্থার অধীনে আনা সম্ভব হয়েছে। কালি ও সোন নদীর ভয়াবহ বন্যা মোকাবিলা করতেও সাহায্য করেছে এই প্রকল্প। যা দুই দেশের উন্নয়নে গঠনমূলক পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে।

ভারত ও ভুটান : জল সমঝোতা

ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দেশের উত্তরে অবস্থিত ছোট পার্বত্য রাষ্ট্র ভুটানের সাথে ভারতের সম্পর্ক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভারত ও ভুটানের মধ্যে জলসম্পদ নিয়ে বিভিন্ন সমঝোতা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। ১৯৫৫ সালে ভারত সরকারের বিদেশমন্ত্রক ভারত ও ভুটানের যৌথ নদীগুলির বন্যা পূর্বাভাস ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯-টি বৃষ্টিপাত পরিমাপক কেন্দ্র (Rain Measure Station) ও বেতার পরিষেবার জন্য আটটি কেন্দ্র (Wireless Centre) গড়ে তোলা। ভারত সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে গড়ে তোলা এই কেন্দ্রগুলি ভুটান সরকারকে প্রত্যার্পণ করে ভারত।

১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে "Comprehensive Scheme for Establishment of Hydro-meteorological and Flood Forecasting Network on Rivers common to India-Bhutan"—এই প্রকল্পের মাধ্যমে ভারত ও ভুটানের মধ্যে প্রবাহিত যৌথ নদীগুলির বন্যা প্রবণতার পূর্বাভাস অনুধাবনের ও আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ৩২-টি জল-আবহাওয়া (Hydro-meteorological) কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় জল আয়োগ এইসব কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বন্যা সম্ভাবনা পর্যালোচনা করে থাকে। দুই দেশের উন্নয়নের কাজেই এই উদ্যোগ বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

২০০৬ সালে ভারত ও ভুটান সরকার জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ নিয়ে একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তিতে বলা হয় চুখা, টালা ও কুরিচুতে তিনটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ও উন্নয়নের ব্যয়ভার ভারত সরকারের; বিনিময়ে ভারত পাবে ৫০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। ২০০৮ সালে চুক্তি পুনর্নবীকরণের মাধ্যমে ৫০০০ মেগাওয়াটের পরিবর্তে ভারত ১০০০০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ আমদানি নিশ্চিত করে।

"একটি নদী যদি একাধিক রাজ্য বা দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তাকে যথাক্রমে আন্তঃরাজ্য বা আন্তর্দেশীয় নদী বলে। এই আন্তর্দেশীয় বা আন্তর্জাতিক নদীর উপর একাধিক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়। নদীর যে অংশ যে দেশের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলে সেই অংশের উপর সেই দেশের অধিকার বিস্তৃত থাকে। আন্তর্জাতিক নদীগুলি প্রভাবিত করে সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিল্প ও উন্নয়নের ধারাকে, ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে তৈরি হয় নদীর উপর অধিকার কায়েম ঘিরে বিবাদ। এই বিবাদ মীমাংসার জন্য সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলি সংশ্লিষ্ট নদী বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে, তার জল বণ্টন নিয়ে বিভিন্ন সমঝোতা বা চুক্তিতে যেতে বাধ্য হয়।"

বাংলাদেশ ও ভারত : জল সমঝোতা

নদীমাতৃক বাংলাদেশের অধিকাংশ নদী হিমালয় থেকে উৎপন্ন। ভারত ও বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতি—কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ প্রকল্প, মৎস্য ও সর্বোপরি যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম মাধ্যম হল জল। নিজ নিজ উন্নয়নের স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার সূত্রে এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে জল নিয়ে বিবাদের সূত্রপাত। বিবাদমান দেশের তকমা ঝেড়ে ফেলতে তথা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের স্বার্থে ১৯৯৬ সালে ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে গঙ্গা নদীর জল বণ্টন নিয়ে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বলা হয়, এই চুক্তি পরবর্তী ৩০ বছর ধরে স্থায়ী থাকবে। এই সময়পর্বের পর চুক্তিটিকে নিয়ে নতুন করে আলোচনায় বসে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। দু' দেশের মধ্যে (গঙ্গা) জল বণ্টন সমস্যার বীজ কিন্তু পোঁতা হয়েছিল সেই ১৯৭৪ সালেই। এই সময় পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার ফারাক্কাতে বিশাল জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে ওঠায়। ফারাক্কা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য গঙ্গার ওপর বাংলাদেশ থেকে ১৮ কিলোমিটার পশ্চিমে বাঁধ দিয়ে বিশাল জলাধার গড়ে তোলা হয়। গ্রীষ্মকালে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জলের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, ফলে বাংলাদেশ পদ্মা (সে দেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গার অংশ) নদীতে পর্যাপ্ত পরিমাণ জলপ্রবাহ থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। ফলস্বরূপ, বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থার উপর আঘাত তীব্র হয়। অন্যদিকে, বর্ষাকালে গঙ্গায় জলের প্রাচুর্যতার কারণে ফারাক্কা জলাধারের সুরক্ষার দিকটি মাথায় রেখে সময় সময় অতিরিক্ত জল ছাড়তে বাধ্য হয় ভারত—যা বাংলাদেশে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টিতে অনুঘটক হিসাবে

কাজ করে। এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে দুই প্রতিবেশী ভারত ও বাংলাদেশ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে গঙ্গা জল বণ্টন চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন (JRC) কার্যকারী হয় ১৯৭২ সাল থেকে। কমিশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল উভয় দেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত, এমন নদীগুলি থেকে যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে সর্বাধিক সুবিধালাভ সুনিশ্চিত করা।

তিস্তা-সহ ফেনী, মনু, মুহুরি, গুমতি, জলঢাকা ও তোর্সা—এই আট নদীর জল বণ্টন নিয়ে বাংলাদেশের সাথে বর্তমানে আলোচনা চলছে। তিস্তা ও ফেনী নদীর জল বণ্টন নিয়ে চুক্তিবদ্ধ হতে বাংলাদেশ ও ভারত সরকার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। অন্যদিকে, গঙ্গা, তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র ও বারাক নদীতে বর্ষা মরসুমে অতিরিক্ত জলপ্রবাহের কারণে সৃষ্ট বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও তার পূর্বাভাস দেওয়া ইত্যাদি কৌশলগত উদ্যোগেও ভারত-বাংলাদেশ বিভিন্ন সময়ে পারস্পরিক সহযোগিতায় হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

ভারত ও চিন : জল সমঝোতা

দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষমতাশালী দুই রাষ্ট্র ভারত ও চিন। একবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারত ও চিন জল বণ্টন বিষয় নিয়ে প্রথম সমঝোতাপত্রে স্বাক্ষর করে। ভূ-রাজনীতিবিদদের মতে যা ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী।

ভারত ও চিনের মধ্যে প্রবাহিত নদীগুলিকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র, সুবনগিরি ও লোহিত—চিন থেকে আগত। ব্রহ্মপুত্র চিনে আসাংপো নামে পরিচিত। অন্যদিকে, উত্তর ভারতের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ নদী সিন্ধু ও শতদ্রু—চিন ভূ-খণ্ডে উৎপত্তি লাভ করেছে।

২০০২ সালে ভারত ও চিন সরকার সমঝোতাপত্রে (MoU) স্বাক্ষরের মাধ্যমে ব্রহ্মপুত্র নদীর জলবিজ্ঞান সম্পর্কীয় তথ্য পাঁচ বছরের জন্য পারস্পরিক আদান-প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ব্রহ্মপুত্র নদীতে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় এই জলবিজ্ঞান সম্পর্কীয় তথ্যগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। চিনে অবস্থিত তিনটি যৌথ আবহ কেন্দ্র—নুগেংহা, ওয়াংকন ও নুস্কিয়া ভারত সরকারকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যাকায় (চিন) বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, জলস্তরের হ্রাস-বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্য জমা জলের পরিমাণ, জলস্তরের পরিমাণের বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করে থাকে। এই সমঝোতাপত্র পাঁচ বছর অন্তর অন্তর পুনর্নবীকরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সংশ্লিষ্ট দুই রাষ্ট্র—ভারত ও চিন।

২০০৫ সালে অনুরূপ সমঝোতাপত্র (MoU) স্বাক্ষরিত ও বাস্তবায়িত হয় শতদ্রু নদীর ক্ষেত্রে। এটিও পাঁচ বছর অন্তর পুনর্নবীকরণযোগ্য। জলবিজ্ঞান সম্পর্কীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য ভারত ও চিন সরকার-এর যৌথ উদ্যোগে শতদ্রু নদীর উপর চিনের সুডা (Tsuda)-তে একটি জলানুসন্ধান কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়।

২০১১ সালে চিনের বেজিং শহরে শেষবার সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এর মাধ্যমে উভয় দেশের মধ্যে জল সম্পর্কীয় তথ্য আদান-প্রদান, তথ্য সরবরাহ পদ্ধতি, জনবসতির অগ্রগতি বিশেষ উপকৃত হয়। ভারতের কেন্দ্রীয় জল আয়োগ এই তথ্যের ভিত্তিতে জলসম্পদ উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার পরিকল্পনা করে থাকে।

ভারত ও পকিস্তান : জল সমঝোতা

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় থেকেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ভূ-খণ্ড ভাগের সাথে সাথেই জল বিবাদেরও সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তী সময়ে 'সিন্ধু জল বণ্টন চুক্তি' বা 'Indus Water Treaty' (IWT) স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৬০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর স্বাক্ষরিত এই চুক্তি জল নিয়ে দু' দেশের বিবাদের সাময়িক অবসান ঘটায়। এই চুক্তি বাস্তবায়িত করতে এবং উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে বিশ্ব ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বিভিন্ন সময়ে জল বণ্টন সম্পর্কীয় বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে নানা ধরনের বিতর্কের সূত্রপাত হয়। এই বিতর্কের কেন্দ্রস্থলে ছিল ১৯৪৭ সালে উলার বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প, ১৯৯২ সালে কিষাণগঙ্গা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং এই একই বছর চেনাব নদীর ওপর বাগলিহার বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প। পকিস্তানের মূল বক্তব্য হল, ভারতের তরফে এসব বাঁধ নির্মাণের কারণে সে দেশের নদীসমূহে জলধারার প্রবাহ ব্যাহত হচ্ছে বা প্রবাহপথের পরিবর্তন ঘটছে—ফলত লঘিত হচ্ছে চুক্তির শর্তসমূহ।

উপসংহার

আন্তর্দেশীয় বা আন্তর্জাতিক জল চুক্তি হল বিবাদ নিষ্পত্তির একটি পদ্ধতি। জল চুক্তির মাধ্যমে কোনও একটি নির্দিষ্ট সময়ে দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে গড়ে ওটা বিবাদ আংশিক মাত্রায় নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়। কিন্তু জলসম্পদ ও তার চাহিদা, ব্যবহারযোগ্যতা, উপযোগিতা সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়। তাই চুক্তির বিষয়বস্তু ও বাস্তবতার মূল্যায়নও পরিবর্তন সাপেক্ষ। জলসম্পদ মূল্যায়নের পাশাপাশি নদী অববাহিকার সার্বিক উন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত ক্রমবিকাশের পথ প্রসারিত করা একান্ত জরুরি। জল চুক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষ, বসতি, জনজীবন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখাও বিশেষ জরুরি। আন্তর্জাতিক জল চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে জলসম্পদের ব্যবহারযোগ্যতার সর্বোচ্চ পরিসীমা যেন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ডেকে না আনে, সে সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টিভঙ্গি রাখা নিতান্ত প্রয়োজন।❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের সহকারী অধ্যাপক।)

নিরাপদ পানীয় জল : স্বাস্থ্য রক্ষার প্রথম শর্ত

*নিরাপদ পানীয় জল, স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যেস এবং উন্নত স্যানিটেশন—স্বাস্থ্য সুরক্ষার গোড়ার কথা এই তিনটিই। কিন্তু তিনটি মাপকাঠির বিচারেই এ দেশের হাল অত্যন্ত শোচনীয়। যথেচ্ছভাবে ভূ-গর্ভের জল নিষ্কাশন, নদীর জলে অপরিশোধিত বর্জ্যের অপসারণ ইত্যাদি নানান কারণে নিরাপদ পানীয় জল পাওয়ার সম্ভাবনা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। তার ওপর দেখা দিয়েছে আর্সেনিকের বিপদ। বাড়ছে বিভিন্ন রোগব্যাধির প্রকোপ। প্রতিকারের উপায় একটাই—মানুষের মধ্যে সচেতনতার প্রসার। লিখেছেন—***এস. কে. সরকার**

পৃথিবীর বুকে মোট যত পরিমাণ জলসম্পদ রয়েছে তার মাত্র ৩.৪ শতাংশই মানুষের কাছে লাগে। এর মধ্যে আবার ৭০ শতাংশই চলে যায় কৃষি-কাজে, ২২ শতাংশ যায় শিল্পক্ষেত্রে। আর বাকি ৮ শতাংশ ব্যবহৃত হয় গৃহস্থালীর কাজে। সমীক্ষায় জানা গেছে যে, বর্তমানে নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন উৎস থেকে দীর্ঘস্থায়ী ভিত্তিতে মিষ্টি জলের যে জোগান রয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে তার তুলনায় চাহিদা বেড়ে যাবে প্রায় ৪০ শতাংশ। জলবায়ু পরিবর্তনজনিক কারণে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশভেদে জলের জোগানের ক্ষেত্রে বিপুল তারতম্য দেখা দেবে।

ভারতে ইতোমধ্যেই মাথাপিছু জলের জোগানের ক্ষেত্রে বেশ টানাটানি দেখা দিয়েছে এবং এভাবে চললে অচিরেই দেশে জলসংকট তৈরি হবে। তীব্র জলসংকট মানেই একদিকে জলবাহিত অসুখ-বিসুখের বাড়বাড়ন্ত, অন্যদিকে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রের উৎপাদনশীলতা হ্রাস, পানীয় জলের জন্য হাহাকার ইত্যাদি ইত্যাদি। বর্তমানে সামগ্রিকভাবে এ দেশের জলের গুণমান বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে পরিস্থিতি বেশ শোচনীয়। নিরাপদ পানীয় জলের জোগানের সম্ভাবনা ক্রমশ কমছে। বর্তমানে ভূ-তল এবং ভূ-গর্ভস্থ জলের প্রায় ৭০ শতাংশই দূষিত।

জলের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার বেশি ('বিয়ন্ড থ্রেশহোল্ড লেভেল') কোনও দূষিত পদার্থের উপস্থিতির নিরিখে জলের গুণমান নির্ধারণ করা হয়। যেমন—মিষ্টি জলের গুণমান নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত মাপকাঠির মধ্যে অন্যতম হল জৈব অক্সিজেন বা বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন চাহিদার (BOD) মাত্রা এবং মোট কলিফর্ম ও ফিক্যাল কলিফার্মের মাত্রা। উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে খুব সামান্য পরিমাণে বর্তমান এমন কিছু রাসায়নিক পদার্থ বা ট্রেস এলিমেন্টের উপস্থিতির পরিমাণ, মিষ্টি জল ও নোনা জলের মিশ্রণের হার ইত্যাদি মাপকাঠির নিরিখে ভূ-গর্ভস্থ জলের গুণমান নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। 'ট্রেস এলিমেন্টের' মধ্যে আর্সেনিক বা বিভিন্ন ধাতু থাকতে পারে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদন (CPCB, ২০১৩) থেকে জানা গেছে যে, BOD বা কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতির মাত্রার নিরিখে কিছু চিহ্নিত স্থানে, যখন নদীর জলের গুণমান যাচাই করা হয়েছে তখন প্রচণ্ড পরিমাণে দূষণ লক্ষ্য করা গেছে। এ থেকেই বোঝা যায় যে দেশের বিভিন্ন অংশে জলের গুণগত মান ক্রমশই খারাপ হচ্ছে। আবার অন্যদিকে অন্তর্দেশীয় বিভিন্ন জলাভূমির লবণাক্ত জল, উপকূল অঞ্চলের লবণাক্ত জল, ফ্লুওরাইড, আর্সেনিক, লোহা, নাইট্রেট ইত্যাদি ভূ-গর্ভের জলকে দূষিত করছে। এই ধরনের জল দূষণের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে রাজস্থান, গুজরাট, বিহার, অসমের মতো রাজ্য।

"মাত্রারিতিক্ত নিষ্কাশনের ফলে ভূ-গর্ভের জল দূষিত হয়। এর ফলে অন্তর্দেশীয় জলাশয়গুলি জলও লবণাক্ত হয়ে পড়ে। এছাড়া মিষ্টি জলস্তরের উপরিভাগে নোনা জলস্তরের অবস্থান, আগ্নেয় ও পাললিক—এই উভয় প্রকার শিলাস্তরে ফ্লুওরাইড ধাতুর উপস্থিতি, কীটনাশক ও আগাছানাশক হিসাবে বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থে আর্সেনিক ও তার বিভিন্ন যৌগের ব্যবহার ভূ-গর্ভের জল দূষণের অন্যতম কারণ।"

বর্জ্য জল পরিশোধন কেন্দ্র (এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট) সাধারণ বর্জ্য পরিশোধন কেন্দ্র (কমন এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট) ও নিকাশি জল পরিশোধন কেন্দ্র (সিউয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট)-গুলির কাজকর্মে অদক্ষতার কারণেই মূলত নদীর জল দূষিত হয়। এই কেন্দ্রগুলি সঠিকভাবে কাজ করে না বলেই অংশত অপরিশোধিত শিল্প-বর্জ্য বা পৌর-বর্জ্যের স্থান হয় নদীতে। এছাড়াও উৎসস্থলেই দূষিত আবর্জনা পরিশোধনের কোনও ব্যবস্থা না থাকার ফলেও নদীগুলির দূষণের সম্ভাবনা বাড়ে। কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ রয়ে যাওয়া বিভিন্ন কৃষিজাত বর্জ্য থেকেও নদীর জল দূষণের সম্ভাবনা রয়ে যায়। ধর্মীয় আচারবিধি, পূজাপাঠের জন্য নদী তীরে জমা

করা বিভিন্ন সামগ্রী থেকেও জল দূষিত হয়।

অন্যদিকে মাত্রারিতিক্ত নিষ্কাশনের ফলে ভূ-গর্ভের জল দূষিত হয়। এর ফলে অন্তর্দেশীয় জলাশয়গুলি জলও লবণাক্ত হয়ে পড়ে। এছাড়া মিষ্টি জলস্তরের উপরিভাগে নোনা জলস্তরের অবস্থান, আগ্নেয় ও পাললিক—এই উভয় প্রকার শিলাস্তরে ফ্লুওরাইড ধাতুর উপস্থিতি, কীটনাশক ও আগাছানাশক হিসাবে বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থে আর্সেনিক ও তার বিভিন্ন যৌগের ব্যবহার ভূ-গর্ভের জল দূষণের অন্যতম কারণ। ভূ-গর্ভের জল নিষ্কাশনের সর্বভারতীয় গড় হার যেখানে ৬১ শতাংশ, সেখানে পাঞ্জাব ও হরিয়ানাতেই ১০০ শতাংশেরও বেশি জল নিষ্কাষিত হয় ভূ-গর্ভ থেকে। এই কারণেই এই রাজ্যগুলির শুষ্ক/প্রায় শুষ্ক অঞ্চলগুলিতে জলে নোনাভাব বেশি। এছাড়া ভূ-গর্ভের ২০০ থেকে ১০০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত মধ্যবর্তী জলস্তরে আর্সেনিক ও তার বিভিন্ন যৌগের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তবে আরও গভীর জলস্তরে অবশ্য এই সমস্যা থাকে না।

নদীর তীরে অবস্থিত বেশিরভাগ ছোট বা বড় শহরের ক্ষেত্রে একটা জিনিসের ব্যতিক্রম কখনোই হয় না—সব জায়গাতেই অপরিশোধিত সমস্ত পৌর-বর্জ্য গিয়ে পড়ে নদীতে। যেমন, পাটনা শহরে গঙ্গার সমান্তরালভাবে যে রাজপুর নালা রয়েছে, তার মাধ্যমে শহরের সমস্ত বর্জ্য গিয়ে পড়ছে। এর ফলে নদীর জলে মিশছে প্রচুর পরিমাণে ফিক্যাল কলিফর্ম। আবার গুরগাঁও শহরের কথাই ধরা যাক। এই শহরে প্রতিদিন যে বর্জ্য পদার্থ তৈরি হয় তার ৫০ শতাংশ যমুনা নদীতে ফেলার আগে পরিশোধন করে নেওয়া হয় বলেই কর্তৃপক্ষের দাবি। কিন্তু তারপরেও বাকি ৫০ শতাংশ বর্জ্য খোলা রাস্তায় পড়ে থাকে। এখান থেকে বর্জ্য জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে ভূ-গর্ভে প্রবেশ করে। ফলে ভূ-গর্ভের জলেও দূষণ ছড়ায়। সংশ্লিষ্ট পুরসভাগুলিকে শহরের যাবতীয় বর্জ্য নদীতে বা অন্যত্র ফেলার আগে কোনও একটি বিশেষ স্থান থেকে সংগ্রহ করে পরিশোধনের ব্যবস্থা করতে উৎসাহিত করাটাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ পুরসভাগুলির কাছে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও অর্থের এখন বড়ই অভাব।

নন-পয়েন্ট পলিউশন বা সুবিস্তৃত স্থান থেকে যেসব ক্ষেত্রে (যেমন, কৃষিজমি থেকে যে জল গড়িয়ে আসে) দূষণ ছড়ায়, সেখানে পলি, রাসায়নিক দ্রব্য বা কীটনাশকও চলে আসতে আসতে পারে। এর প্রতিকারের পথ হিসেবে দূষিত পদার্থগুলিকে উৎসেই আটকানো উচিত, যাতে তা কোনও মতেই বাহিত হয়ে জলে মিশতে না পারে; অন্যথায় দূষিত পদার্থগুলি ইতোমধ্যেই জলে মিশে গিয়ে থাকলে তা নদীতে গিয়ে পড়ার আগেই পরিশোধনের ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে চিরাচরিত কাঠামোর মধ্যে থেকে বা কাঠামো-বহির্ভূত বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া যায়। পরিবেশ পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে উৎসস্থলেই দূষিত পদার্থগুলিকে আটকানো, নদীর জলে গিয়ে পড়ার আগেই দূষিত পদার্থগুলির পরিশোধনের মতো ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

"আর্সেনিক থেকে যে ক্যান্সার ছড়ায় তা ইতোমধ্যেই বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। দীর্ঘদিন ধরে আর্সেনিক মিশ্রিত জল খেয়ে গেলে স্বাস্থ্যের প্রচণ্ড ক্ষতি হতে বাধ্য। দীর্ঘকালীন বা ক্রনিক আর্সেনিক বিষক্রিয়ার সাধারণ কিছু কিছু উপসর্গ, রয়েছে যেমন—চামড়ায় লালচে দাগ, মাত্রার বিচারে ডাক্তারি পরিভাষায় যেগুলিকে বলা হয় যথাক্রমে হাইপার পিগমেন্টেশন, ডাই-পিগমেন্টেশন ও কেরাটোসিস এবং এগুলি থেকে ত্বকের, এমনকী ফুসফুসের ক্যান্সারও হতে পারে। জলের আর্সেনিক মিশলে খাদ্যশৃঙ্খলেও তার প্রভাব পড়ে।"

আর্সেনিকের বিপদ

সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্য সুরক্ষা তথা অসুস্থতার প্রকোপ ও মৃত্যুহার ঠেকানোর জন্য জল সরবরাহের মান উন্নত করতে হবে এবং সেই সঙ্গে সকলের কাছে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দিতে হবে। আগেই বলা হয়েছে যে আর্সেনিক-ফ্লোরাইডের মতো পদার্থের উপস্থিতিতে জলে দূষণ ছড়ায়। প্রকৃতি থেকে যত দূষণ সৃষ্টিকারী পদার্থ জলে মেশে তার মধ্যে আর্সেনিকই বোধহয় সবচেয়ে বিপজ্জনক। আর্সেনিক দূষণের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এশিয়া। এর নেপথ্যে অবশ্য একাধিক কারণ রয়েছে। পানীয় জলে আর্সেনিক থাকার কারণে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের ৯০ শতাংশেরই বাস এশিয়ায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেকং নদী অববাহিকায় অবস্থিত বিভিন্ন দেশ, যেমন—ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, লাওস, কাম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম আর্সেনিক দূষণে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর্সেনিক দূষণের কবলে পড়েছে চিন এবং তাইওয়ানও। আর্সেনিক দূষণের আশঙ্কা রয়েছে এমন এলাকাগুলিতে ১৫ কোটিরও বেশি মানুষের বাস বলে খবর।

আর্সেনিক থেকে যে ক্যান্সার ছড়ায় তা ইতোমধ্যেই বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। দীর্ঘদিন ধরে আর্সেনিক মিশ্রিত জল খেয়ে গেলে স্বাস্থ্যের প্রচণ্ড ক্ষতি হতে বাধ্য। দীর্ঘকালীন বা ক্রনিক আর্সেনিক বিষক্রিয়ার সাধারণ কিছু কিছু উপসর্গ, রয়েছে যেমন—চামড়ায় লালচে দাগ, মাত্রার বিচারে ডাক্তারি পরিভাষায় যেগুলিকে বলা হয় যথাক্রমে হাইপার পিগমেন্টেশন, ডাই-পিগমেন্টেশন ও কেরাটোসিস এবং এগুলি থেকে ত্বকের, এমনকী ফুসফুসের ক্যান্সারও হতে পারে। জলের আর্সেনিক মিশলে খাদ্যশৃঙ্খলেও তার প্রভাব পড়ে। আর, যেসমস্ত জনগোষ্ঠী আর্সেনিক দূষণের আওতাভুক্ত এলাকায় বাস করেন না তারাও পরোক্ষে এর বিষক্রিয়ার

শিকার হয়ে যান। বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে যে আর্সেনিক মিশ্রিত জলে চাষ হওয়া খাদ্যশস্য, শাকসবজি, ফলমূল বা এই ধরনের জলে রান্না করা খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে দিয়েও শরীরে আর্সেনিক ঢুকতে পারে এবং তার মাত্রাটা নেহাত কম নয়।

প্রতিকারের উপায়

প্রথমত, আর্সেনিক দূষণের ক্ষয়ক্ষতি যথাসম্ভব কমানোর লক্ষ্যে নীতি প্রণয়নের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। বৃষ্টির জল বা ভূ-পৃষ্ঠ অথবা ভূ-গর্ভের নিরাপদ জল ব্যবহারের ওপর জোর দিতে হবে এই নীতিতে। পুকুর, দীঘি বা সরোবরের মতো ভূ-পৃষ্ঠের পুরোনো হয়ে যাওয়া জলের বিভিন্ন উৎসের সংরক্ষণ ও সংস্কারের ওপরও যথাসম্ভব নজর দিতে হবে। নতুন নতুন প্রযুক্তির সম্ভাবনা পরীক্ষামূলকভাবে খতিয়ে দেখার পর প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং তার জন্য প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ প্রয়োজন। আর্সেনিক দূরীকরণ কর্মসূচি রূপায়ণের কাজে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকেও শামিল করা যেতে পারে। এছাড়া জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের মতো সংস্থার তত্ত্বাবধানেই সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্পগুলি রূপায়ণের কাজ হাতে নেওয়া উচিত। কারণ তাতে জলের যথাযথ গুণমান, পরিমাণ যেমন বজায় থাকবে তেমনই কাজের স্বচ্ছতাও সুনিশ্চিত করা যাবে।

দ্বিতীয়ত, আর্সেনিকের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর কাজে যথাযথ নজরদারি ও ঝুঁকি মোকাবিলার বিষয়টি যেন অবশ্যই প্রয়োজনীয় গুরুত্ব পায়। ঠিক কোন উৎস থেকে জলে আর্সেনিক মিশছে তা চিহ্নিত করা, কূপগুলির গভীরতা নির্ণয়, জিপিএস (জিওগ্রাফিক পজিশনিং সিস্টেম)-এর ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়কে জলের গুণমানের ওপর নজরদারির সময় বিশেষভাবে মাথায় রাখতে হবে। এই কাজে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে শামিল করলে আখেরে সুফল মিলবে। আর্সেনিক দূষণের ক্ষেত্রে নজরদারির সময় জলে অম্ল-ক্ষারের মাত্রা বা PH ফ্যাক্টর এবং জলে লোহা, ফসফেট, বাইকার্বোনেট, ম্যাঙ্গানিজ এবং সালফেটের উপস্থিতি নির্ণায়ক পরীক্ষাও করতে হবে। ভূ-গর্ভে কৃত্রিমভাবে জল পরিপূরণের মাধ্যমে জলের উৎসগুলিকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে এবং উৎসস্থলেই দূষণ সৃষ্টিকারী পদার্থগুলিকে আলাদা করে দিয়ে জল স্তরের ওপর নজরদারি রাখতে হবে।

খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে শরীরে যাতে আর্সেনিকের বিষ প্রবেশ না করে তার জন্য খাদ্য নিরাপত্তার ওপর যথাসম্ভব নজর দিতে হবে। ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা এবং মান নির্ণায়ক কর্তৃপক্ষের (ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া, FSSAI) তরফে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে নানা ধাতুর উপস্থিতির যে সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে তা যেন অবশ্যই মেনে চলা হয়। চাষের কাজে বা রান্নার কাজে ব্যবহৃত জলের মাধ্যমে শরীরে আর্সেনিক প্রবেশ করছে কি না, তা নিশ্চিতভাবে জানতে গেলে সামগ্রিক খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খলের ওপর নিয়মিত নজরদারি চালানো প্রয়োজন। আর্সেনিকের বিপদপ্রবণ এলাকাগুলি থেকে খাদ্যদ্রব্য আনা-নেওয়া করার ফলে যেসমস্ত এলাকায় এই বিপদ নেই সেখানকার অধিবাসীরাও বিপদের বৃত্তের মধ্যে চলে আসে। শরীরের ভর তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় শিশুদের দেহে আর্সেনিক থেকে বিপদও বেশি। এই বিপদের মোকাবিলায় ফার্মাসিস্ট ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সরকারি স্বাস্থ্য কর্মসূচিগুলিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে হবে। কোন কোন নতুন এলাকায় আর্সেনিক দূষণ ছড়াচ্ছে তা চিহ্নিত করতে GIS বা জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেমের সাহায্য নিতে হবে।

চতুর্থত, জাতীয় ও রাজ্যস্তরে উপযুক্ত গুণমান সম্পন্ন ও নিরাপদ পানীয় জলের জোগান সুনিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগের প্রয়োজন। আর্সেনিকের বিপদ মোকাবিলা কর্মসূচিতে সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকেও কিন্তু শামিল করতে হবে। আর্সেনিকের বিপদ সম্বন্ধে আমজনতার মধ্যে সচেতনতা প্রসার অত্যন্ত জরুরি এবং এই কর্মসূচির প্রতিটি ধাপে তাদের যুক্ত করাটাও একান্তভাবে প্রয়োজন। জনসাধারণের সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে তোলার একটি যথাযথ পরিকল্পনাও স্থির করতে হবে। আর্সেনিক দূষণের কবলে পড়া এলাকাগুলিতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আচরণগত পরিবর্তনও জরুরি এবং তার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মসূচিতে তাদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

খোলা জায়গায় শৌচকার্য : এক গুরুতর সমস্যা

বিশ্বজুড়ে যতসংখ্যক মানুষ খোলা জায়গায় শৌচকার্য করে তাদের ৫০ শতাংশেরই বাস ভারতে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্টের (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল বা MDG) লক্ষ্য হিসাবে ২০১৫ সালে উন্নততর অনাময় বা স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার যে লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছিল তা পূরণ করতে পারেনি ভারত। সারা বিশ্বে যেখানে মোট ৯৬ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ খোলা জায়গায় শৌচকার্য করে, সেখানে শুধু ভারতেরই এই ধরনের মানুষের সংখ্যাটা ৫৬ কোটি ৪০ লক্ষ বলে জানা গেছে রাষ্ট্রসংঘের যৌথ নজরদারি কর্মসূচির প্রতিবেদনে (২০১৫ সাল)। এ দেশের শহরাঞ্চলের বস্তি, গ্রামগঞ্জ কোনও এলাকাই এই সমস্যা থেকে মুক্ত নয়। সরকারিভাবে স্বীকৃত শহরের বস্তি এলাকাগুলির ১৭ শতাংশ মানুষ এবং সরকারি স্বীকৃতিবিহীন বস্তি অঞ্চলে ৫০ শতাংশ অধিবাসীর কাছে উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থার কোনও সুযোগই নেই। ফলে খোলা জায়গায় শৌচকার্য করতেই বাধ্য হয় তারা।

খোলা স্থানে শৌচকার্যের বিপদ অনেক। এব ফলে মানব দেহের বর্জ্য পদার্থের নিরাপদে অপসারণ না হওয়ায় স্বাস্থ্যের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। বিশেষত, ভূ-পৃষ্ঠের জলের পাশাপাশি ভূ-গর্ভস্থ জলও দূষিত হয়। মানব দেহের বর্জ্য পদার্থগুলির মধ্যে মল থেকেই বিপদ ছড়ানোর সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। বিশ্বজুড়ে ডায়রিয়ার মতো পেটের অসুখে বছরে ১০ লক্ষেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। তাই মল জাতীয় বর্জ্যের অপসারণের যথাযথ ব্যবস্থাপনা চাই—জঞ্জাল বহনপাত্রকে ঠিকমতো খালি করা থেকে শুরু করে, পরিবহণ, পুনর্ব্যবহারের জন্য পাত্রের পরিশোধন, অপসারণ সবই পড়বে এই ব্যবস্থাপনার মধ্যে।

ছোট শহরগুলিতেই (যেসমস্ত শহরে জনসংখ্যা ১ লক্ষের কম) খোলা জায়গায় শৌচকার্যের সমস্যা সবচেয়ে বেশি। ২০১১ সালের জনগণনার তথ্য অনুযায়ী, ৮১.৪ শতাংশ পরিবারে বিভিন্ন ধরনের শৌচাগার রয়েছে, যেমন—সেপটিক ট্যাঙ্ক যুক্ত শৌচাগার (৩৮.২ শতাংশ), পিট বসানো শৌচাগার (৮.৮ শতাংশ), খাটা পায়খানা (১.৭ শতাংশ) এবং নিকাশি নালার সুবিধাযুক্ত ৩২.৭ শতাংশ পরিবার। অন্যদিকে ১৮.৬ শতাংশ পরিবারে কোনও শৌচালয় নেই। তাদের একাংশ (৬ শতাংশ) জনসাধারণের ব্যবহার্য শৌচালয়গুলি ব্যবহার করেন এবং বাকিরা (১২.৬ শতাংশ) শৌচকার্য করেন খোলা জায়গায়। সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘস্থায়ী বিকাশের জন্য নিরাপদ জল, উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসম্মত বিভিন্ন অভ্যেস গড়ে তোলা ভীষণভাবে জরুরি। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বচ্ছ ভারত মিশন (শহরাঞ্চলীয়) কর্মসূচির আওতায় ২০১৯ সালের মধ্যে খোলা জায়গায় শৌচকার্য পুরোপুরি বন্ধ করার যে লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে তা অবশ্যই সাধুবাদ যোগ্য।

প্রয়োজন সর্বাত্মক উদ্যোগ

প্রথমত, স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রধান তিনটি শর্ত হল উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যেস এবং নিরাপদ জল। তিনটি ক্ষেত্রে জাতীয় ও রাজ্যস্তরে গৃহীত নীতিগুলি যেন একে অপরের পরিপূরক হয়। এছাড়াও, বিভিন্ন স্তরে এই নীতিগুলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাজের মধ্যে সমন্বয় থাকাটা দরকার।

দ্বিতীয়ত, দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কাল ও তার পরবর্তী সময়ে ভূ-গর্ভের সমস্ত জলস্তরের অবস্থা খতিয়ে দেখার যে উদ্যোগ কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে নেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত সময়োচিত এক পদক্ষেপ। কিন্তু এই উদ্যোগের সফল রূপায়ণের জন্য পরিপূরক বিভিন্ন কাজে সংশ্লিষ্ট সমস্ত অংশীদারের সংক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। কাজটি দুরূহ সন্দেহ নেই। কারণ, এখানে প্রতিটি অংশীদারকে কাজটির গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত করে তাদের এই উদ্যোগে যুক্ত করতে হবে। ভূ-গর্ভস্থ জলস্তরের প্রকৃত অবস্থা খতিয়ে দেখার পরই সরকার ও বিভিন্ন অংশীদারের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভূ-গর্ভে জল পূরণ, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, ভূ-গর্ভস্থ জলকে দূষণ মুক্ত করার মতো প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

এরপর আসে নিয়ামক ব্যবস্থার কথা। বর্তমানে চালু "Easement Act" অনুযায়ী জমির মালিক তার জমি থেকে যত খুশি ভূ-গর্ভের জল নিষ্কাশন করতে পারেন। যথেচ্ছ এই জল নিষ্কাশনের ফলে অন্যানদের কতটা ক্ষতি হচ্ছে এটা তারা বিবেচনা না করলেও চলে। এই ধরনের আইনের পর্যালোচনা করে তাতে যুক্তিসঙ্গত পরিবর্তন আনা অত্যন্ত জরুরি।

তৃতীয়ত, নদীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বদলে এবার থেকে নদী অববাহিকাভিত্তিক জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা করে তার রূপায়ণ ঘটাতে হবে। এছাড়া ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূ-গর্ভের জলের মধ্যে যে একটা সামঞ্জস্য রাখা প্রয়োজন সেই বিষয়টিকে স্বীকৃতি দিতে হবে। যেগুলি নির্দিষ্ট উৎস বা 'পয়েন্ট সোর্স' (যেমন, শিল্প) এবং সুবিস্তৃত উৎস বা নন-পয়েন্ট সোর্স (যেমন, কৃষিজমি থেকে গড়িয়ে আসা জল)-সহ দূষণগুলিকে চিহ্নিত করে সেই উৎসস্থলেই দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের 'নমামি গঙ্গে' কর্মসূচিতে এই ধারণাগুলি কিছুটা হলেও গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় নদীর আশেপাশে কলকারখানার বর্জ্য পরিশোধনের পরই যাতে নদীতে ফেলা হয় তা সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি, নদী তীরের সৌন্দর্যায়ন, সুবিস্তৃত উৎসগুলি থেকে দূষণ রোধ, প্রকৃত সময়ের ভিত্তিতে নজরদারির ব্যবস্থা, নদীর তীরে ধর্মীয় আচরণের পর পড়ে থাকা জঞ্জাল অপসারণের ব্যবস্থা এবং অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় উন্নততর ব্যবস্থাপনা ও বনসৃজন তথা বনসংরক্ষণ, জলজ প্রাণীকূল-সহ সামগ্রিকভাবে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শুধু গঙ্গা নয়, অন্যান্য নদীর ক্ষেত্রেও এই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করা যেতে পারে। দূষিত জল, অনাময় বা উপযুক্ত স্যানিটেশন অবস্থার অভাব, স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যেস গড়ে না ওঠে, মানবদেহের বর্জ্য অপসারণ ব্যবস্থার বেহাল দশা যে আখেরে কতটা বিপদ ডেকে আনতে পারে সে ব্যাপারে কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও স্থানীয় স্তরে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মধ্যে সচেতনতা প্রচার একান্তভাবে প্রয়োজন। এই প্রচার চালানো গেলে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের পরিপূরক হিসাবে নাগরিক সমাজ তাদের নিজেদের মতো করে জলদূষণ রোধে একটা বড় ভূমিকা পালন করতে পারবে।❑

(**লেখক পরিচিতি :** লেখক নয়াদিল্লির TERI সংস্থার জলসম্পদ ও বনপালন বিভাগের ডিসটিংগুইশড ফেলো ও ডিরেক্টর এবং কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রকের প্রাক্তন সচিব। ইমেল : sksarkar@teri.res.in)

তথ্যসূত্র :

- Mara Duncan et al. Nov. 16, 2010. Sanitation and Health. Available at http://journals.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000363
- Bharat Girija and Sarkar S.K. Swachh Bharat Mission (Urban) towards cleaning India : A Policy Perspective. Policy brief by TERI, February, 2016
- WHO-UNICEF Joint Monitoring Programme Update 2016
- Proceedings of International Conference on Water Quality with special reference to arsenic : 18-20 February 2012, Kolkata. Published by PHED, Govt. of WB.

যমুনা কর্মপরিকল্পনা

দেশের নদী, জলাশয় ও জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় অনুদানপ্রাপ্ত প্রকল্প 'জাতীয় নদী সংরক্ষণ যোজনা' ও 'জলজ বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণের জন্য জাতীয় যোজনা' বাস্তবায়িত করছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের আওতাধীন জাতীয় নদী সংরক্ষণ নির্দেশালয়। নদী কর্মপরিকল্পনা (রিভার অ্যাক্শান প্ল্যান)-র উদ্দেশ্য নদীর চিহ্নিত দূষিত অংশে দূষণ প্রশমন প্রকল্প বাস্তবায়িত করে নদীর জলের মানোন্নয়ন। 'জলজ বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণের জন্য জাতীয় যোজনা'-র লক্ষ্য অভিন্ন নীতি-নির্দেশিকা অনুসরণ করে সুস্থায়ী সংরক্ষণ যোজনার মাধ্যমে জলজ বাস্তুতন্ত্র (জলাশয় ও জলাভূমি) সংরক্ষণ।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে 'জাতীয় নদী সংরক্ষণ যোজনা' বাস্তবায়িত করছে এবং এর আর্থিক খরচ বহন করছে।

ভারতীয় নদীর জল পরিষ্কার করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প, যমুনা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ৮৫ : ১৫ অনুপাতে আর্থিক খরচ বহন করছে।

যমুনা নদীতে দূষণ প্রশমনের জন্য রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টার পরিপূরক হিসেবে ভারত সরকার আভ্যন্তরীণ সূত্র ও 'জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা' (জেআইসিএ—জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশান এজেন্সি)-র আর্থিক সহায়তায় পর্যায়ক্রমে যমুনা কর্মপরিকল্পনার সূচনা করে। ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসে উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি ও হরিয়ানার ২১-টি শহরে শুরু হওয়া যমুনা কর্মপরিকল্পনার প্রথম পর্যায় শেষ হয় ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে—এই পর্যায় ৭০৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ৩৮-টি নিকাশী বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিওয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট) গড়া হয় যার মোট দৈনিক ক্ষমতা ৭৫৩.২৫ মিলিয়ান লিটার (উত্তরপ্রদেশে ৪০১.২৫ মিলিয়ান লিটার, হরিয়ানায় ৩২২ মিলিয়ান লিটার ও দিল্লিতে ৩০ মিলিয়ান লিটার)। ২০০৩ সালে 'জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা'-র আর্থিক সহায়তাতেই যমুনা কর্মপরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা হয়। এই পর্যায়ে উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি ও হরিয়ানার মোট ৮১১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। দৈনিক নিকাশী বর্জ্য পরিশোধন ক্ষমতা আরও ১৮৯ মিলিয়ান লিটার (দিল্লিতে ১৩৫ মিলিয়ান লিটার ও উত্তরপ্রদেশে ৫৪ মিলিয়ান লিটার) বাড়ানো হয়েছে এবং দিল্লিতে বর্তমান নিকাশী বর্জ্য পরিশোধনাগার পুনরুজ্জীবিত করে দৈনিক ক্ষমতা ৩২৮ মিলিয়ান লিটার করা হয়েছে।

যমুনা কর্মপরিকল্পনার তৃতীয় পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকার 'জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা'-র থেকে ঋণ নিয়ে দিল্লির জন্য ১,৬৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। কেন্দ্র ও রাজ্য (দিল্লির জাতীয় রাজধানী অঞ্চল) সরকার প্রকল্পের জন্য ৮৫ : ১৫ অনুপাতে যথাক্রমে ১৪০৭ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ও ২৪৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা আর্থিক খরচ বহন করবে। ঋণের জন্য 'জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা'-র সঙ্গে ইতোমধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে। এই পর্যায়ের কাজ ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা।

প্রকল্পের প্রস্তাবিত কার্যক্রম নিম্নরূপ :

(ক) দিল্লিতে ওখলা, কোন্ডলি ও রিথোলায় মোট ৮১৪ মিলিয়ান লিটার দৈনিক ক্ষমতাসম্পন্ন নিকাশী বর্জ্য পরিশোধনাগার পুনরুজ্জীবন ও আধুনিকীকরণ।

(খ) পূর্বোল্লিখিত নিকাশী বর্জ্য পরিশোধনাগারে উন্নত পর্যায়ের পরিশোধন ব্যবস্থা স্থাপন।

(গ) ওখলায় ১৩৬ মিলিয়ান লিটার দৈনিক ক্ষমতাসম্পন্ন নিকাশী বর্জ্য পরিশোধনাগারের পরিবর্তে সেখানে অত্যাধুনিক পরিশোধনাগার প্রতিষ্ঠা।

(ঘ) কোন্ডলি ও রিথোলার অববাহিকা অঞ্চলে নিকাশী প্রণালী/উলম্ব নলের পুনরুজ্জীবন।

(ঙ) গণ প্রচারাভিযান।❑

নমামি গঙ্গে : এক সংহত প্রয়াস

গঙ্গা দূষণ নিয়ে এদেশে প্রথম সরকারিস্তরে উদ্যোগ নেওয়া হয় ১৯৮৫ সালে গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান গঠনের মাধ্যমে। দুই পর্যায়ে এই পরিকল্পনা কাঙ্ক্ষিত ফল না দেওয়ায় পরবর্তীতে তৈরি করা হয় জাতীয় গঙ্গা নদী অববাহিকা কর্তৃপক্ষ—যার কাজকর্মও সন্তুষ্টিজনক নয়। তাই কেন্দ্রে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর চালু করা হয় নমামি গঙ্গে প্রকল্প—গঙ্গার দূষণ নিয়ন্ত্রণ তথা এর পুনরুজ্জীবন ঘটানোর লক্ষ্য নিয়ে এক সংহত প্রয়াস। লিখেছেন—**নির্মাল্য নাগ**

"বিস্তীর্ণ দু'পারের অসংখ্য মানুষের
হাহাকার শুনেও নিঃশব্দে নীরবে
ও গঙ্গা তুমি, ও গঙ্গা বইছ কেন?"

ভূপেন হাজারিকার এই গানটি অসমীয়া, বাংলা বা হিন্দিতে শোনেননি এমন মানুষের সংখ্যা খুব বেশি নয়। এ গান সবাই শুনেছি, তারিফ করেছি, তারপর অন্য কাজে মন দিয়েছি, ভেবে দেখিনি তার তাৎপর্য। এ গানে উল্লিখিত নদীটির কপালেও একই দুর্ভাগ্যের ছবি আঁকা। নদীর বিস্তীর্ণ দুই পারের সবাই এখানে স্নান করেছি, পুণ্য সঞ্চয় করেছি, স্নিগ্ধ হয়েছি, তারপর হেলায় জল ছেড়ে উঠে গেছি। একটি শব্দও খরচ করিনি গঙ্গোত্রীর উৎসমুখ থেকে নির্গত জলধারাটির অবস্থা নিয়ে। খোঁজও রাখিনি শত সহস্র বছর ধরে নিঃশব্দে নীরবে আমাদের পাপ ধুতে ধুতে পূত পবিত্র গঙ্গা কবে ধীরে ধীরে মলিন হয়ে গেল।

কেমন পাপ? প্লাস্টিকের আবর্জনা, শৌচালয়ের ময়লা, গঙ্গার দু' পাড়ের কলকারখানার কঠিন ও তরল বর্জ্য পদার্থ, পুজোর ফুল বেলপাতা ইত্যাদি, অর্ধদগ্ধ শব, শবদাহের পোড়া কাঠ আর শ্মশানের আবর্জনা-সহ হাজারো ময়লা প্রতিদিন এসে পড়ছে গঙ্গার জলে। শুধু কি তাই? আছে বিদ্যুৎ প্রকল্প, আছে একাধিক ব্যারেজ, যেগুলি নদীর স্বাভাবিক গতিকে বার বার রুদ্ধ করেছে, ভাগ বসিয়েছে তার জলের অংশে। সমগ্র উত্তর ও পূর্ব ভারতের জনজীবন শস্য শ্যামল হয়ে উঠেছে যে নদীকে ঘিরে, অকৃতজ্ঞের মত আমরা দায়িত্ব নিয়ে সেই নদীকে রসাতলে পাঠাচ্ছি। অবস্থা এতটাই খারাপ যে আশঙ্কা করা হচ্ছে আগামী ২০ বছরে গঙ্গা নদীভিত্তিক প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার মৃত্যু হতে পারে যদি না গঙ্গার জলপ্রবাহ অবাধ ও দূষণমুক্ত করা যায়।

আশার কথা হল এ জন্য কিছু ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে ও হচ্ছে। তবে এ বিষয়ে বিশদে যাওয়ার আগে গঙ্গা সম্পর্কে আর একটু জেনে নেওয়া যাক।

হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়েছে ভারতের তিনটি প্রধান নদী—সিন্ধু, গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্র। এদের মধ্যে গঙ্গার উৎপত্তি হয়েছে ৩৮৯২ মিটার উচ্চতায় গঙ্গোত্রী হিমবাহের গোমুখ থেকে। তখন এর নাম ভাগীরথী। দেবপ্রয়াগে যখন ভাগীরথীর সঙ্গে অলোকানন্দা এসে মিশল, তখন সেই মিলিত জলস্রোতের নাম হল গঙ্গা। অলোকানন্দা ছাড়াও গঙ্গার অন্যান্য উপনদীর মধ্যে রয়েছে ধৌলিগঙ্গা, পিণ্ডার, মন্দাকিনী ইত্যাদি।

গঙ্গার অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক আর পরিবেশগত গুরুত্ব অপরিসীম। উত্তরে হিমালয়ের কোল থেকে রওনা দিয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়তে গঙ্গা সফর করেছে দীর্ঘ ২৫২৫ কিলোমিটার পথ। পাঁচটি রাজ্য—উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, বিহার আর পশ্চিমবঙ্গ—এর মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে এই নদী। কোন রাজ্য দিয়ে কতটা পথ অতিক্রম করেছে গঙ্গা তা দেখে নেওয়া যাক সারণি-১-এ।

আর এ পথে গঙ্গার শাখা আর উপনদীগুলিকে ধরে যে অববাহিকা তৈরি হয়েছে তার আওতায় আসছে ১১-টি রাজ্য—উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশ, ছত্রিশগড়, ঝাড়খণ্ড, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ আর দিল্লি।

সারণি-১
বিভিন্ন রাজ্যে গঙ্গার দৈর্ঘ্য

রাজ্য	দৈর্ঘ্য (কিলোমিটারে)
উত্তরাখণ্ড	৪৫০
উত্তরপ্রদেশ	১০০০
উত্তরপ্রদেশ-বিহার যৌথভাবে	১১০
বিহার	৪০৫
ঝাড়খণ্ড	৪০
পশ্চিমবঙ্গ	৫২০
মোট	**২৫২৫**

উত্তরাখণ্ডে আছে তেহরি ড্যাম, যেখানে জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে জলবিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে। হরিদ্বার, যেখানে গাঙ্গেয় সমভূমির শুরু, সেখানে ব্যারেজ বেঁধে সেচের জন্য জল পাঠানো হচ্ছে আপার গঙ্গা ক্যানেলে। বিজনৌরের ব্যারেজ জল ঢালছে মধ্য গঙ্গা ক্যানেলে আর লোয়ার গঙ্গা ক্যানেলে জল যাচ্ছে নারোরার ব্যারেজের মাধ্যমে। আরও দক্ষিণে কনৌজের কাছে রামগঙ্গা এসে মিশেছে গঙ্গায়, এলাহাবাদের সঙ্গমে যুক্ত হয়েছে যমুনা। এর পর আরও কিছু নদী এসে মিশেছে এই মহান নদীতে। ফলে পশ্চিমবঙ্গের মালদায় যখন এসে ঢুকছে গঙ্গা, তখন নদী খাতে জলের পরিমাণ ভালই। এখানে ফারাক্কার ব্যারেজ তার পথ গতিরোধ

করল। নদী এখানে দু' ভাগ হল—এক ভাগ চলে গেল পদ্মা হয়ে বাংলাদেশে, অন্য ভাগ হুগলী নামে কলকাতার পাশ দিয়ে বয়ে চলে সাগরে মিলিত হতে।

ভারতবর্ষ ছাড়াও, নেপাল আর বাংলাদেশে গঙ্গা অববাহিকা বিস্তৃত। এই অববাহিকার ৭৯ ভাগই অবশ্য ভারতের মধ্যে পড়ছে। আর এর মধ্যে আছে ভারতের ২৬ শতাংশ স্থলভাগ (৮,৬১,৪০৪ বর্গকিলোমিটার), ৩০ ভাগ জলসম্পদ আর মোট জনসংখ্যার ৪৩ শতাংশেরও বেশি মানুষ (২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ৪৪.৮৩ কোটি)। শুধু তাই নয়, এই অববাহিকার বৈচিত্র্যও অসামান্য। উচ্চতা, আবহাওয়া, মাটি, উদ্ভিদ ও জীব জগৎ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন—সবের মধ্যেই রয়েছে বৈচিত্র্যের ছোঁয়া। সেই কোন অনাদি যুগ থেকে মানব সভ্যতার ধাত্রিভূমি এই গঙ্গা নদী। দৈনন্দিন জীবনের নানা কাজ ছাড়াও দেশের এক সিংহভাগ মানুষের ধর্মাচারনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল এই নদী। কুম্ভমেলার মত বড় মাপের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মূল আচারই হল গঙ্গা আবাহন। কোটি কোটি মানুষ এই সব মেলায় আসেন স্নান করে পুণ্য সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে। আর তাই শুধুমাত্র পরিবেশবিদের চশমা পরে এই নদীর গুরুত্ব উপলব্ধি করার চেষ্টা করা বাতুলতার নামান্তর।

তা হলে উপায়? কীভাবে ফিরে পাবে গঙ্গা তার হৃত গৌরব?

পুরোনো ব্যবস্থা

১৯৮৫ সালে ভারত সরকার ঘোষণা করেছিল গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান (গ্যাপ)। এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল যে সব দূষিত পদার্থ গঙ্গায় এসে মিশছে তার পরিমাণ কমিয়ে নদীর জলকে গ্রহণযোগ্য মানে নিয়ে যাওয়া। বিবিধ পদ্ধতিতে এই কাজ করা হত। যেমন :

- কৃষিক্ষেত্রের নানাবিধ আবর্জনা, শৌচালয়ের নোংরা, গরু মোষ ধোওয়া জল, অদগ্ধ বা অর্ধদগ্ধ মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলা ইত্যাদি কাজকারবার নিয়ন্ত্রণ করা।
- নদীর জলের পরিবেশগত ভারসাম্য ধরে রাখতে গবেষণা।
- শৌচালয়ের ময়লা পরিশোধন করার নতুন প্রযুক্তি গড়ে তোলা।
- কচ্ছপ জাতীয় প্রাণীদের দূষণ থেকে বাঁচাতে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।
- আবর্জনার মধ্যে থেকে পাওয়া মিথেন গ্যাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা।

উত্তরপ্রদেশ, বিহার আর পশ্চিমবঙ্গের ২৫-টি প্রথম শ্রেণীর শহরে ৫০০-এর বেশি পরিকল্পনার জন্য গ্যাপ প্রকল্পে ৪৬২ কোটি টাকা অনুমোদিত হয়েছিল। কিন্তু গ্যাপের মাধ্যমে আশা অনুযায়ী দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি। তাই ১৯৯৩-৯৬ সালে আসে গ্যাপ-২। গ্যাপ-১-এর চালু কাজের পাশাপাশি গ্যাপ-২-এর আওতায় আনা হয় গঙ্গার কয়েকটি উপনদীকেও যাদের জল সরাসরি এসে পড়ে গঙ্গা বক্ষে। এর মধ্যে আছে যমুনা, দামোদর, গোমতীর মতো নদীগুলি যারা নিজেরাও দূষণের শিকার। প্রথম দিকে কেন্দ্র আর রাজ্য সরকার ৫০ : ৫০ হিসেবে এর খরচ জোগাত; কিন্তু পরে, ১৯৯৭ সালের এপ্রিল থেকে কেন্দ্র এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে নেয়। ২২৮৫.৪৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় ৯৫-টি শহরের ৪৪১-টি পরিকল্পনায়। পরে অবশ্য কেন্দ্র এই সব পরিকল্পনার ৭০ ভাগ খরচ দেবে বলে ঠিক হয়। কিন্তু গ্যাপ-২-এর কাজের ফলাফলেও সন্তুষ্ট হতে পারেনি সরকার। এদিকে গঙ্গার দূষণ বেড়েই চলছিল। তাই ২০০৯ সালে গঠন করা হয় জাতীয় গঙ্গা নদী অববাহিকা কর্তৃপক্ষ (ন্যাশনাল গঙ্গা রিভার বেসিন অথরিটি— এনজিআরবিএ)। এর কাজ হল গঙ্গা নদীর সংরক্ষণ আর বিভিন্নভাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা। ২০১৫ আর্থিক বছর পর্যন্ত পাঁচ রাজ্যের ৪৩-টি শহরের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল ১০২৭ কোটি টাকা। বেশ কিছু পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছিল এনজিআরবিএ-র মাধ্যমে, কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় একাজ করার জন্য সেইসব পরিকাঠামো যথেষ্ট নয়। গ্যাপ-১ আর গ্যাপ-২-তে কী রকম খরচ-খরচা হয়েছে তা আমরা জানতে পারব সারণি-২ থেকে।

এটা না হয় বোঝা গেল গ্যাপ-১, গ্যাপ-২ বা এনজিআরবিএ-ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ-এর কাজটা ঠিক মত করতে পারেনি। কিন্তু এই দূষণ ঠিক কিভাবে ছড়াচ্ছে সেটাও ভালভাবে জেনে নেওয়া দরকার।

জনবিস্ফোরণ, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, শিল্প আর নগরায়ণ-এর ক্রমশ বিস্তারলাভ—এসবই দেশের জলসম্পদের, বিশেষ করে নদীর, ওপর বিশাল আঘাত হেনেছে গত কয়েক দশকে। গঙ্গাও তার ব্যতিক্রম নয়। গঙ্গার কয়েকটি জায়গায় নদীর জলের গুণমান এতটাই খারাপ, বিশেষ করে গরমের সময়ে, যে সে জল এমনকি স্নানেরও অযোগ্য। ভারতের বৃহত্তম শহরগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটি আছে গঙ্গা অববাহিকায়—দিল্লি, কলকাতা, পাটনা, বারাণসি, এলাহাবাদ, কানপুর, লখ্‌নৌ, মিরাট, আগ্রা, হরিদ্বার, হৃষিকেশ প্রভৃতি। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, গঙ্গা অববাহিকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৫২০, যেখানে গোটা দেশে এই সংখ্যা হল ৩১২।

কী কী জিনিস দূষিত করে নদীর জলকে? জৈব পদার্থ, পৌরসভা এলাকা থেকে আসা বা খোলা স্থানের শৌচালয়ের নোংরা, ধাতব ও প্লাস্টিক জাতীয় জিনিস, শিল্পজাত বর্জ্য, অব্যবহৃত খাবার, পূজাচর্নার উপকরণ, পোশাকের টুকরো, কৃষিজমির সার আর কীটনাশক, জামাকাপড় কাচার সাবানগোলা জল, গরু-মোষ স্নান করানো, শ্মশানের আবর্জনা, মানুষ ও জন্তু জানোয়ারের মৃতদেহ প্রতিদিন দূষিত করে চলেছে গঙ্গার জলকে। এসব থেকে নানাবিধ জলবাহিত অসুখ বিসুখও ছড়ায়। যেমন, কলেরা, হেপাটাইটিস, টাইফয়েড, পেটের ও চামড়ার নানারকম রোগব্যাধি।

গঙ্গার খাত দিয়ে প্রতিদিন বয়ে যায় প্রায় ১২,০০০ মিলিয়ন লিটার/দিন (এমএলডি) শৌচালয়ের নোংরা। এদিকে প্রশাসনের হাতে পরিশোধনের ক্ষমতা আছে মাত্র ৪,০০০ এমএলডি। নদীর দুই তীরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শহরগুলি থেকে গঙ্গার মূল স্রোতে সরাসরি যে আবর্জনা এসে পড়ে তার পরিমাণ ৩,০০০ এমএলডি, যেখানে শোধন ক্ষমতা আছে ১০০০ এমএলডি। সারণি-৩-এ এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হল।

কলকারখানাগুলি থেকে যে বর্জ্য নদীতে ফেলা হয় তার মোট দূষিত পদার্থের পরিমাণ

২০ শতাংশ। কিন্তু এগুলি অত্যন্ত বিষাক্ত প্রকৃতির রাসায়নিক তথা পচনশীল (bio-degradable) নয়। ফলে বিপদের মাত্রা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। রামগঙ্গা, কোশি আর কালি নদীর তীরের কাগজ ও চিনির কারখানা আর ভাটিখানা, কানপুর শহরের চামড়ার কারখানাগুলি শিল্পজাত দূষণের প্রধান উৎস। এছাড়া অন্যান্য দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্পসংস্থার মধ্য আছে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, সার, ওষুধ, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং, তেল শোধনাগার/পেট্রো-রসায়ন ইত্যাদি।

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, গঙ্গার দুই তীরে অবস্থিত শতাধিক শহরের কলকারখানা ও গৃহস্থ বাড়ি থেকে দৈনিক ৩০০ কোটি লিটার নোংরা, বর্জ্য পদার্থ ও বিষাক্ত নিকাশি জল গঙ্গায় ফেলা হয়।

গঙ্গার পাড়ে আছে অসংখ্য শ্মশান। তার মধ্যে শুধু বারাণসির শ্মশান ঘাটগুলিতেই প্রতি বছর প্রায় ৪০,০০০ শবদাহ করা হয়। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, তার জন্য পোড়ানো হয় ১৬ হাজার টন কাঠ। নির্গত হয় ৭০০ টন ছাই ও অন্যান্য আবর্জনা।

নমামি গঙ্গে

বিবিধ চালু প্রকল্প থেকে আশানুরূপ ফল না পাওয়ায় ২০১৫ সালের ১৩ মে ভারত সরকার চালু করে 'নমামি গঙ্গে'। এই প্রকল্পের জন্য পাঁচ বছরের বাজেট বরাদ্দ করা হয় ২০,০০০ কোটি টাকা। মনে রাখা দরকার এর আগে ১৯৮৫ সাল থেকে ভারত সরকার গঙ্গা পুনরুজ্জীবন খাতে খরচ করেছিল ৪,০০০ কোটি টাকা, তাই এবার পাঁচ গুণ বেশি টাকা ধার্য করা হয়েছে। এই প্রকল্পে আগের কর্মকাণ্ডকে সংহত করা হয়েছে, পাশাপাশি হাতে নেওয়া হয়েছে নতুন নতুন ব্যবস্থাপত্র। এ জন্য কথা বলা হয়েছে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সঙ্গে। এদের মধ্যে আছে জলসম্পদ, পরিবেশ, পর্যটন, অর্থ, বিদ্যুৎ, নগরোন্নয়ন এবং জাহাজ মন্ত্রক। বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করা হয়েছে কেন্দ্রীয় জল কমিশন, কেন্দ্রীয় ভূমি জল পর্ষদ ও কেন্দ্রীয় পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সঙ্গে। পরামর্শ করা হয়েছে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সঙ্গে এবং অবশ্যই নদী বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে। এছাড়া দীর্ঘমেয়াদি

সারণি-২
গ্যাপ ও এনজিআরবিএ-র মোট খরচ (৩১ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত)
(কোটি টাকা)

রাজ্য	গ্যাপ-১	গ্যাপ-২	এনজিআরবিএ	মোট
উত্তরাখণ্ড	০	৫৪.৭৯	৬৪.৭৩	১১৯.৫২
উত্তরপ্রদেশ	১৯৪.৪৫	১৮৯.৯৯	৫৬০.৩৯	৯৪৪.৮৩
বিহার	৫২.৭২	৩.০৫	৭৬.৪৯	১৩২.২৬
ঝাড়খণ্ড	০	০.২৫	০	০.২৫
পশ্চিমবঙ্গ	১৮৬.১৩	২৫৭.২৩	২০৫.৩১	৬৪৮.৬৭
বিবিধ প্রতিষ্ঠান	০	০	৩.৬৫	৩.৬৫
মোট	**৪৩৩.৩০**	**৫০৫.৩১**	**৯১০.৫৭**	**১৮৪৯.১৮**

কর্মসূচি তৈরি করার জন্য সাতটি আইআইটি-কে নিয়ে একটি দল গঠন করা হয়েছে আগেই।

কী আছে এই প্রকল্পে?

এই প্রকল্পে ২,০৩৭ কোটি টাকা খরচ করা হবে নদীর পুনরুজ্জীবন ঘটাতে; আর ৪,২০০ কোটি টাকা আগামী পাঁচ বছরে নদীর নাব্যতা বাড়িয়ে নৌ-চলাচলের জন্য বিশেষ করিডোর গড়ে তোলার কাজে খরচ করা হবে। ১০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে গঙ্গাঘাটগুলির সংস্কারসাধন এবং নদী তীরের সৌন্দর্যায়নে। প্রথমে ওই সৌন্দর্যায়নের কাজ করা হবে কেদারনাথ, হরিদ্বার, কানপুর, বারাণসি, এলাহাবাদ, পাটনা আর দিল্লিতে।

পাশাপাশি গঙ্গা নদীকে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে নানারকম কর্মসূচি হাতে নেওয়া হবে। ভাবা হয়েছে গঙ্গায় নৌকা বিহারের জন্য কাশ্মীরের ধাঁচে শিকারা, ভাসমান হোটেল ইত্যাদি নির্মাণ করা হবে।

নমামি গঙ্গে যোজনায় যা যা করা হবে বলে ঠিক হয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি হল :

● শৌচালয়ের বর্জ্য যাতে নদীতে না পড়ে তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তুললে রাজ্যগুলিকে অতিরিক্ত অর্থ দেওয়া হবে।

● ১১৮-টি শহরে শৌচালয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা, এবং এর জন্য নগরয়োন্নয়ন মন্ত্রক ৫১,০০০ কোটি টাকা দেবে।

● ২০২২ সালের মধ্যে গঙ্গা তীরবর্তী ১৬৫১-টি গ্রাম পঞ্চায়েতে খোলা স্থানে শৌচকর্ম বন্ধ করতে হবে। এতে খরচ হবে ১৭০০ কোটি টাকা। পাঁচ রাজ্যের ৫২ জেলার এই ১৬৫১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে আছে মোট ৫১৬৯-টি গ্রাম।

● শিল্পজাত বর্জ্য নিয়ন্ত্রণে 'রিয়াল টাইম' পরীক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া হবে যাতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে জলের গুণমান পরীক্ষা করে তখনই ফলাফল জানা যায়। কানপুর শহর থেকে নিঃসৃত শিল্পদূষণ রোধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ জন্য বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় ৯৪.৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে তোলা হয়েছে 'ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার কোয়ালিটি মনিটরিং নেটওয়ার্ক' যার মাধ্যমে ১১৩-টি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা থেকে গঙ্গা ও তার উপনদীগুলির জলের গুণমান স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব হবে। আরও ১৩৪-টি জায়গা থেকে জল পরীক্ষা করার ব্যবস্থাও থাকছে, তবে সেগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নয়।

● যথাযথ সেচ ব্যবস্থার উদ্যোগ নেওয়া হবে আর জলাভূমি সংরক্ষণ করা হবে।

● জীববৈচিত্র্য বাঁচাতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিশেষ করে ডলফিন, কচ্ছপ আর ঘড়িয়ালের জন্য।

● গঙ্গাকেন্দ্রিক পর্যটনের ব্যবস্থা করা হবে।

● গঙ্গা অববাহিকায় প্রচুর গাছ লাগানো হবে প্রধানত পাঁচটি রাজ্যে—উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড আর পশ্চিমবঙ্গে। এ বিষয়ে দেরাদুনের ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট একটি বিস্তারিত সমীক্ষাপত্র জমা দিয়েছে।

গঙ্গার জল নির্মল রাখতে মূলত দু' ধরনের কাজ করা হবে—কোর (Core) আর নন-কোর (Non-core)। কোর কাজের মধ্যে পড়ে পরিশোধন বা অন্যান্য পথে শৌচালয়ের

নোংরা নদীতে পড়তে না দেওয়া। আর নন-কোর কাজ হল আধুনিক শ্মশান ঘাট নির্মাণ, স্নান ঘাট ও পাড়ের সৌন্দর্যায়ন, গাছ লাগানো, জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা, জনচেতনা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি।

মে মাসের গোড়ার দিকে এনজিআরবিএ জানিয়েছে তারা ২৪৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে গঙ্গা তীর আর শ্মশানঘাটের উন্নতি তথা গাছ লাগানো হবে। যে যে জায়গায় এই কাজগুলি করা হবে সেগুলি হল হরিদ্বার থেকে উত্তরাখণ্ডের সীমানা পর্যন্ত, উত্তরপ্রদেশের গড়মুক্তেশ্বর, বিহারের বক্সার, হাজিপুর আর শোনপুর, ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ, রাজমহল আর কানহাইয়া ঘাট, দিল্লি।

নমামি গঙ্গে প্রকল্পের কাজগুলি করবে এনজিআরবিএ-র আওতায় থাকা 'ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা' (এনএমসিজি)। কিন্তু এত ধরনের কাজ করতে গেলে তো সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির প্রতিটিতে ভালো মত জ্ঞান-বিদ্যা থাকা দরকার। আর তার জন্য গঠন করা হয়েছে 'গঙ্গা নলেজ সেন্টার' (জিকেসি)। জিকেসি-র প্রধান কাজগুলির মধ্যে আছে :

- গঙ্গা অববাহিকা সংক্রান্ত নানা তথ্য বিশ্লেষণ করে তা নমামি গঙ্গের বিভিন্ন পরিকল্পনায় কাজে লাগানো।
- প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যে কোথায় কোথায় ঘাটতি আছে সে জায়গাগুলি চিহ্নিত করে ঘাটতি পূরণ করা।
- দেশ-বিদেশের নামী বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাকেন্দ্র ও অ-সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে নমামি গঙ্গে-র যোগসূত্র স্থাপন করা।

মোটামুটি ঠিক হয়েছে একাজে ২০১৫-১৬ সালে খরচ হবে ২৭৫০ কোটি টাকা, ২০১৬-১৭ সালে ৩৯৫৫ কোটি টাকা আর ২০১৭-২০ (ডিসেম্বর) সালে ১৩,২৯৫ কোটি টাকা।

সারণি-৩
শৌচালয়ের ময়লা উৎপাদন, পরিশোধন ব্যবস্থা ও তার ঘাটতি

রাজ্য	আনুমানিক নোংরা উৎপাদন (এমএলডি)	চালু পরিশোধন ব্যবস্থা (এমএলডি)	অনুমোদিত/ কাজ শুরু হওয়া শোধন ব্যবস্থা (এমএলডি)	মোট শোধন ব্যবস্থা (এমএলডি)	শোধন ব্যবস্থার ঘাটতি (এমএলডি)
১	২	৩	৪	৫ (৩ + ৪)	৬ (২ – ৫)
উত্তরাখণ্ড	২৫২	৯২	৩০	১২২	১৩০
উত্তরপ্রদেশ	৩৫৩৪	১৩৬৩	৮৪১	২২০৪	১৩৩০
বিহার	৯০৬	১৩৬	২০২	৩৩৮	৫৬৮
ঝাড়খণ্ড	৬৫২	০	১২	১২	৬৪০
পশ্চিমবঙ্গ	১৯৫৭	৫৩৫	১০৩	৬৩৮	১৩১৯
মোট	**৭৩০১**	**২১২৬**	**১১৮৮**	**৩৩১৪**	**৩৯৮৭**

বৈদেশিক সহযোগিতা

নমামি গঙ্গে প্রকল্পে সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে বিদেশ থেকেও। এনজিআরবি-এর চুক্তি অনুযায়ী বিশ্ব ব্যাংক ১ বিলিয়ন ডলার (প্রায় ৪৬০০ কোটি টাকা) দেবে আর সেই সঙ্গে দেবে প্রযুক্তিগত সহায়তা।

জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোয়াপরেশন এজেন্সি-ও বারাণসির একটি প্রকল্পে ৪৯৬.৯ কোটি টাকা দিচ্ছে. যেমন, ২২.৫ কোটি টাকা দিচ্ছে জার্মান সরকার কয়েকটি কাজের জন্য। রাইন, ডানিউব প্রভৃতি ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলির দূষণ রোধে জার্মান সরকারের বিপুল অবদান আছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর সাম্প্রতিক আমেরিকা সফরে সেখানকার শিল্পসংস্থা-গুলিকে আহ্বান জানিয়েছেন গঙ্গা দূষণমুক্ত করতে এগিয়ে আসার জন্য। পরিবেশ প্রযুক্তি, জল ও শৌচালয়ের ময়লা পরিশোধন করার ব্যাপারে এই সংস্থাগুলির প্রভূত অভিজ্ঞতা আছে।

তবে নদী বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রকল্পে অতীতের ভুলভ্রান্তি পরিহার করা জরুরি। যেমন, বাঁধ নির্মাণ। গঙ্গার ওপর অজস্র ছোট বড় বাঁধের নির্মাণ হয় সম্পূর্ণ হয়েছে, না হয় নির্মীয়মান অবস্থায় আছে। প্রচুর জল তুলে নেওয়া হচ্ছে, ফলে গঙ্গার বুকে জেগে উঠছে বালির চড়া। এতে স্থানীয় মানুষজনদের জীবিকাই যে শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তা নয় জলের প্রবাহ কমে, জীববৈচিত্র্যও বিপন্ন হয়ে পড়ে। আর জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হলে নদীর জল যে নির্মল থাকবে না তা বলাই বাহুল্য। তাই দরকার যথেচ্ছ বাঁধ নির্মাণে কড়াকড়ি।

শেষের কথা

এ দেশের একটা বড় অংশের মানুষ দিন শুরু করেন 'জয় গঙ্গা মাই' ডাক দিয়ে। তাঁদের কাছে গঙ্গা কেবল নদী নয়, দেবী। বেদে, পুরাণে, মহাভারতে গঙ্গার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু তাঁদের ডাক আজ বোধ হয় কেবল অভ্যাসের আহ্বান। কেননা দূষণে দীর্ণ নদীর পবিত্রতা আজ আর চোখে দেখা যাচ্ছে না। দীর্ঘ দিন ধরে চেষ্টা চলছে দূষণ দূর করে এ নদীকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার। আশা করা যায় এবার মানুষর স্বপ্ন পূর্ণ হবে। তাঁদের 'জয় গঙ্গা মাই' ডাক সত্যিই পূর্ণতা পাবে।❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক সংবাদ সংস্থা পিটিআই-এর সাংবাদিক।)

ঋণ স্বীকার :

১) গঙ্গা রিজুভিনেশন কমিটি অন এস্টিমেটস (২০১৬-১৭) সালের ১৫তম রিপোর্ট (লোকসভায় জমা পড়েছে ১১ মে, ২০১৬)

২) 'ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা'-র ওয়েবসাইট https://www.nmcg.nic.in/

৩) প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর বিভিন্ন রিপোর্ট

পতিত পাবনী গঙ্গার উদ্ধার কোন পথে?

অতীত উদ্যোগ এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচি

গঙ্গা ভারতের সবচেয়ে পূত পবিত্র নদী, হয়তো সারা বিশ্বেরই। আমরা, আপামর ভারতবাসী গঙ্গাকে ভক্তি করি মনপ্রাণে। কিন্তু ভালোবাসি কি? যদি তাই হত, তবে আমাদের পাপ ধুতে ধুতে, নিক্ষিপ্ত নিকাশী বর্জ্য-জল-আবর্জনার পাহাড় ধারণ করে কেন সে আজ নীলকণ্ঠ? গঙ্গার এই 'গঙ্গা প্রাপ্তি'-র কারণ তথা নির্মল গঙ্গার পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে গৃহীত অতীত ও ভবিষ্যতের বিবিধ কর্মসূচি-প্রকল্প-উদ্যোগ নিয়ে বর্তমান নিবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন—**ভারত আর. শর্মা**

ভারতবাসীর হৃদয়ে গঙ্গা এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে সেই অনাদিকাল থেকে। এ দেশের সবচেয়ে পূত পবিত্র নদী গঙ্গা। এক অনন্য সাধারণ সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক বিশেষত্বের অধিকারী গঙ্গা। হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহের থেকে উৎসারিত হয়ে সুদীর্ঘ ২,৫০০ কিলোমিটারেরও বেশি পথ অতিক্রম করে বাংলাদেশের ব-দ্বীপ অঞ্চলে সাগরে গিয়ে মিশেছে। পুরো যাত্রাপথেই বিশাল এই নদী প্রতিদিন উদ্‌যাপিত এবং ব্যবহৃত হয়ে থাকে অসংখ্য মানুষের দ্বারা। ভারতের এক মূল্যবান পরিবেশগত এবং অর্থনৈতিক সম্পদ হল গঙ্গা অববাহিকা অঞ্চল। দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি)-এর ৪০ শতাংশ এই অঞ্চলের অবদান। সুদীর্ঘ যাত্রাপথে এই নদী সমৃদ্ধ করেছে সুবিশাল গাঙ্গেয় সমভূমিকে; এবং পরিপুষ্ট করেছে এ দেশের ৫০-টির মতো বড় নগরী ও শত শত ছোটো শহরকে। এ নদীর উচ্চগতিতে অসংখ্য উপনদী থেকে পর্যাপ্ত জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। যা দেশের (বিদ্যুৎ) শক্তি সরবরাহ ক্ষেত্রে বড়সড় ভূমিকা নিতে পারে। আর নিম্নগতিতে, লম্বা দূরত্বে পণ্য ও যাত্রী পরিবহণের জন্য এক চমৎকার ও কার্যকরী জলপথ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রভূত। এ হল দেশের একমাত্র নদী অববাহিকা—যা সম্পদ সমৃদ্ধ এবং এখনও পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে উদ্বৃত্ত জল দিয়ে চলেছে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের। লাগামছাড়া জনসংখ্যার কারণে দশকের পর দশক ধরে মানুষের চরম অবহেলা এবং নিষ্ঠুর কাজ কারবারের দরুন সুবিশাল এই নদীর এখন প্রাণ ওষ্ঠাগত। গঙ্গার উল্লেখ করলেই মনের মধ্যে এক পরস্পরবিরোধী ছবি ভেসে ওঠে। একদিকে, এ হল পবিত্রতার প্রতিমূর্তি, বিশুদ্ধতার প্রতীক। অন্যদিকে, আবর্জনা ও প্লাস্টিক জনিত দূষণময়, বদ্ধ, সুবিশাল এক জল রাশি। দূষণের অত্যধিক চাপ। শুখা মরসুমেও ব্যাপকহারে সেচের চাহিদা মেটাতে নদী থেকে মাত্রা ছাড়া জল উত্তোলনের বিরাম নেই। জলের চাহিদা চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়েই চলেছে। সময় সময় বিভিন্ন উপনদী এমনকী গঙ্গার মুখ্য ধারাও গতি পরিবর্তন করছে এবং বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। এসবেরই সম্মিলিত ফলস্বরূপ নদী এখন ভগ্নস্বাস্থ্য। শুধু নিজের স্বাস্থ্যই নয়; অববাহিকা অঞ্চলে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ মানুষ, যারা জীবন ও জীবিকার জন্য গঙ্গার উপর একান্ত নির্ভরশীল, তাদের প্রতিপালন করার ক্ষমতার উপরও আঘাত এসেছে (Ruhl, 2015)। বস্তুত, পরিস্থিতি এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, যে কেউ একথা ভেবে অবাক হতে পারেন যে, কীভাবে বিশ্বের অন্যতম মহিমাময় নদীটি ক্রমে একটি আবর্জনা খালাস করার জায়গায় বদলে গেল।

গঙ্গার এই 'গঙ্গা প্রাপ্তি'-র পিছনে যেসব কারণ রয়েছে তা গুণে শেষ করা যাবে না এবং একেবারেই সহজ-সরল ধাঁচের নয়। অপরিশোধিত নিকাশী বর্জ্য এবং শিল্প-বর্জ্য ক্রমাগত নদীতে খালাস করার কারণে নদীর গতি রুদ্ধ হচ্ছে। লাগামহীনভাবে ভূ-গর্ভস্থ জল তুলে নেওয়া চলছে। অবিরত নদীতে বিভিন্ন ধরনের দূষণবস্তু ফেলা চলছে। বিবিধ ধর্মীয় আচার এবং লৌকিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত নানা ধরনের সরঞ্জাম ও নৈবেদ্য-উপাচার তথা গাঢ় বর্ণে রঞ্জিত মাটির দেব-দেবী মূর্তি হৈ হৈ করে বিসর্জন দেওয়া চলছে। এ দেশের তো বটেই, তার সীমানা ছাড়িয়ে আরও যে কোটি কোটি মানুষ এ নদীর জলের উপর নির্ভরশীল—জলের গুণমান বিপন্ন হওয়ায় তারাও সবাই আজ বিপদগ্রস্ত। এই বিপদের একেবারে শীর্ষে রয়েছে বন্যা ও খরা। গঙ্গা অববাহিকা অঞ্চলে এ দু'টি এখন নিয়মিত অতিথি, যাদের প্রাদুর্ভাবে মরছে মানুষ, সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শস্য উৎপাদন, (গবাদি) পশুসম্পদ এবং পরিকাঠামো। হিমবাহের অবস্থান আগের জায়গায় নেই, অনেক পিছিয়ে গেছে। তুষার স্তূপের পরিমাণ কমছে, বরফ গলে যাচ্ছে সময়ের আগেই। শীতকালে (বরফ গলা) জলের প্রবাহ বাড়ছে নদীতে। এসবের

সম্মিলিত ফল পরিস্থিতি সঙ্গিন করে তুলছে—চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে জলবায়ুর পরিবর্তন ইতোমধ্যেই হিমালয়ের তুষার চাদরকে কমজোর করতে শুরু করেছে—দীর্ঘমেয়াদে যা প্রভাব ফেলছে নদীর স্বাস্থ্যের উপর।

গোটা যাত্রাপথ জুড়েই নদীর জলের গুণমানের অবনতি হচ্ছে, তবে স্থান বিশেষে পাল্টে যাচ্ছে দূষণের কারণ। উচ্চগতিতে, গঙ্গোত্রী থেকে ঋষিকেশ পর্যন্ত গঙ্গায় এসে মিশছে বহু ছোটো ছোটো খরস্রোতা উপনদী। এই প্রবাহ পথে মানুষের কাজকারবারের দরুন দূষণের মাত্রা খুবই কম, কিন্তু জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত জলাধার ও বাঁধ সংকটের কারণ হয়ে দেখা দিচ্ছে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অত্যন্ত সংবেদনশীল তথা ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্র এবং জীববৈচিত্র্য মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মধ্যগতিতে, ঋষিকেশের পর থেকে মূলত কানপুর, এলাহাবাদ, পাটনা, ফারাক্কা ইত্যাদি জায়গায় গঙ্গায় দূষণ চরমে পৌঁছেছে; কিন্তু তা স্রোতের সাথে মিশে নিম্নগতিতেও ছড়িয়ে যাচ্ছে বলে দূষণের মাত্রা আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা কম দেখায়। এই পর্যায়ে দূষণ ঘটছে গার্হস্থ্য, পৌর, কৃষিকাজ ও শিল্প—যাবতীয় কর্মকাণ্ডের ফলে তৈরি হওয়া বিপুল পরিমাণ বর্জ্য সরাসরি নদীতে খালাস করার দরুন। ফলস্বরূপ, উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল এবং বিহার সমভূমির উত্তরাঞ্চল ঘন ঘন মারাত্মক বন্যা পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে। নিম্নগতিতে শেষ পর্যায় গঙ্গা সুন্দরবনের কিছুটা অংশ গঠন করেছে। সুন্দরবন দুনিয়ার বৃহত্তম সক্রিয় ব-দ্বীপ। দূষণের কারণে এই অঞ্চলে ঘন ঘন নদীখাতের পরিবর্তন হচ্ছে। বাড়ছে জলের লবণাক্ততা, সামুদ্রিক ঝড়ের প্রকোপ। পরিণতিতে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে জলের বখরা নিয়ে মতবিরোধের চেহারা নিচ্ছে (IITC, 2010)।

গঙ্গা দূষণ : প্রধান কারণসমূহ

গঙ্গা অববাহিকা বিশ্বের সবচেয়ে ঘন জনবসতিপূর্ণ নদী অববাহিকা। দেশের প্রায় ৬০ কোটিরও বেশি মানুষজনের—শহর ও গ্রাম মিলিয়ে, বসবাস এখানে। সংখ্যাটি দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক। বিবিধ কারণে চরম দরিদ্র মানুষের সংখ্যাটি এই অববাহিকা অঞ্চলে খুব বেশি। এদিকে জল এবং শৌচ, নিকাশী ইত্যাদি স্যানিটেশন পরিকাঠামো হয় একেবারেই নেই অথবা অপর্যাপ্ত। এই অববাহিকা অঞ্চল মূলত কৃষি-নির্ভর। তবে শহরকেন্দ্রীক এলাকাগুলিতে বহু ক্ষুদ্রায়ত, অনিয়ন্ত্রিত এবং দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্পোদ্যোগ রয়েছে। পাশাপাশি অভাব নেই ধর্মস্থল ও তীর্থক্ষেত্রেরও। সুতরাং গঙ্গা দূষণের মূল কারণ বর্জ্য। বিপুল জনসংখ্যার অপরিশোধিত নিকাশী বর্জ্য, শৌচাগারের বর্জ্য, কঠিন বর্জ্য। শিল্পকারখানার থেকে নিঃসৃত বর্জ্য। কৃষিক্ষেত্র থেকে নিঃসৃত রাসায়নিক এবং বর্জ্য। বাকি পাদপূরণ করে দেয় ধর্মস্থল থেকে নিক্ষিপ্ত নৈবেদ্য-উপাচারের অবশিষ্টাংশ। এই বিপুল বর্জ্যভারে শুখার মাসগুলিতে গতিরুদ্ধ হয়ে নদীর প্রাণ ওষ্ঠাগত, উঁকি দিচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ।

"এই অববাহিকা অঞ্চল মূলত কৃষি-নির্ভর। তবে শহরকেন্দ্রীক এলাকাগুলিতে বহু ক্ষুদ্রায়ত, অনিয়ন্ত্রিত এবং দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্পোদ্যোগ রয়েছে। পাশাপাশি অভাব নেই ধর্মস্থল ও তীর্থক্ষেত্রেরও। সুতরাং গঙ্গা দূষণের মূল কারণ বর্জ্য। বিপুল জনসংখ্যার অপরিশোধিত নিকাশী বর্জ্য, শৌচাগারের বর্জ্য, কঠিন বর্জ্য। শিল্পকারখানার থেকে নিঃসৃত বর্জ্য। কৃষিক্ষেত্র থেকে নিঃসৃত রাসায়নিক এবং বর্জ্য। বাকি পাদপূরণ করে দেয় ধর্মস্থল থেকে নিক্ষিপ্ত নৈবেদ্য-উপাচারের অবশিষ্টাংশ।"

(i) নিকাশী বর্জ্য, শৌচাগার বর্জ্য এবং কঠিন পৌর বর্জ্য :

গঙ্গার মূল প্রবাহ দেশের ৩৬-টি প্রথম শ্রেণির শহর (Class-I City); ১৪-টি দ্বিতীয় শ্রেণির শহর (Class-II City) এবং ছোটোখাটো প্রায় ৫০-টি শহরের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে। প্রথম শ্রেণির শহরগুলির প্রত্যেকটির জনসংখ্যা ১ লক্ষের বেশি; দ্বিতীয় শ্রেণির ক্ষেত্রে তা ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে তা ২০ হাজারের উপরে। ভারতের কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ-এর হিসাব অনুযায়ী (CPCB, 2013) এইসব প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির শহরগুলি প্রতিদিন ২.৭ বিলিয়ন লিটারেরও বেশি নিকাশী বর্জ্য জল (sewage) নিষ্কাশিত করে। যদিও পরিমাণটি হয়তো কম করেই দেখানো হয়েছে (CSE, 2014)। কারণ, এই হিসাব কষা হয়েছে শহর এবং নগরগুলিতে পৌর (Municipal) জল সরবরাহের সাপেক্ষে। শহরাঞ্চলের 'run-off'-কে বাদ দেওয়ার পাশাপাশি ছোটো শহরগুলিতে যে বর্জ্য জল উৎপন্ন হয়, তাকেও ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয়নি। এখনও পর্যন্ত নদীতে নিক্ষেপ করার আগে বর্জ্য জল (Waste water) পরিশোধনের যে পরিকাঠামো গড়ে তোলা গেছে, তার ক্ষমতা দিনে ১.২ বিলিয়ন লিটার। তবে কার্যক্ষেত্রে, বা বাস্তবে এই ক্ষমতা অনেকটাই কম। কাজেই যতখানি দরকার, তার এক-ভগ্নাংশ মাত্র পরিমাণে বর্জ্য জল পরিশোধন করা সম্ভব হচ্ছে নদীতে মেশার আগে। CPCB-এর একটি পর্যবেক্ষণ এবং প্রাক্‌কথন অনুযায়ী, গঙ্গায় যে পরিমাণ বর্জ্য জল এসে মেশে, তার মাত্র ২৬ শতাংশ পরিশোধন করে ছাড়া হয়, বাকি বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত বর্জ্য জল সরাসরি খালাস করা হয় গঙ্গা বক্ষে। রামগঙ্গা, গোমতী, কালী, যমুনা, হিন্দোল-এর মতো গঙ্গার আরও অনেক উপনদী এমনকী আরও বেশি দূষণযুক্ত এবং সমস্যা আরও তীব্রতর করে তুলছে, যেহেতু এগুলি মুখ্য নদীখাতে এসে মিশছে। CPCB ইতোমধ্যেই ১৩৮-টি বড় মাপের বর্জ্য জল নিকাশী নালাকে চিহ্নিত করেছে, যেগুলি বিপুল পরিমাণ—৬ বিলিয়ন লিটার চরম দূষিত জল সরাসরি গঙ্গায় এনে ফেলছে। শৌচ ট্যাঙ্ক থেকে

মজুত, নিক্ষিপ্ত এবং চুঁইয়ে মেশা কঠিন বর্জ্য আর এক কঠিন সমস্যা। গাঙ্গেয় অববাহিকায় অবস্থিত—উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যগুলিতে স্যানিটেশন পরিকাঠামো বেশ দুর্বল। ২০১১ সালের সর্বশেষ জনগণনা অনুযায়ী, এই অঞ্চলের (শহর এলাকায়) ৪৫ থেকে ৫৩ শতাংশ বাড়িতে সেপটিক ট্যাঙ্ক ব্যবহার করা হয়, কিন্তু সেই শৌচ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য কোনও পরিকল্পনা এবং বিশেষ পন্থাপদ্ধতির বালাই নেই। এইসব ট্যাঙ্কের বর্জ্য উন্মুক্ত মাঠ, খালি জায়গা এবং নালা-নর্দমায় খালাস করা হয়, যা শেষমেশ নদী প্রবাহকে দূষিত করে। খোলা স্থানে শৌচকর্ম করে থাকেন জনসংখ্যার ২৫ শতাংশেরও বেশি মানুষ, যা সরাসরি মানুষের শরীরস্বাস্থ্য এবং জলদূষণের ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলে। গাঙ্গেয় অববাহিকার রাজ্যগুলিতে কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ এবং সঠিক অপসারণ পদ্ধতির বালাই মাত্র নেই। অধিকাংশ গ্রাম, শহর, নগরীতেই জৈব বর্জ্য, প্লাস্টিক, কাঁচ, মৃত পশু ও অন্যান্য মাটিতে মিশে যেতে পারে এমন কঠিন বর্জ্য সবই নদীর তীরে স্রেফ ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। এই ডাঁই হয়ে পড়ে থাকা আবর্জনার পাহাড় কেবল যে নদীপ্রবাহকে রুদ্ধ এবং দূষিত করে তাই নয়, নন্দনতাত্ত্বিক দিক থেকে অত্যন্ত চক্ষু পীড়াদায়কও বটে।

(ii) **ধর্মীয় স্থল/তীর্থক্ষেত্রের বর্জ্য :** ভারতের সবচেয়ে পবিত্র নদী গঙ্গা। এর সাথে অনেক ঐতিহ্য এবং পৌরাণিক তথা ধর্মীয় বিশ্বাস জড়িত। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ পূণ্যার্থী দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত বিভিন্ন ধরনের উপাচার গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে এবং উৎসবের মরশুমে লক্ষ লক্ষ পূণ্যার্থী সমাগম হয় গঙ্গা তীরে। এরা গঙ্গায় স্নান করে পূণ্যার্জনের পাশাপাশি শরীর এবং পরিধেয় থেকে যাবতীয় ময়লাও গঙ্গার জলে ধুয়ে যান। গাঢ় বর্ণে রঞ্জিত বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হয় গঙ্গা বক্ষে। এই সমস্ত কাজকারবারের সম্মিলিত ফলস্বরূপ টন টন বিষাক্ত বস্তু নদীকে কলুষিত করে মরণাপন্ন করে তুলছে। এছাড়াও দাবিদারহীন মৃতদেহ, অর্ধ বা পূর্ণ দগ্ধ শবদেহ ইত্যাদি ফেলে দেওয়ার ভাগাড় হিসাবেও গঙ্গা বক্ষকেই বেছে নেওয়া হচ্ছে নির্বিচারে। হায়! গঙ্গাকে কলুষিত-দূষিত করার কোনও কসুর আমরা ছাড়ছি না।

সারণি-১
গঙ্গা অববাহিকায় অবস্থিত মুখ্য শিল্পোদ্যোগ ইউনিটগুলিতে জলের ব্যবহার এবং বর্জ্য জল নিকাশের খতিয়ান

শিল্প ইউনিট	মোট ইউনিটের সংখ্যা	ব্যবহৃত জলের পরিমাণ (MLD)	বর্জ্য জল নিকাশের পরিমাণ (MLD)
রাসায়নিক	২৭	২১০.৯	৯৭.৮ (৪৬.৪ শতাংশ)*
ভাটিখানা	২৩	৭৮.৮	৩৭.০ (৪৬.৯ শতাংশ)
খাদ্য, দুগ্ধ উৎপাদন এবং পানীয়	২২	১১.২	৬.৫ (৫৮.০ শতাংশ)
মণ্ড ও কাগজ	৬৭	৩০৬.৩	২০১.৪ (৬৫.৮ শতাংশ)
চিনি	৬৭	৩০৪.৮	৯৬.০ (৩১.৫ শতাংশ)
বস্ত্র, ব্লিচিং এবং রঞ্জক	৬৩	১৪.১	১১.৪ (৮০.৯ শতাংশ)
চর্ম	৪৪৪	২৮.৭	২২.১ (৭৭.০ শতাংশ)
অন্যান্য	৪১	১৬৮.৩	২৮.৬ (১৭.০ শতাংশ)
মোট	**৭৬৪**	**১১২৩**	**৫০১ (৪৪.৬ শতাংশ)**

সূত্র : ভারতের কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, ২০১৩
*বন্ধনী মধ্যস্থ সংখ্যা ব্যবহৃত জলের পরিমাণের সাপেক্ষে নিকাশিত বর্জ্য জলের পরিমাণ—শতাংশ

"২০১১ সালের সর্বশেষ জনগণনা অনুযায়ী, এই অঞ্চলের (শহর এলাকায়) ৪৫ থেকে ৫৩ শতাংশ বাড়িতে সেপটিক ট্যাঙ্ক ব্যবহার করা হয়, কিন্তু সেই শৌচ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য কোনও পরিকল্পনা এবং বিশেষ পন্থাপদ্ধতির বালাই নেই। এইসব ট্যাঙ্কের বর্জ্য উন্মুক্ত মাঠ, খালি জায়গা এবং নালা-নর্দমায় খালাস করা হয়, যা শেষমেশ নদী প্রবাহকে দূষিত করে। খোলা স্থানে শৌচকর্ম করে থাকেন জনসংখ্যার ২৫ শতাংশেরও বেশি মানুষ, যা সরাসরি মানুষের শরীরস্বাস্থ্য এবং জলদূষণের ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলে।"

(iii) **শিল্পকারখানা নিঃসৃত বর্জ্য জল :** গঙ্গা তীরবর্তী বড় মাপের শহরাঞ্চলগুলি শিল্পোদ্যোগ হাবও বটে। তীব্র দূষণ সৃষ্টিকারী বড় ও ক্ষুদ্রায়তন রাসায়নিক, ভাটিখানা, খাদ্য এবং দুগ্ধ উৎপাদক, কাগজ ও মণ্ড, চিনি, বস্ত্র ও রঞ্জন, চামড়া প্রক্রিয়াকরণ— হরেকরকম শিল্পকারখানার জমজমাট অবস্থান সেখানে। এইসব শিল্পোদ্যোগ প্রচুর পরিমাণে জল ব্যবহার করে, দূষিত করে এবং নদীতে বিপুল পরিমাণে বর্জ্য জল নিকাশিত করে (সারণি-১ দ্রষ্টব্য)। এই বর্জ্য মিশ্রিত জল পরিশোধন করার ব্যবস্থাপত্র/প্রনিয়ম একেবারেই অপ্রতুল এবং প্রায়শই অবিবেচক শিল্পকারখানা কর্তৃপক্ষ এদিকটিকে উপেক্ষাই করে থাকেন। শিল্পকারখানার এই নিকাশী বর্জ্য সাধারণত ক্ষতিকর, বিষাক্ত এবং প্রাকৃতিক উপায়ে মাটিতে মিশে যায় না। ফলত তা নদীর জলচর জীবের জন্য এক বড়সড় বিপদ সংকেত।

(iv) **কৃষিক্ষেত্র থেকে দূষণ :** পৌর এবং শিল্পক্ষেত্র থেকে ছড়ানো দূষণের তুলনায় কৃষিক্ষেত্রের মাধ্যমে দূষণ অনেক বেশি পরিমিত তথা তীব্র নয়। তবে

চিত্র-১

গঙ্গা নদী প্রবাহের ৭০-টি স্থানে ৫ বছরে মোটের উপর গড়ে কলিফর্ম-এর পরিমাণ ভেদ

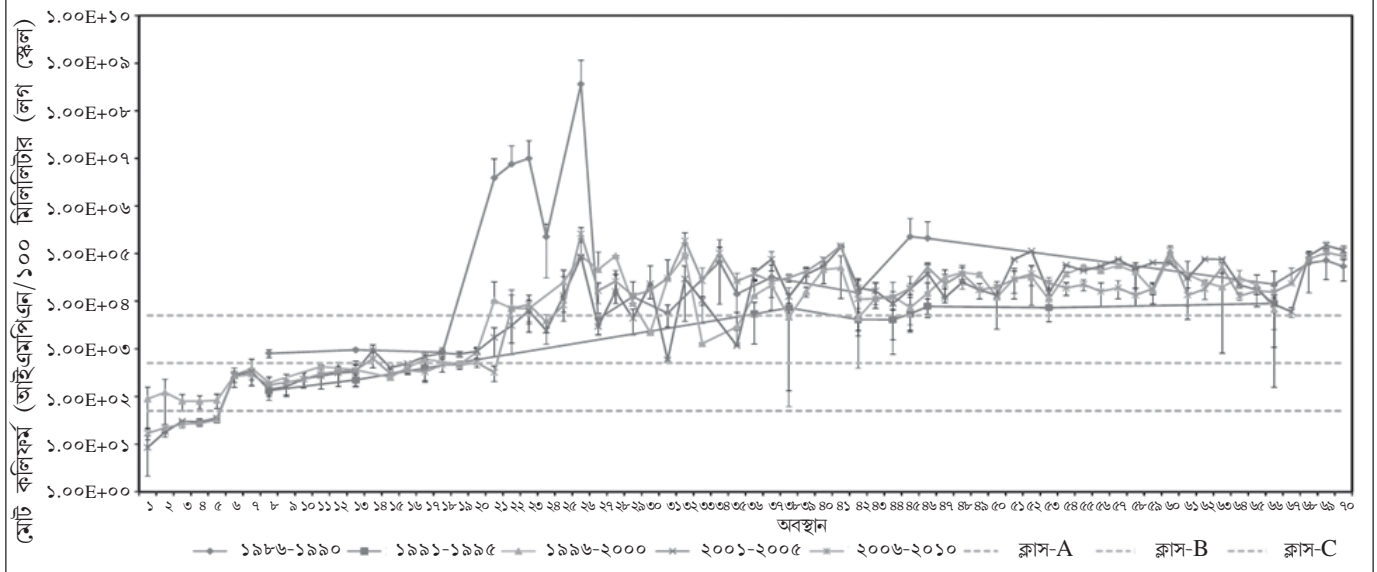

ক্লাস-A : প্রচলিত রীতিতে পরিশোধন না করে, তবে জীবাণুশূন্য করার পর পানীয় জলের উৎস হিসাবে ব্যবহৃত জল।
ক্লাস-B : উন্মুক্ত স্থানে সংগঠিত স্নানের জন্য ব্যবহৃত জল।
ক্লাস-C : প্রচলিত রীতিতে পরিশোধন ও তারপর জীবাণুশূন্য করে পানীয় জলের উৎস হিসাবে ব্যবহৃত জল।

অববাহিকা অঞ্চলে নদীখাতের একেবারে তীরেই ব্যাপক হারে চাষাবাদের ফলে কিছুটা পরিমাণ বিপর্যয়ের সম্ভাবনা থাকে; বিশেষত, ব্যবহৃত কীটনাশক, আগাছানাশক রাসায়নিকের অবশিষ্টাংশ থেকে (Trivedi, 2010)। নদী বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতিসাধন করার প্রচ্ছন্ন ক্ষমতা রয়েছে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত রাসায়নিকসমূহের; এর ফলে নদীর নিজেরই নিজেকে পরিশোধন করার (self-treatment) যে ক্ষমতা আছে তা বিনষ্ট হয়ে যায়। (গবাদি) পশুসম্পদ এবং জলজীবন বিকাশ (Aqua culture)-এর মাধ্যমে যে দূষণ ছড়ায় নদীতে তার রকমসকম এখনও ঠিকমতো বুঝে ওঠা যায়নি। চাষাবাদের ক্ষেত্রে নিবিড়তা এবং বৈচিত্র্য দুইই উত্তরোত্তর বাড়ছে। সাথে পাল্লা দিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে বাড়ছে সার এবং কৃষি রাসায়নিক-এর ব্যবহার। নদীর মিষ্টি জলের গুণমান অবনমনের অন্যতম কারণ এসবই।

(v) **নদীতে অপর্যাপ্ত জলপ্রবাহ :**

একটি সতেজ প্রাণবন্ত নদীর প্রধান বৈশিষ্ট্য কী? নদীর উপর নির্ভরশীল সমস্ত পক্ষের (stakeholders) যাবতীয় চাহিদা মেটানোর পরও সারা বছর ধরে নদীর যাত্রাপথের আগাগোড়া পর্যাপ্ত পরিমাণে নির্মল জলধারা মজুত থাকবে। বছরের কোনও সময়েই, যাত্রাপথের কোনও অংশ বিশেষেই নদীর গতি রুদ্ধ হবে না বা পর্যাপ্ত জলের অভাব দেখা দেবে না। কিন্তু আমরা সে বৈশিষ্ট্য ধরে রাখতে দিচ্ছি কই? মানুষ তার নিজের ও যাবতীয় কর্মকাণ্ডের জন্য জলের চাহিদা নিয়ে অতি সরব। কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে নিচ্ছে প্রয়োজনীয়ের অতিরিক্ত। আর "নিঃশব্দে, নিরবে" বইতে থাকা দেশের এই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'প্রাকৃতিক প্রবাহ' (environmental flow) আত্মবলীদান করে চলেছে। নদীখালের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণে ভূ-তল জল সরাসরি নদীর খাতের থেকে তুলে ফেলা তো হচ্ছেই; গোটা অববাহিকা জুড়েই পাম্পের সাহায্যে নির্বিচারে চলছে ভূ-গর্ভস্থ জল উত্তোলন। যা গভীর আঘাত হানছে নদীর প্রবাহ প্রণালীর উপর। সবচেয়ে করুণ দশা হরিদ্বার থেকে বারাণসী পর্যন্ত প্রায় ১,০৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ—নদীর মধ্যম প্রবাহ জুড়ে। সুবিস্তৃত নদীখাল নেটওয়ার্ক গড়ে তুলে এই পর্যায়ে নদী থেকে বিপুল পরিমাণ ভূ-তল জল তোলা হচ্ছে সেচের চাহিদা মেটাতে। একই হারে চলছে ভূ-গর্ভস্থ জল তোলার কাজ। এদিকে বিভিন্ন সূত্র থেকে মারাত্মক হারে দূষণ ছড়াচ্ছে নদীতে। হরিদ্বার, বিজনৌর এবং নারোরায় খালের মাধ্যমে ভূ-তল জল উত্তোলনের পরে নদীর প্রবাহ পরিমাপ করে দেখা গেছে যে আদি গঙ্গা নদীর প্রায় পুরোপুরি অবলুপ্তি ঘটেছে। বাস্তুতন্ত্রকে পরিপুষ্ট করার ক্ষমতা তখন হয় একেবারেই নেই, নয়তো সামান্যমাত্র অবশিষ্ট, সে তখন বিপুল দূষণভার বহন করে নীলকণ্ঠ (Mateo-Sagasta, 2015)।

নির্মল গঙ্গা : বিগত উদ্যোগ

গঙ্গা অববাহিকায় বসবাসকারী জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ২০ কোটিরও বেশি মানুষ জীবিকার জন্য নদীর উপর নির্ভরশীল। এরা ভারতের দরিদ্রতম জনসংখ্যার মধ্যে পড়ে। নদীর ভগ্নস্বাস্থ্য এবং তার অনুষঙ্গ হিসাবে পরিবেশগত, সাংস্কৃতিক এবং স্বাস্থ্যের উপর যে চূড়ান্ত প্রতিকূল প্রভাব পড়ছে তা এইসব মানুষদের জীবিকা নির্বাহের বিকল্প পথকে সংকীর্ণ করে দিচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যগুলিকে দারিদ্র্য হার বৃদ্ধির সঙ্গে 'জল দৈন্যতা' (Water

poverty)-র একটা জোরালো অনুবন্ধ আছে (Sharma ইত্যাদি, 2010)। অপরিশোধিত নিকাশী বর্জ্য তথা সেপটিক ট্যাঙ্কের বর্জ্য, অর্থাৎ মলমূত্রাদি সরাসরি নদী প্রবাহে নিক্ষেপ করার দরুন গঙ্গা যেভাবে কলুষিত হচ্ছে তা জনস্বাস্থ্যের উপর চরম ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। জলে কলিফম (Coliform) (এক ধরনের ক্ষতিকর ব্যাকটিরিয়া)-এর মাত্রা গোটা প্রবাহ পথেই নির্দিষ্ট সীমার থেকে অনেকটাই বেশি। কাজেই উচ্চপ্রবাহে সামান্য কয়েকটি স্থানকে বাদ দিলে, পুরো যাত্রা পথেই চিরাচরিত প্রথায় আবগাহনের জন্য গঙ্গার জল একেবারেই উপযুক্ত বা নিরাপদ নয়। পান করার তো প্রশ্নই নেই। আরও যেটা মারাত্মক চিন্তার কারণ—গত কয়েক দশক ধরেই পরিস্থিতির বিন্দুমাত্র উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি। পক্ষান্তরে, কলিফম-এর মাত্রা নিরবচ্ছিন্নভাবে বাড়তে বাড়তে ১৯৯৬ থেকে ২০১০-এ পৌঁছেছে। কোনও অঞ্চল বিশেষে নয়, নদীখাতের গোটা প্রবাহ পথেই ছবিটা এক (IITC, 2013, চিত্র-১ দ্রষ্টব্য)। গঙ্গা অববাহিকা অঞ্চলে প্রথম শ্রেণির শহরগুলি থেকে উৎপন্ন নিকাশী বর্জ্যের মাত্র ৪৪ শতাংশ পরিশোধনের ব্যবস্থাপত্র গড়ে তোলা গেছে। দ্বিতীয় শ্রেণির শহরগুলির ক্ষেত্রে এর পরিমাণ ৮ শতাংশ (সারণি-১ দ্রষ্টব্য) (CPCB, 2009) আর ছোট ছোট শহরগুলির ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটি কার্যত শূন্য। বড় নগরগুলির এক বিস্তৃত অংশ তথা অধিকাংশ শহরকে হয় নিকাশী নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার আওতায় আনা যায়নি, অথবা নিকাশী ব্যবস্থা সেখানে আদৌ কাজ করে না। আবার হয়তো বা নিকাশী ব্যবস্থা শেষ গন্তব্য হিসাবে 'treatment plant'-এ গিয়ে পৌঁছায় না। ফলত, বিপুল পরিমাণ বর্জ্য জল অপরিশোধিত থেকে যায়। আবার কোথাও হয়তো পরিশোধনের জন্য প্ল্যান্ট-সহ যথোপযুক্ত নিকাশী পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে; কিন্তু উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে তা ঠিক মতো কাজ করছে না। অর্থাৎ, এই পরিকাঠামো তার (সর্বোচ্চ) ক্ষমতা অনুযায়ী নয়, তার থেকে কম পরিমাণে বর্জ্য জল পরিশোধন করছে (CSE, 2014)।

শহরাঞ্চল, শিল্প এবং কৃষিক্ষেত্র থেকে উৎপন্ন/নিঃসৃত বর্জ্য এবং বর্জ্য জলে যে রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব (ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও অন্যান্য মাইক্রো-অর্গানিজম) এবং রাসায়নিক পদার্থ থাকে, তা গঙ্গার জল ও পলিতে জমা হতে হতে 'trophic chain'-এ পুঞ্জীভূত হয়ে মানুষের স্বাস্থ্য, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে অশনিসংকেত হয়ে দাঁড়ায় (Hernande–Sancho ইত্যাদি, 2015)। নদী বক্ষের জলস্তরে প্রজাতিগুলির উপরও এর তীব্র প্রতিকূল প্রভাব পড়ে। নদীর মধ্যগতিতে বসবাসকারী অধিকাংশ জলচর জীব প্রজাতিও চরম বিপন্নতার সম্মুখীন—নদীবক্ষে সরাসরি কলকারখানা নিঃসৃত অপরিশোধিত বর্জ্য নিক্ষেপের কারণে (Sarkar ইত্যাদি, 2012)। নদীর এই অংশে মৎস্য প্রজাতির মধ্যে ভারি ধাতু পুঞ্জিত হচ্ছে—এমনটা উঠে এসেছে পর্যবেক্ষণে। আগেই বলা হয়েছে এলাহাবাদের পাশ দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গার খাত তীব্র দূষণ ভারাক্রান্ত। বিগত ছয় দশক ধরেই গঙ্গার ওই অংশে অর্থকরী মৎস্য প্রজাতির উৎপাদনশীলতার নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘাটতি প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। সরকার ইত্যাদির, ২০১২ সালের বক্তব্য অনুযায়ী, প্রতি কিলোমিটারে ১৯৫০ সাল নাগাদ যেখানে ১৩৪৪ কিলোগ্রাম মাছ ধরা পড়ত; ২০১০ সালে এসে সেই পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০০ কিলোগ্রাম।

১৯৮২ এবং ১৯৮৪ সালে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ দু'টি বিশদ এবং তথ্যজ্ঞাপক সমীক্ষা চালায়। সমীক্ষায় উঠে আশে—গঙ্গায় অধিকাংশ পরিমাণ দূষণ ঘটছে উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গ—এই তিন রাজ্যে অবস্থিত ২৫-টি প্রথম শ্রেণির শহর থেকে। এই সমীক্ষার উপর ভিত্তি করেই সর্বপ্রথম (গঙ্গা) নদীর দূষণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রকৃত অর্থে জাতীয় স্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৮৫ সালে চালু হয় আন্তঃরাজ্য গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান (GAP)। উল্লিখিত ২৫-টি শহরের যে নিকাশী আবর্জনার পাহাড় গঙ্গায় এসে মেশে তা প্রতিরোধ করা তথা সেই নিকাশী বর্জ্য পরিশোধনের উপর মূলত নজর দেওয়া হয় এই পরিকল্পনায়। বহু বছর ধরে এই পরিকল্পনার কাজ চালিয়ে যাওয়া হয় বটে, কিন্তু নদীর জলের গুণমানের কোনও উন্নতি সাধন করা যায়নি। পরবর্তীকালে, ১৯৯৩ সালে চালু হয় GAP-II। গঙ্গা দূষণ নিয়ন্ত্রণের দ্বিতীয় পর্যায়ের এই পরিকল্পনায় উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গ—এই পাঁচটি রাজ্যে এখনও কাজ চলছে। GAP-I এবং II-এর ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী, ৩৭-টির বেশি শহরে নিকাশী বর্জ্য সরাসরি নদীতে নিক্ষেপ না করা তথা পরিশোধনের পরিকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়। এই পরিকল্পনার আওতায় তীব্র দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্পোদ্যোগগুলিকে চিহ্নিত করে তাদের ক্ষেত্রে নিকাশী আবর্জনা পরিশোধনের জন্য ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট গড়ে তোলা বাধ্যতামূলক করা হয়। পরিবেশ ও বনমন্ত্রকের হিসাব অনুযায়ী, ২০১১ সাল পর্যন্ত আনুমানিক ১৬১২.৩৮ কোটি খরচ করা হয়েছে। এই উদ্যোগ ছিল কেবল সূচনামাত্র এবং তা গঙ্গায় দূষণ সমস্যার ব্যাপকতার উপর আলোকপাত করতে সমর্থ হয়। তবে দু' দফায় GAP-এই বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা এবং বাধ্যবাধকতা ছিল। IIT Consortim (IITC, 2011)-এর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কিছু দূষণ বিষয়ক ইস্যুকেই

"গঙ্গাকে কলুষমুক্ত করার সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় কর্মকাণ্ড বন ও পরিবেশ মন্ত্রক এবং ক্যাবিনেট কমিটির হাত থেকে সরিয়ে জলসম্পদ মন্ত্রক (MoWR)-এর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তাগিদটা মন্ত্রকের নাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই সুস্পষ্ট হচ্ছে। মন্ত্রকের নতুন নামকরণ করা হয়েছে জলসম্পদ, নদী বিকাশ এবং গঙ্গা পুনরুজ্জীবন মন্ত্রক (MoWR, RD & GR)।"

বিবেচনায় আনা হয়েছিল। একে রূপায়ণের ক্ষেত্রে ব্যাপক বিলম্ব; তার উপর যেসব পরিসম্পদ গড়ে তোলা হয়েছিল সেগুলি চালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবসায়িক মডেল বা সংস্থান তৈরি করা হয়নি; ফলস্বরূপ, এগুলি হয় অকেজো হয়ে পড়ে অথবা বন্ধ হয়ে যায়। আবার কিছু কিছু STP-এ নিকাশী বর্জ্য বহনে সঠিক পরিকল্পনার অথবা প্ল্যান্ট চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত বিদ্যুতের জোগানের অভাবে প্রকৃত ক্ষমতার থেকে অনেক কম বর্জ্য পরিশোধিত হয়। GAP-এর উভয় পর্যায়েই এগুলিই ছিল মূল দুর্বলতার দিক।

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও উদ্ভাবনা

বিভিন্ন ট্রাইবুনাল ও আদালত থেকে এসেছে বিবিধ নির্দেশপত্র। নাগরিক সমাজও নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে থেকেছে। নতুন সরকার নিজেও কৃতসংকল্প। কাজেই কলুষমুক্ত করে গঙ্গা নদীর পুনরুজ্জীবন ঘটাতে বেশকিছু সংখ্যক আন্তরিক ও অর্থপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ ইতোমধ্যেই করা হয়েছে। এরকমই কয়েকটি উদ্যোগ নিয়ে এখানে আলোচনা করা হল।

(i) **নির্মল গঙ্গার জন্য জাতীয় মিশন (National Mission for Clean Ganga—NMCG) গঠন :** সমিতি নিবন্ধীকরণ আইন, ১৮৬০-এর আওতায় জলসম্পদ, নদী বিকাশ ও গঙ্গা পুনরুজ্জীবন সমিতি মন্ত্রক দ্বারা এই মিশন (প্রাথমিকভাবে বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের অধীনে ছিল) গঠন করা হয়। বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় জাতীয় গঙ্গা নদী অববাহিকা কর্তৃপক্ষ (NGRBA)-এর জাতীয় গঙ্গা নদী অববাহিকা প্রকল্প (NGRBP) রূপায়ণের জন্য এই মিশন হাতে নেওয়া হয়। NMCG হল কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে পরিকল্পনা, অর্থবরাদ্দ, নজরদারি ও সমন্বয়সাধনের জন্য নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান। একে সহায়তা করার জন্য আছে অনুরূপ রাজ্য স্তরীয় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা গ্রুপগুলি (SPMGs)। এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পিছনে ভাবনা ছিল মূলত NGRBA-র দু'টি উদ্দেশ্য পূরণ। প্রথম, দূষণের কার্যকর/প্রকৃত অবসান এবং দ্বিতীয়, নদী অববাহিকা বিষয়ে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের মাধ্যমে গঙ্গা নদীর সংরক্ষণ। এই লক্ষ্য পূরণে সহায়ক এমন যাবতীয় কর্মকাণ্ড হাতে নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করা হয় NMCG-কে।

"গঙ্গাই দুনিয়ার প্রথম নদী নয়—দূষণের চোটে যার ওষ্ঠাগত প্রাণ। এককালে দানিয়ুব, টেমস, রাইন, নীল নদ, এলব ইত্যাদি বহু নদীর ক্ষেত্রেই দূষণের মাত্রা গঙ্গার সমপরিমাণ এমনকী তার থেকেও বেশি কলুষিত ছিল। কিন্তু এর প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই জোরদার নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান গড়ে পরিস্থিতি আমূল বদলে ফেলা সম্ভব হয়েছে।"

(ii) **কর্মকাণ্ডের পুনঃবরাদ্দ এবং মন্ত্রকের ভূমিকা বদল :** কেন্দ্রের নতুন সরকারের একটি ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি হল গঙ্গাকে নির্মল করে তোলা। যার উপর নিয়মিত নজরদারি চালায় মন্ত্রীসভা সচিবালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর (PMO)। গঙ্গাকে কলুষমুক্ত করার সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় কর্মকাণ্ড বন ও পরিবেশ মন্ত্রক এবং ক্যাবিনেট কমিটির হাত থেকে সরিয়ে জলসম্পদ মন্ত্রক (MoWR)-এর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তাগিদটা মন্ত্রকের নাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই সুস্পষ্ট হচ্ছে। মন্ত্রকের নতুন নামকরণ করা হয়েছে জলসম্পদ, নদী বিকাশ এবং গঙ্গা পুনরুজ্জীবন মন্ত্রক (MoWR, RD & GR)। জাপান, ফ্রান্স, ইজরায়েল, ইংল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়ার মতো বেশকিছু বিদেশি রাষ্ট্র এবং IWMI, টেমস কর্তৃপক্ষ, মারে-ডার্লিং অববাহিকা কর্তৃপক্ষ ইত্যাদির মতো প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। আর ভারতের নিজস্ব ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির কনসর্টিয়াম তো আছেই।

(iii) **নমামি গঙ্গে :** ভারত সরকার সম্প্রতি (২০১৫ সালে) 'নমামি গঙ্গে' কর্মসূচিকে অনুমোদন দিয়েছে। এই কর্মসূচি গঙ্গা নদীকে সুরক্ষা দিতে তথা নির্মল করে তুলতে গৃহীত উদ্যোগগুলিকে এক সামগ্রিক উপায়ে সংহত করে তুলবে। পরবর্তী পরিকল্পনা সময়পর্বের জন্য এখাতে ভারতীয় মুদ্রায় ২০০ বিলিয়ন অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এই কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে অনেক বড় আকারে। এর মধ্যে উন্মুক্ত নিকাশী নালার মধ্যে দিয়ে অপসারিত বর্জ্য জল জৈবিক উপায়ে পরিশোধনের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ব্যবহৃত হচ্ছে উদ্ভাবনী প্রযুক্তি এবং অতিরিক্ত STP। কলকারখানা নিঃসৃত নিকাশী বর্জ্য জল-আবর্জনা শোধনের জন্য নতুন নতুন প্ল্যান্ট গড়ে তোলা হয়েছে। পুরোনো সমস্ত প্ল্যান্টগুলিরও ভোলবদল করা হয়েছে, যাতে সেগুলি চালু থাকে এবং সর্বোচ্চ দক্ষতা অনুযায়ী কাজ করে।

(iv) **গঙ্গা নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা :** দেশের সাতটি IIT-র একটি কনসর্টিয়াম বহু পরিশ্রম সাপেক্ষে এবং দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর এক সুবিস্তৃত গঙ্গা নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Ganga River Basin Management Plan—GRBMP)-র রূপরেখা চূড়ান্ত করেছে। এটি অনুমোদন এবং রূপায়ণের জন্য গঙ্গা নদী অববাহিকা কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে (Tare ইত্যাদি, 2015)। প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় আটটি মিশনের আকারে কিছু সুপারিশ করা হয়েছে, তথা পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এগুলি হল :

- অবিরল ধারা; অর্থাৎ বাধাহীন নিরবচ্ছিন্ন জলপ্রবাহ।
- নির্মল ধারা; অর্থাৎ অকলুষিত নির্মল জলপ্রবাহ।
- বাস্তুতান্ত্রিক পুনঃরুদ্ধার।
- দীর্ঘমেয়াদি কৃষিকাজ।
- ভূ-তাত্ত্বিক রক্ষাকবচ প্রদান।
- (প্রাকৃতিক) বিপর্যয়ের হাত থেকে অববাহিকাকে সুরক্ষিত করা।
- নদী ঝুঁকি (Hazards) ব্যবস্থাপনা।
- পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান-ভাণ্ডার গড়ে তোলা এবং তার প্রচার-প্রসার।

সুপারিশগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান হল সমস্ত দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্পের থেকে 'Zero discharge' নীতি সুনিশ্চিত করা, অর্থাৎ বর্জ্য আবর্জনা ফেলা পুরোপুরি বন্ধ করা। আগামী ২৫ বছর ধরে এইসব সুপারিশ কার্যকর/রূপায়ণ করার জন্য সর্বমোট খরচ হিসাব করা হয়েছে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

উপসংহার

গঙ্গাই দুনিয়ার প্রথম নদী নয়—দূষণের চোটে যার ওষ্ঠাগত প্রাণ। এককালে দানিয়ুব, টেমস, রাইন, নীল নদ, এলব ইত্যাদি বহু নদীর ক্ষেত্রেই দূষণের মাত্রা গঙ্গার সমপরিমাণ এমনকী তার থেকেও বেশি কলুষিত ছিল। কিন্তু এর প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই জোরদার নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান গড়ে পরিস্থিতি আমূল বদলে ফেলা সম্ভব হয়েছে। কাজ এগিয়েছে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। অববাহিকা-স্তরীয় জ্ঞানভাণ্ডার এবং চিত্রকল্প গড়ে তোলা হয়েছ। দূষণ সৃষ্টির মূল কেন্দ্র বা 'hot spot'-গুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে. কৃষিক্ষেত্রে (উৎপাদিত ফসলের) খাদ্যগুণ বাড়ানোর জন্য শহর ও গ্রামাঞ্চলের বর্জ্য আবর্জনার উপযুক্ত ব্যবহার (সার হিসাবে)-এর মাধ্যমে কার্যকর সম্ভাবনাময় সমাধান পন্থা খুঁজে বার করা হয়েছে। বিনিয়োগ এবং মধ্যস্থতা করার কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। নীতি নির্ধারণ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা গড়ে তুলতে সুপারিশ করা হয়েছে। এই সমস্ত উদ্যোগের মিলিত সুফল মিলেছে অচিরেই—উল্লেখিত নদীগুলিকে আজ নির্মল, কলুষমুক্ত করে আগের চেহারায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে অনেকাংশে। ভারতে অতীতে এবং বর্তমানেও নির্মল গঙ্গার লক্ষ্যে যে অর্থ বিনিয়োগ হচ্ছে; তথা যেসব কর্মকাণ্ড চালানো হচ্ছে তার সিংহভাগ দূষণের অবসান ঘটানোর জন্য নিকাশী ব্যবস্থা এবং প্রচলিত নিকাশী পরিশোধন প্ল্যান্ট নির্মাণকে ঘিরে। নিকাশী নেটওয়ার্কের আওতার বাইরে থাকা এলাকা থেকে বর্জ্য জল এবং শৌচাগারের বর্জ্য নির্বিচারে উন্মুক্ত স্থানে ফেলা হচ্ছে এবং পশুসম্পদ ও কৃষিক্ষেত্রের মতো অকেন্দ্রীভূত উৎস থেকেও যথেচ্ছ দূষণ ছড়াচ্ছে। এই দু'টি অনিয়ন্ত্রিত তথা বড় মাপের সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য বর্তমান এবং পরিকল্পিত বিনিয়োগে এখনও নজর দেওয়া হয়নি। প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে নতুন উদ্যোগগুলির ক্ষেত্রে বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে এবং সামগ্রিকতার নিরিখে সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। কীভাবে? তারও কয়েকটি দিকনির্দেশ করা হয়েছে। প্রথমত, নিকাশী ব্যবস্থাহীন শহরাঞ্চল থেকে দূষণভার হ্রাস করতে হবে—কৃষিক্ষেত্রে সেই নিকাশী বর্জ্যের নিরাপদ ব্যবহারের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতিক জলপ্রবাহের গুণগত ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটি বাস্তবসম্মত পদ্ধতির বিকাশ ঘটাতে হবে। তৃতীয়ত, একটি উদ্ভাবনী গঙ্গা প্রদর্শনী কেন্দ্র (Demonstration Centre) বা গঙ্গা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়তা করতে হবে। চতুর্থত, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে মুখ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলির (Major stakeholders) প্রশাসনিক, যোগাযোগ বিষয়ক এবং রূপায়ণ ক্ষেত্রে দক্ষতার মানোন্নয়ন ঘটাতে হবে। এইভাবে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সম্ভবপর হবে—গঙ্গায় নিরবচ্ছিন্ন নির্মল বারিধারা প্রবাহ সুনিশ্চিত করার বহু আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য।❑

(**লেখক পরিচিতি :** লেখক আন্তর্জাতিক জল ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান-এর নয়াদিল্লি স্থিত অফিসের অবৈতনিক বিজ্ঞানী (জলসম্পদ)। প্রসঙ্গত, নিবন্ধে ব্যক্ত মতামত একান্তভাবেই লেখকের নিজস্ব। প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গি এক্ষেত্রে ভিন্নও হতে পারে। ইমেল : briwmi@yahoo.co.in, b.sharma@cgiar-org)

উল্লেখপঞ্জী :

CPCB (2013) Pollution assessment : River Ganga. Central Pollution Control Board. Delhi.

CPCB (2013). Performance Evaluationof Sewage Treatment Plants under NRCD, Central Pollution Control Board, India

CSE 2014. Ganga : the river, its pollution and what can we do about it. A Center for Science and environment briefing paper. Delhi.

Hernandez—Sancho F, Lamizana B, Mateo-Sagasta J, and Qadir M (2015) Economic valuation of wastewater : the cost of action and the cost of no action. United Nations Environmental Program, Nairobi.

IITC (2010) : "River Ganga at a Glance : Identificationof Issues and Priority Actions for Restoration; 001_GBP_IIT_GEN_DAT_01_Ver 1_Dec 2010".

IITC (2011) : "Strength Weakness, Opportunity and Threat (SWOT) Analysis of Ganga Action Plan (GAP)". In : Ganga River Basin Management Plan, Interim Report. Indian Institutes of Technology of Bombay, Delhi, Guwahati, Kanpur, Kharagpur, Madras, Roorkee.

Mateo-Sagasta, J. (2015) Towares a healthy Ganges. Global Water Forum. Available at : http://www.globalwaterforum.org/tag/ganga/

MoEF (2011) "Status of Programs Under GAP-II as on 30-12-2009, Ministry of Environments and Forests, Government of India, available at http://moef.nic.in/modules/recentinitiatives/NGRBA/progress.htm

Ruhl, Onno. 2015. Saving Ganga will require planning and partnership. The World Bank in India (January, 2015). The World Bank, New Delhi Sarkar, U. K. and Dubey V. K. (2015). Threats to fish and fisheries in the Ganga Basin : Consequences of changing habitats and altering diversity patterns. Global Water Forum. Available at : http://www.globalwaterforum.org/tag/ganga/

Sharma, B.R., Amarasinghe, U.A., Cai, X., de Condappa, D.; Shah, T., Mukherji, A., Bharati, L., Ambili, G., Qureshi, A.S., Pant, D., Xenarios, S., Singh, R., Smakhtin, V. 2010. The Indus and the Ganges : river basins under extreme pressure. Water International, 35(5) : 493-521.

Tare, V., Roy, G. and Bose, P. (2015). Ganga River Basin Management Plan (2015). Main document. Indian Institutes of Technology of Bombay, Delhi, Guwahati, Kanpur, Kharagpur, Madras, Roorkee.

Trivedi, R.C., 2010. Water quality of the Ganga River - An overview. Aquatic Ecosystem Health & Management

বি । শে । ষ । নি । ব । ন্ধ

নদী সংযুক্তিকরণ প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা ও দক্ষ জল ব্যবস্থাপনা

জলসম্পদের পর্যাপ্ততা সত্ত্বেও ভারতের বহু রাজ্যেই জলের সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। এ সমস্যার সমাধান কী? নদী সংযুক্তিকরণ প্রকল্প ও দক্ষ জল ব্যবস্থাপনাই এর কার্যকর সমাধান হয়ে উঠতে পারে বলে আলোচ্য নিবন্ধে মত প্রকাশ করেছেন—**ড. আর. কে. শিবনাপ্পন**

ভূমি ও জলসম্পদের প্রাচুর্য ভারতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সমগ্র বিশ্বের স্থলভাগ, জলসম্পদ ও জনসংখ্যার যথাক্রমে প্রায় ২.৪ শতাংশ, ৪ শতাংশ ও ১৬.৯ শতাংশ রয়েছে ভারতে। এ দেশে জমির পরিমাণ ১৬৫ মিলিয়ন হেক্টর যা বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম। বিগত শতকের নব্বই দশকে ভারতীয় জনসংখ্যার প্রায় ৬৫ শতাংশই নিয়োজিত ছিলেন চাষবাসের কাজে, যার দ্বারা জল ও জমির ওপর আমাদের নির্ভরশীলতা সুস্পষ্ট হয়। এই কারণেই সার্বিক আর্থ-সামাজিক বিকাশের লক্ষ্যে জলসম্পদ উন্নয়নের বিষয়টি সর্বদাই গুরুত্ব পেয়ে এসেছে।

জলসম্পদের পর্যাপ্ততা সত্ত্বেও ভারতের বহু রাজ্যে জলের সমস্যা মারাত্মক আকার নিয়েছে। চলতি বছর, অর্থাৎ ২০১৬ সালে মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ-সহ দেশের প্রায় ১০-টি রাজ্যে জলসঙ্কট দেখা দিয়েছে। জলবিশেষজ্ঞ হিসাবে বিগত ৬০ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে আমি বরাবরই বলে এসেছি ভারতের জল সমস্যা মূলত মনুষ্যসৃষ্ট, আদৌ প্রাকৃতিক কারণে নয়। ভারতে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১১৫০ মিলিমিটার, যেখানে বিশ্ব গড়ের পরিমাণ ৮৪০ মিলিমিটার এবং ইজায়েলে ৪০০ মিলিমিটার। কম বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও ইজরায়েলের জল ব্যবস্থাপনার দিকটি খুবই উন্নত মানের, অন্যদিকে ভারতের চেরাপুঞ্জিতে গড়পড়তা ১১ হাজার মিলিমিটার বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও প্রতি বছর সেখানে প্রাগবর্ষার ২-৩ মাসে জলসঙ্কট দেখা দেয়।

অতি মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ হিসাবে জলসম্পদের সুলভ প্রাপ্তিই এলাকার মানুষের সুস্বাস্থ্য ও বিকাশকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে থাকে। প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী, যদি বার্ষিক মাথাপিছু ১০০০ ঘনমিটার থেকে বার্ষিক মাথাপিছু ১৭০০ ঘনমিটার পর্যন্ত জল পাওয়া সম্ভব নয়, তবে ঘাটতি স্থানীয় স্তরে সীমিত থাকবে। যদি এই পরিমাণ বার্ষিক মাথাপিছু ১০০০ ঘনমিটারের নিচে হয়, তবে মানুষের স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রয়াস ও জীবনযাত্রায় স্বাচ্ছন্দ্য বিঘ্নিত হবে। আর পরিমাণটি যদি ৫০০ ঘনমিটারেরও কম হয়, দেশে তীব্র জলসঙ্কট দেখা দেয়, বিপন্ন হয়ে পড়ে মানুষের জীবনযাত্রা। বিশ্ব ব্যাংক-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এখন বার্ষিক মাথাপিছু ১০০০ ঘনমিটারকে জলসঙ্কটের সাধারণ সূচক হিসাবে মেনে নিয়েছে।

জলসম্পদ

সামগ্রিকভাবে পৃথিবীতে জলসম্পদের অভাব নেই। এমনকী বিশ্ব জনসংখ্যা যদি আড়াই হাজার কোটিতেও পৌঁছায় (বর্তমান জনসংখ্যার প্রায় ৩-৪ গুণ) তাহলেও জলের পরিমাণ যথেষ্ট। ভারতেও ১৬৫ কোটি জনসংখ্যার ক্ষেত্রে (বার্ষিক মাথাপিছু ১৫০০ ঘনমিটার) জলের ভাণ্ডার পর্যাপ্তই থাকবে।

দেশে জলসম্পদের পরিমাণ নির্ধারণে নদী অববাহিকাগুলিকে জলবিজ্ঞানের মৌলিক একক বা ইউনিট বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। বারোটি বৃহৎ নদী-অববাহিকা-সহ গোটা দেশকে ২০-টি অববাহিকায় বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলির মোট জলধারণ এলাকা হল ২০ হাজার বর্গকিলোমিটার। আটটি অববাহিকা মাঝারি ও ক্ষুদ্র বলে চিহ্নিত হয়েছে।

সুসংহত জলসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত জাতীয় কমিশনের উদ্যোগে ১৯৯৯ সালে দেশে জলসম্পদের পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে ১৯৫.২৯ মিলিয়ন হেক্টর মিটার। কেন্দ্রীয় জল কমিশনের হিসাবের ভিত্তিতে সব কটি অববাহিকার মিলিত ব্যবহারযোগ্য জলসম্পদের পরিমাণ হল ৬৯ মিলিয়ন হেক্টর মিটার বা মোট ভূতল জলের প্রায় ৩৫ শতাংশ। এই পরিমাণ জলের সাহায্যে প্রায় ৭৬ মিলিয়ন হেক্টর চাষযোগ্য এলাকার সেচ-এর চাহিদা মেটানো সম্ভব। রাষ্ট্রীয় জল বিকাশ অভিকরণ বা এন.ডব্লিউ.ডি.এ.-র প্রস্তাবিত আন্তঃ-অববাহিকা-স্থানান্তর কার্যকর হলে অতিরিক্ত ২০ থেকে ২৫ মিলিয়ন হেক্টর মিটার জলের সদ্ব্যবহার সম্ভব হবে। এছাড়া আরও একটি প্রাথমিক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ভূ-গর্ভস্থ জলসম্পদের কৃত্রিম উপায়ে পুনরুজ্জীবন ঘটানোর মাধ্যমে অতিরিক্ত ১৬ মিলিয়ন হেক্টর মিটার জলসম্পদের সদ্ব্যবহার হতে পারে।

কেন্দ্রীয় ভূ-গর্ভস্থ জল পর্ষদের উদ্যোগে পুনরুজ্জীবন সম্ভবপর এমন ভূ-গর্ভস্থ জলসম্পদ সম্পর্কে যে সর্বশেষ সমীক্ষাটি ১৯৯৪-৯৫ সালে করা হয়েছিল তা থেকে ৪৩.২০ মিলিয়ন হেক্টর মিটার পরিমাণের হদিশ পাওয়া যায়। এর মধ্যে ব্যবহারযোগ্য ভূ-গর্ভস্থ জলের পরিমাণ ছিল ৩৯.৫৬ মিলিয়ন হেক্টর মিটার, গার্হস্থ্য ও শিল্পে ব্যবহার্য ৭ মিলিয়ন হেক্টর মিটার এবং সেচের জন্য ৩২.৫৬ মিলিয়ন হেক্টর মিটার—যার দ্বারা ৬৪ মিলিয়ন হেক্টর মিটার জমিতে সেচের জল পৌঁছে দেওয়া সম্ভবপর। বর্তমানে মোট সেচসিক্ত এলাকা প্রায় ১৪০ মিলিয়ন হেক্টর মিটার। ভূ-তল জলের দ্বারা ৭৬ মিলিয়ন হেক্টর মিটার এবং ভূ-গর্ভস্থ জল দ্বারা ৬৪ মিলিয়ন হেক্টর মিটার জমিতে

সেচের ব্যবস্থা করা হয়। প্রসঙ্গত, বিভিন্ন ধরনের জলসম্পদ এবং তার সদ্ব্যবহার সংক্রান্ত খুঁটিনাটি দিকগুলির অববাহিকাভিত্তিক তথ্যাবলি সারণি-১-এ উল্লেখ করা হল।

দেশে প্রাপ্ত জল ও ব্যবহারযোগ্য জলসম্পদের নির্ধারিত পরিমাণ এই রকম।

নদী প্রবাহ (ভূ-তলস্থিত জল) + ভূ-গর্ভস্থ জল = ১৯৫.২৯ + ৪৩.২০ = ২৩৮.৪৯ মিলিয়ন হেক্টর মিটার।
নির্ধারিত ব্যবহারযোগ্য জল = ৬৯.০০ + ৩৯.৫৬ = ১০৮.৬০ মিলিয়ন হেক্টর মিটার।

১৯৯১ সাল থেকে ২০৫০ (প্রত্যাশিত) সাল অবধি ভারতের জনসংখ্যার সাপেক্ষে মোট প্রাপ্ত জলের পরিমাণ এবং জলসম্পদের সদ্ব্যবহার সংক্রান্ত বার্ষিক মাথাপিছু হিসাব সারণি-২-এ উল্লেখ করা হল।

বার্ষিক মাথাপিছু ব্যবহারযোগ্য জলসম্পদের পরিমাণ অববাহিকাভেদে পরিবর্তিত হয়। যেমন, নর্মদা অববাহিকার ব্যবহারযোগ্য এই জলসম্পদের পরিমাণ ৩০২০ ঘনমিটার, অন্যদিকে সাবরমতী অববাহিকায় এই পরিমাণ ১৮০ ঘনমিটার। কুড়িটি অববাহিকার মধ্যে চারটির ক্ষেত্রে বার্ষিক মাথাপিছু ব্যবহারযোগ্য জলসম্পদ-এর পরিমাণ ১৭০০ ঘনমিটার-এর বেশি, অন্যদিকে ৯-টি অববাহিকায় এই পরিমাণ ১০০০ থেকে ১৭০০ ঘনমিটার; ৫-টির ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য বার্ষিক মাথাপিছু জলসম্পদ ৫০০ থেকে ১ হাজার ঘনমিটার-এর মধ্যে সীমিত এবং দু'টির ক্ষেত্রে ৫০০ ঘনমিটারেরও নিচে। এগুলি সবই ১৯৯১ সালের হিসাব, যখন ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৮৫.১ কোটি। মনে করা হচ্ছে যে, ২০৫০ সাল নাগাদ জনসংখ্যা ১৬৫ কোটিতে পৌঁছতে পারে এবং সেই সময় খাদ্যশস্যের চাহিদা দাঁড়াবে প্রায় ৫৫০-৬০০ মেট্রিক টনে (যার মধ্যে সংরক্ষণ ও পরিবহণকালীন ক্ষয়ক্ষতি, বীজ হিসাবে ব্যবহার, বৃষ্টিপাতের ঘাটতির কারণে শস্যহানি ইত্যাদিও ধরা হয়েছে)।

বড় বড় ও মাঝারি বিভিন্ন নদী প্রকল্পের অববাহিকাগুলিতে জলধারণ ক্ষমতা ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ছিল প্রায় ১৭.৩৭ মিলিয়ন হেক্টর মিটার। নির্মীয়মান এবং চিহ্নিত বড় বড় ও মাঝারি প্রকল্পগুলির ক্ষমতা ধরা হয়েছিল যথাক্রমে ৭.৫৪ মিলিয়ন হেক্টর মিটার ও ১৩.২৩ মিলিয়ন হেক্টর মিটার। মোট ধারণ ক্ষমতা ৩৮.১৫ মিলিয়ন হেক্টর মিটার। পুকুর দিঘি ইত্যাদির মতো ক্ষুদ্র জলাধার কাঠামোগুলির (প্রায় ৪ মিলিয়ন হেক্টর মিটার) সংরক্ষণকে ধরলে সব মিলিয়ে ক্ষমতা দাঁড়ায় ৪২ মিলিয়ন হেক্টর মিটার। ১২১ কোটি জনসংখ্যার দেশে এই জল সংরক্ষণ ক্ষমতা মাথাপিছু হিসাবে ৩৫০ ঘনমিটার যা কী না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চিনের সঙ্গে তুলনায় অনেক কম। তবে এটাও এখানে মনে রাখা

সারণি-১
গড় প্রবাহ, ব্যবহারযোগ্য ভূ-তল ও ভূ-গর্ভস্থ জলসম্পদ—অববাহিকা অনুযায়ী
(বিলিয়ন কিউবিক মিটার)

ক্রমিক সংখ্যা	নদী অববাহিকা	গড় প্রবাহ	ব্যবহারযোগ্য প্রবাহ	পুনর্নবীকরণ-যোগ্য	ব্যবহারযোগ্য
		ভূ-তল জল	ভূ-তল জল	ভূ-গর্ভস্থ জল	ভূ-গর্ভস্থ জল
১.	সিন্ধু	৭৩.৩১	৪৬.০	২৬.৫০	২৪.৩
২এ.	গঙ্গা	৫২৫.০২	২৫০.০	১৭১.০০	১৫৬.৮
২বি.	ব্রহ্মপুত্র	*৬২৯.০৫	২৪.০	২৬.৫৫	২৪.৪
২সি.	বরাক	৪৮.৩৬	—	৮.৫২	৭.৮
৩.	গোদাবরী	১১০.৫৪	৭৬.৩	৪০.৬৪	৩৭.২
৪.	কৃষ্ণা	**৬৯.৮১	৫৮.০	২৬.৪০	২৪.২
৫.	কাবেরী	২১.৩৬	১৯.০	১২.৩০	১১.৩০
৬.	সুবর্ণরেখা	১২.৩৭	৬.৮	১.৮২	১.৭
৭.	ব্রাহ্মণী-বৈতরণী	২৮.৪৮	১৮.৩	৪.০৫	৩.৭
৮.	মহানদী	৬৬.৮৮	৫০.০	১৬.৫০	১৫.১
৯.	পেনার	৬.৩২	৬.৯	৪.৯৩	৪.৫
১০.	মণি	১১.০২	৩.১	৭.২০	৬.৬
১১.	সবরমতী	৩.৮১	১.৯	—	—
১২.	নর্মদা	৪৫.৬৪	৩৪.৫	১০.৮০	৯.৯
১৩.		১৪.৮৮	১৪.৫	৮.২৭	৭.৬
১৪.	তাপি এবং তাদ্রি মধ্যবর্তী পশ্চিমবাহিনী নদীসমূহ	৮৭.৪১	১১.৯	১৭.৭০	১৬.২০
১৫.	তাদ্রি ও কন্যাকুমারী মধ্যবর্তী পশ্চিমবাহিনী নদীসমূহ	১১৩.৫৩	২৪.৩	—	—
১৬.	মহানদী ও পেনার মধ্যবর্তী পূর্ববাহিনী নদীসমূহ	২২.৫২	১৩.১	১১.২২	১০.৩
১৭.	কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্রের পূর্ববাহিনী নদীসমূহ ও লুনি	১৬.৪৬	১৬.৭	১৮.৮০	১৭.২০
১৮.	কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্রের পশ্চিম-বাহিনী নদীসমূহ ও লুনি	১৫.১০	১৫.০	০	০
১৯.	রাজস্থানের অন্তর্দেশীয় নিকাশী এলাকা	০০.০০	—	—	—
২০.	বাংলাদেশ ও মায়ানমারের মধ্যে গিয়ে পড়া ছোট নদীসমূহ	৩১.০	—	১৮.১২	১৬.৮
	মোট	**১৯৫২.৮৭**	**৬৯০.৩**	**৪৩১.৩২**	**৩৯৫.৬**

সূত্র : সি.ডব্লিউ.সি., প্রকাশন ৬/৩৯—রিঅ্যাসেসমেন্ট অফ ওয়াটার রির্সোসেস পোটেনশিয়াল অফ ইন্ডিয়া, গ্রাউন্ড ওয়াটার রির্সোসেস অফ ইন্ডিয়া সি.জি.ডব্লিউ.বি.—১৯৯৫।

দরকার যে গোটা বিশ্বে যে ৪৫ হাজার বৃহৎ নদীবাঁধ রয়েছে তার ৪৬ শতাংশ চিনে, ১৪ শতাংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং মাত্র ৯ শতাংশ ভারতে অবস্থিত। জাপান ও স্পেনের ক্ষেত্রে এই হিসাব যথাক্রমে ৬ শতাংশ ও ৩ শতাংশ। এসব তথ্য প্রমাণ করে যে জনসংখ্যার মাপকাঠিতে বিশ্বের বহু দেশের তুলনায় ভারতের জলসম্পদ মজুতের ক্ষমতা ও বাঁধের সংখ্যা অনেকটাই কম।

সারণি-১ এবং ২-এ উল্লেখিত পরিসংখ্যান ও তথ্যাবলির ভিত্তিতে ২০৫০ সাল নাগাদ দেশে ১৬৫ কোটি মানুষের জন্য ভূ-তল ও ভূ-গর্ভস্থ মিলিয়ে মোট জলের পরিমাণ হল ২৩৮.৫০ মিলিয়ন হেক্টর মিটার, অর্থাৎ, বার্ষিক মাথাপিছু প্রাপ্ত জলের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ১৪৫০ ঘনমিটার। ১৭০০ ঘনমিটারের কম হওয়ায় এই হিসাব জলের ঘাটতি সূচিত করছে এবং বিশ্ব ব্যাংক ও রাষ্ট্রসংঘের নির্ধারিত মাপকাঠি অনুসারে দেশে গভীর জলসঙ্কটের আশঙ্কা রয়েছে। যদি ২০৫০ সালে ১৬৫ কোটি জনসংখ্যার জন্য শুধুমাত্র ব্যবহারযোগ্য জলের হিসাব (১০৮.৬০ মিলিয়ন হেক্টর মিটার) ধরা হয়, তাহলেও মাথাপিছু বরাদ্দ দাঁড়াচ্ছে ৬৮০ ঘনমিটার, যা মাথাপিছু বার্ষিক প্রাপ্য জলের পরিমাণ, অর্থাৎ, ১ হাজার ঘনমিটারের চেয়ে কম। এর অর্থ হল চরম জলসঙ্কট, যা দেশের কৃষিফলন তথা সার্বিকভাবে অর্থনীতির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে বাধ্য।

সারণি-২
ভারতে বার্ষিক মাথাপিছু প্রাপ্ত এবং ব্যবহারযোগ্য জলসম্পদ-এর পরিমাণ (ঘনমিটার)
(১৯৯১ থেকে ২০৫০)

বছর	জনসংখ্যা (মিলিয়নে)	প্রাপ্ত জল ২৮৩.৫ মিলিয়ন হেক্টর মিটার মাথাপিছু/বার্ষিক ঘনমিটার	ব্যবহারযোগ্য জল ১০৮.৬০ মিলিয়ন হেক্টর মিটার মাথপিছু/ বর্ষিক ঘনমিটার	মন্তব্য
১৯৯১	৮৫০	২৮৩০	১২৯০	৫০০এম^3—চরম সঙ্কট ১০০০—সঙ্কট ও চাপ ১৭০০—স্থানীয় স্তরে সঙ্কট এবং অভাব >১৭০০এম^3—জল—কোন সমস্যা নেই এম^3 = ঘনমিটার এম.এইচ.এম. = মিলিয়ন হেক্টর মিটার
২০০১	১০৩০	২৩১৬	১০৫৫	
২০১১	১২১০	১৯৭০	৯১০	
২০২৫	১৩৫০-১৪০০ (আনুমানিক)	১৭০০	৭৮০	
২০৫০	১৬৫০ (আনুমানিক)	১৪৪৫	৬৮০	

নদীপ্রবাহ সংযুক্তকরণ

এই অবস্থায় দেশের নদীগুলি থেকে প্রাপ্ত জলের (১৯৫ মিলিয়ন হেক্টর মিটার) সদ্ব্যবহারের স্বার্থে সেগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করার বিষয়ে সরকারকে কালক্ষেপ না করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আগেই বলা হয়েছে, দেশে জলের ঘাটতি নেই, তবে অসম বণ্টনের সমস্যা আছে, বিশেষ করে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের এক সুবিস্তৃত এলাকায়। যে অব্যবহৃত ৬৫ শতাংশ জল সমুদ্রে গিয়ে মিশছে, তার সদ্ব্যবহারের জন্য উদ্বৃত্ত এলাকার জলকে ঘাটতি এলাকায় নিয়ে যেতে হবে। জল সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে সরকার ১৯৮২ সালে রাষ্ট্রীয় জল বিকাশ অভিকরণ গঠন করে। এটি একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান যার সার্বিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে রয়েছে কেন্দ্রীয় সেচ মন্ত্রক।

রাষ্ট্রীয় জল বিকাশ অভিকরণ-এর অন্যতম কাজ হল নদী সংযুক্তিকরণের তিনটি প্রকল্পের সম্ভাব্য সব দিক খতিয়ে দেখা। প্রকল্প তিনটি হল :

(এক) গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সংযুক্তকরণ বা হিমালয়ের নদীগুলির বিকাশ।

(দুই) মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, পেনার, কাবেরী ও ভৈগাই-এর মতো উপদ্বীপ অঞ্চলের নদীগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করা বা উপদ্বীপ অঞ্চলের নদীগুলির বিকাশ।

(তিন) কেরল, কর্ণাটক, গোয়া ও মহারাষ্ট্রের পশ্চিমবাহিনী নদীগুলিকে তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে পূর্বদিকে প্রবাহিত করা।

উল্লিখিত তিনটি প্রস্তাবের প্রতিটিই রূপায়ণযোগ্য। 'দুই' ও 'তিন' নং প্রস্তাবের সম্ভাব্য সকল দিক ইতিমধ্যেই খতিয়ে দেখা হয়েছে এবং এই দুই প্রকল্পের ব্যয়ভার যুক্তিসঙ্গত মাত্রার মধ্যে হওয়ার অবিলম্বে বাস্তবায়িত করা যেতে পারে।

● **উপদ্বীপ অঞ্চলের নদীগুলির সংযুক্ত-করণ :** রাষ্ট্রীয় জনবিকাশ অভিকরণ-এর কাজকর্ম প্রশংসার দাবি রাখে। উপদ্বীপ অঞ্চলের নদীগুলির সংযুক্তিকরণ পরিকল্পনার আওতায় এই সংস্থা ইতোমধ্যেই ১৭-টি প্রস্তাব পেশ করেছে। এছাড়া এগুলির সম্ভাব্যতা সমীক্ষাও সম্পন্ন হয়েছে।

উপদ্বীপ অঞ্চলের নদীগুলির মধ্যে মহানদী ও গোদাবরী—এই দু'টি থেকে প্রচুর উদ্বৃত্ত জল স্থানান্তরের সম্ভাবনা রয়েছে, এমন কী নদীগুলির অববাহিকা অঞ্চলে স্থিত রাজ্যগুলির নির্দিষ্ট চাহিদা পূরণ করার পরও। প্রস্তাব করা হয়েছে যে, মাধ্যাকর্ষণ প্রবাহের (Gravity flow) সাহায্যে মহানদীর বাড়তি জলপ্রবাহকে গোদাবরীতে স্থানান্তরিত করতে পূর্ব তট বরাবর মহানদী-গোদাবরী সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব। বাস্তবায়িত হলে এই প্রকল্পের দ্বারা মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুর খরাপ্রবণ এলাকায় সেচের জল পৌঁছনো যেতে পারে। একইভাবে কৃষ্ণা-পেনার সংযোগের ফলে সংশ্লিষ্ট দুই নদীর অববাহিকা অঞ্চলের সেচের জলের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব।

পেনার-কাবেরী সংযোগ প্রবাহ কাবেরীর প্রধান বাঁধে গিয়ে পড়বে। যাত্রাপথের চাহিদা মেটানোর পর প্রায় ১৮০ হাজার মিলিয়ন কিউবিক ফুট জল প্রধান বাঁধে গিয়ে পৌঁছবে। এর মধ্যে প্রায় ১০০ হাজার মিলিয়ন কিউবিক

ফুট জল কাবেরী অববাহিকায় ও অবশিষ্ট ৮০ হাজার মিলিয়ন কিউবিক ফুট জল ভৈগাই ও ভানিপ্পা অববাহিকায় সেচের কাজে ব্যবহৃত হবে। রাষ্ট্রীয় জল বিকাশ অভিকরণ-এর দশ বছর আগেকার সমীক্ষা অনুযায়ী, ৩৭১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ মহানদী-গোদাবরী-কাবেরী ও ভৈগাই সংযুক্তিকরণের আনুমানিক খরচ পড়বে ৩০ হাজার কোটি টাকা এবং এর ফলে প্রায় ১০০০ হাজার মিলিয়ন কিউবিক ফুট উদ্বৃত্ত জল স্থানান্তরিত করা সম্ভব হবে।

আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক সংগৃহীত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে কেরল রাজ্যের জলের চাহিদা নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি মনে করেন অভিকরণ ১০০০ হাজার মিলিয়ন কিউবিক ফুট উদ্বৃত্তের কথা উল্লেখ করলেও প্রকৃত পরিমাণ দাঁড়াবে ৫০০ হাজার মিলিয়ন কিউবিক ফুট। এই পরিমাণ জল যদি পূর্বদিকে সরিয়ে আনা হয় তবে তামিলনাড়ুর দক্ষিণের জেলাগুলিতে ৫০ লক্ষ একর জমিতে সেচের জল পৌঁছনো সম্ভব হবে।

স্থানান্তকরণের অঙ্গ হিসেবে পশ্চিমবাহিনী নদীগুলিকে পূর্বদিকে কেরল রাজ্যে সরিয়ে আনার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার উদ্যোগে এ বিষয়ে নীল নকশা প্রস্তুত করা হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কেরালার ২৫০ হাজার মিলিয়ন কিউবিক ফুট জল পামবা নদীতে এবং আচান কয়েল নদীর ২২ হাজার মিলিয়ন কিউবিক জল তামিলনাড়ুর ভাইয়াপ্পার নদীতে সরিয়ে আনলে তিরুনেলভেলির মতো একাধিক খরাপীড়ির জেলা উপকৃত হবে।

এছাড়া পাণ্ডিয়ার ও পুন্নমপুজা প্রকল্পও তামিলনাড়ুর কৃষকদের পক্ষে সুফলদায়ী হতে পারে। দীর্ঘদিন আগে একে একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প হিসাবে গড়ে তোলার কথা ভাবা হয়েছিল। পরে তামিলনাড়ুর কৃষকরা একটি সেচ তথা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প হিসাবে এটির ব্যাপারে আগ্রহী হন, কিন্তু কেরালা সরকার বেঁকে বসে। প্রকল্পটি রূপায়িত হলে প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার মিলিয়ন কিউবক ফুট জল, যা এখন আরবসাগরের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে তাকে তামিলনাড়ুর ভবানী/মোয়ার অববাহিকায় সরিয়ে এনে কোয়েম্বাটুর, তিরুপ্পর ও এরোদের মতো শুষ্ক জেলাগুলিতে সেচের কাজে লাগানো

চিত্র-১

ভারত সরকারের জলসম্পদমণ্ডলের কাছে অনুমোদনের জন্য জমা দেওয়া প্রস্তাব

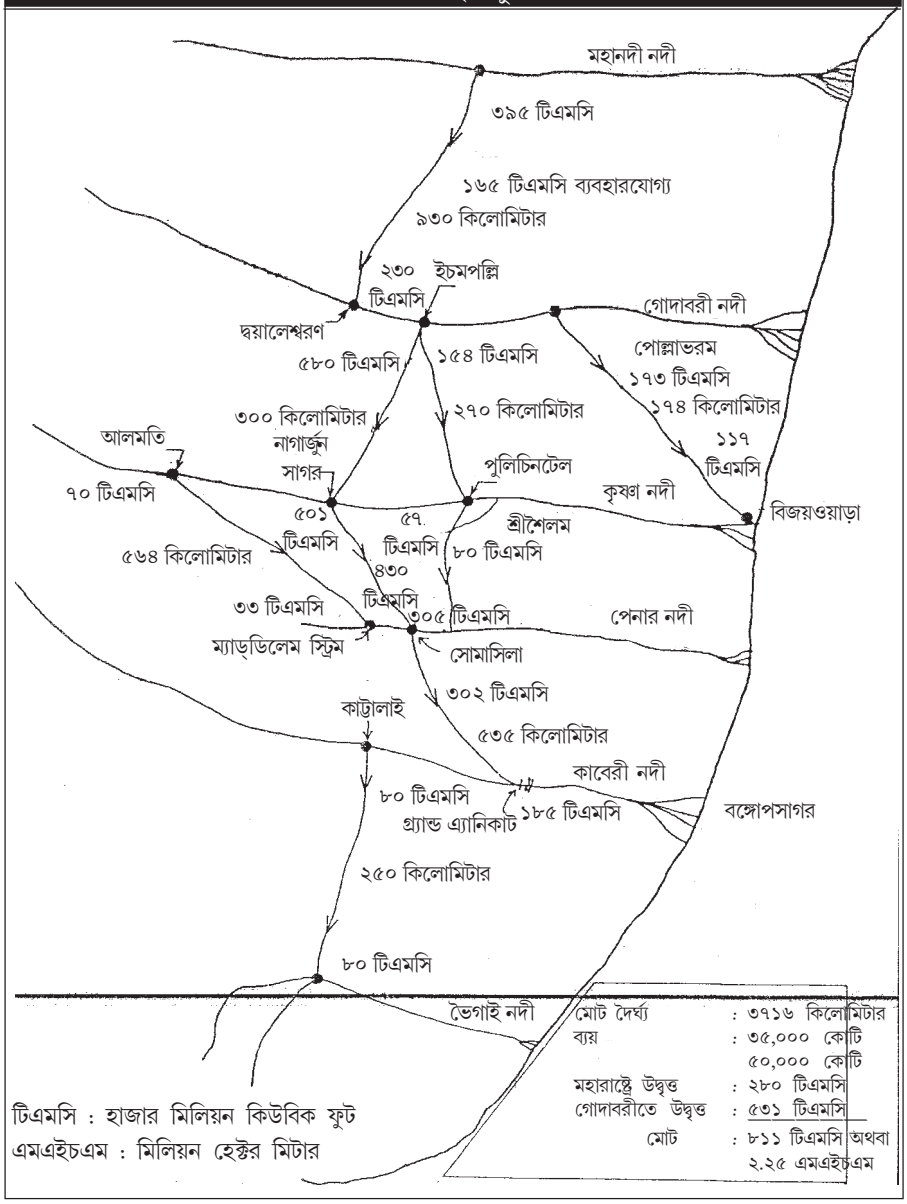

সম্ভব হত। সংস্থার মতে এই প্রকল্পটি আর্থিক দিক থেকে যুক্তিসঙ্গত এবং সম্ভাবনাপূর্ণ, তাই অবিলম্বে রূপায়িত করা দরকার।

● **কর্ণাটকের পশ্চিমবাহিনী নদীগুলির পূর্বদিকে গতি পরিবর্তন :** কর্ণাটকের পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ওই রাজ্যের প্রায় ১৩ শতাংশ ভৌগোলিক এলাকা অধিকার করে রয়েছে, যেখানে রাজ্যের জলসম্পদের ৬০ শতাংশ পাওয়া যায়। প্রচুর বৃষ্টিপাতজনিত ওই জলসম্পদ কোনও কাজে আসে না, কারণ সবটাই আরবসাগরে গিয়ে পড়ে। রাজ্যের ভৌগোলিক এলাকার অবশিষ্ট ৮৭ শতাংশে (যার অধিকাংশই কৃষ্ণা ও কাবেরী অববাহিকার অন্তর্গত) পাওয়া যায় মাত্র ৪০ শতাংশ জল। এই জলের জন্যই কর্ণাটকের সঙ্গে তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশের বিরোধ, যা আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। কর্ণাটকের উত্তর কন্নড় ও দক্ষিণ কন্নড়ের বিভিন্ন জেলার পশ্চিমবাহিনী নদীগুলি থেকে সব মিলিয়ে বার্ষিক ২ হাজার টি.এম.সি. (সারণি-৩ দ্রষ্টব্য) জল পাওয়া যায়, যেখানে কৃষ্ণা ও কাবেরীর সম্মিলিত পরিমাণ হল ১৩০০ টি.এম.সি.। আমরা সহজেই পশ্চিমঘাট পর্বতমালা বরাবর পশ্চিমবাহিনী নদীগুলির জলকে পূর্ব

তামিলনাড়ুতে সরিয়ে আনতে পারি। এ কাজে বিপুল ব্যয়নির্বাহ বা মানুষকে বাস্তুচ্যুত করার প্রয়োজন পড়বে না এবং অঞ্চলের পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রও ব্যাহত হবে না। পাম্প স্টোরেজ ব্যবস্থার দ্বারা এটা করা সম্ভব। এর ফলে কর্ণাটকের চাহিদা মিটিয়ে সেরাজ্যের বাড়তি জল তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশের উপকারে আসবে।

উল্লিখিত পাঁচটি প্রকল্প যদি বাস্তবায়িত হয় তবে অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, কেরালা ও পুদুচেরির মতো দক্ষিণী রাজ্যগুলির জল ও জ্বালানি সংক্রান্ত সমস্যা সকলের পক্ষেই সন্তোষজনকভাবে সমাধান করা যাবে।

● **গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের খাতমুখ পরিবর্তন বা হিমালয়ের নদীসমূহের বিকাশ :** সমগ্র দেশের জল সমস্যার সমাধানকল্পে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রকে দেশের পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলীয় নদীগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করার সম্ভাব্য দিক নিয়ে বিশদ সমীক্ষা হওয়া দরকার। প্রকল্পটিতে ৮ থেকে ১০ লক্ষ কোটি টাকা খরচ হতে পারে, ভবিষ্যতের সুফলপ্রাপ্তির নিরিখে এই পরিমাণ তেমন বেশিকিছু নয়। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে হয়তো নেপাল, বাংলাদেশ ও ভুটানের সহযোগিতা আবশ্যক হতে পারে, তাই আপাতত আমাদের উপদ্বীপ সংক্রান্ত নদী উন্নয়নের ওপর জোর দিয়ে পশ্চিমবাহিনী নদীর জলকে পূর্বদিকে প্রবাহিত করাই বাস্তবসম্মত হবে, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সংযুক্তির বিষয়টিতে পরে হাত দেওয়া যেতে পারে।

সুদক্ষ জল ব্যবস্থাপনা

দেশে জলের ঘাটতি মেটাতে নয়া সেচ কৌশল তথা জল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ বা প্রবর্তন করা যেতে পারে। এগুলি হল :

● ধান চাষে সুসংহত নয়া পদ্ধতি অনুসরণ করে ৪০-৫০ শতাংশ জলের ব্যবহার কমানো এবং হেক্টরপিছু ফলন ৩ থেকে ৪ টন বাড়ানো সম্ভব।

● নিকাশী ব্যবস্থা গড়ে তোলা বিশেষ করে খাল/জলাশয়-এর মাধ্যমে সেচের ক্ষেত্রে এবং নিষ্কাশিত জলের সেচ উপযোগিতা থাকলে তা পুনর্ব্যবহার করা।

চিত্র-২
প্রস্তাবিত আন্তঃ অববাহিকা জল স্থানান্তর সংযোগ প্রবাহ

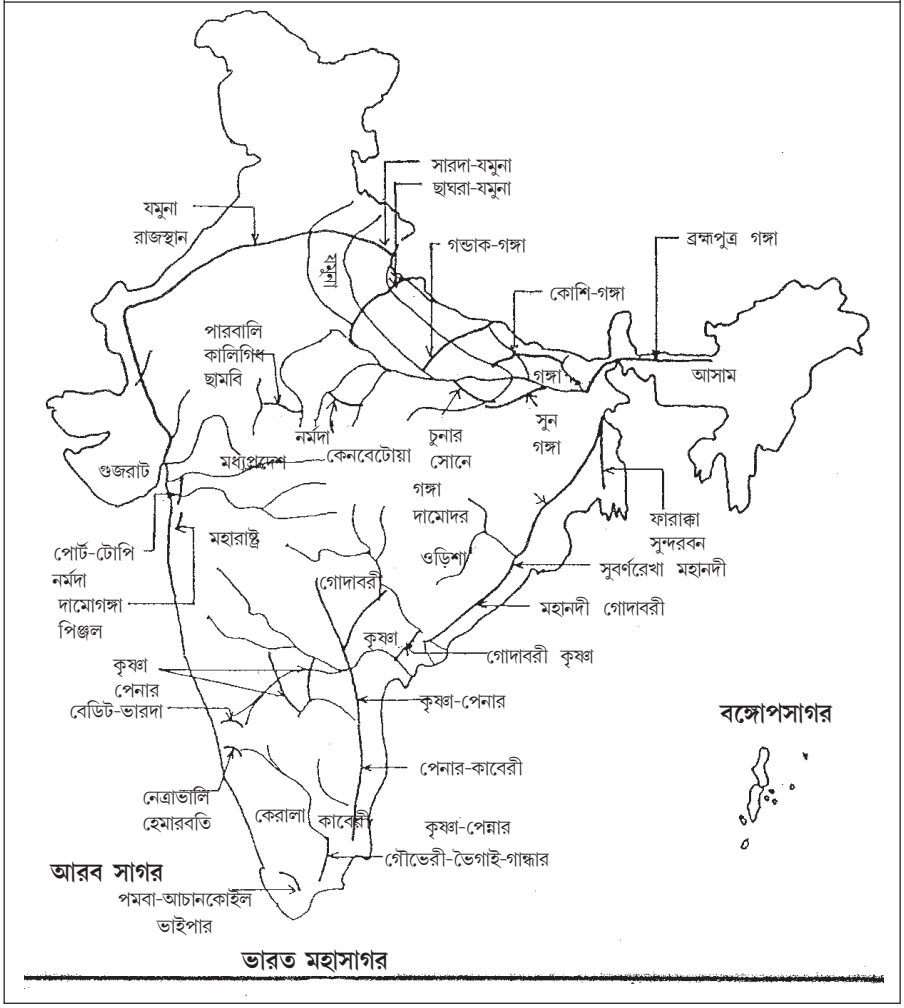

● ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূ-গর্ভস্থ জলের সংযোজক সদ্ব্যবহার।

● খাল এবং জলাশয়ের মাধ্যমে সেচসেবিত এলাকায় ধান বাদে অন্যান্য নিবিড় শস্যচাষে জলসেচক যন্ত্রের দ্বারা চাষ এলাকা সিঞ্চিত করা।

● সেচের সুবন্দোবস্ত রয়েছে এমন এলাকায় তুলো, আখ, কলা, নারকেল, শাকসবজি প্রভৃতি শস্যচাষে ড্রিপ সেচের ব্যবস্থা চালু করা।

● জল ও সার সরবরাহের গতিপ্রকৃতিভিত্তিক সেচ ব্যবস্থা অনুসরণ করা।

● জল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কৃষক ও কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া।

● জল সাশ্রয় ও ফলন বৃদ্ধি সম্পর্কে কৃষকদের অবহিত করার জন্য গ্রামস্তরে আলোচনাসভা ও কর্মশিবির অনুষ্ঠিত করা।

● জল ব্যবহারে বিচক্ষণতার গুরুত্ব সম্পর্কে গ্রামস্তরে কৃষকদের হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া ও কর্মশিবির পরিচালনা করা।

● কৃষি-অর্থনীতি, উদ্ভিদ-গাছপালা রক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে ব্লকস্তরে যেরকম সম্প্রসারণ আধিকারিক রয়েছে তেমনই জল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কেও দায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকারিক থাকা দরকার।

আসল কথা হল যদি বৃষ্টির জলের সদ্ব্যবহার, সংরক্ষণ ও সুপরিচালনা হয় তাহলে দেশে জলাভাবের সমস্যাও দূর হবে।❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক আন্তর্জাতিক জল সংক্রান্ত বিষয়ক পরামর্শদাতা; তামিলনাড়ু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জল প্রযুক্তি কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা অধিকর্তা; এবং তামিলনাড়ু সরকারের রাজ্য যোজনা কমিশনের প্রাক্তন সদস্য। ইমেল : sivanappanrk@hotmail.com)

মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য সুরক্ষা রাষ্ট্রের আশু দায়িত্ব

*একজন মায়ের মৃত্যু শুধু নিছক এক ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যু নয়। এতে করে নবজাতক হারায় তার জীবনের শুরুর দিকের এক অপরিহার্য, অপূরণীয় এবং অতুলনীয় ব্যক্তিত্বকে। যাকে ছাড়া সেই শিশুর জীবন আক্ষরিক অর্থেই অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। সংসার হারায় সংসারের কেন্দ্রকে; ছন্নছাড়া হয়ে যায় কত পরিবার। যার ছাপ পড়ে গোটা সমাজ ব্যবস্থায়—শেষমেশ যার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে রাষ্ট্রের কাঠামো বিন্যাসে। পরিসংখ্যান বলছে, ২০১০ সালে ভারতে মাতৃমৃত্যুর অনুপাত ছিল ২১০ এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় হল মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হারের নিরিখে ভারত বিশ্বের প্রথম পাঁচটি দেশের মধ্যে একটি। ২০১০ থেকে ২০১৬—ছয়টি বছর পেরিয়ে আমরা ছবিটা কতটা পাল্টাতে পেরেছি? প্রশ্নটা উঠছে এই কারণেই যে, এই গত বছরই (২০১৫) ভারত বিশ্বের 'দ্রুততম অর্থনীতি'-র তকমা অর্জন করেছে—সেটা কি মা ও শিশু স্বাস্থ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই দিকটা অবহেলা করেই তথা সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবার গুণামানের সাথে আপোস করে সম্ভব? না কি আমরা স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রের ছবিটা কিছুটা হলেও বদলাতে পেরেছি? বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের সাপেক্ষে তথ্য পরিসংখ্যানের বিচার-বিশ্লেষণ করে বর্তমান নিবন্ধে এই প্রশ্নেরই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন—***ডা. পারভিন বানু***

স্বাধীনতা উত্তর ভারত আজ সপ্ত-অব্দের পথে। দেশকালের হিসাবে ৭০ বছর হয়তো তেমন একটা দীর্ঘ সময় নয়, তবে আবার কমও নয়। চলতি শতকের গোড়ার দিকেই ভারত বাজার অর্থনীতির অন্যতম শক্তি হিসাবে পরিচিতি পেতে শুরু করে। আর ২০১৫ সাল নাগাদ তো দারিদ্র্য-সীমার নিম্নরেখা ঘুচিয়ে বিশ্ব অর্থনীতিতে 'দ্রুততম' (Fastest growing economy)-এর তকমা অর্জন করে। এ প্রসঙ্গের অবতারণা এই কারণেই যে, এই উন্নতির কারণ, "নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান"-এর দেশ ভারত একরৈখিকভাবে মনোনিবেশ করেছে "মানবজমিন" চাষে। কথায় আছে "যদি পরিকল্পনা এক বছরের হয়, তবে ফুলের চাষ কর। যদি ১০ বছরের হয়, তবে বৃক্ষচাষ কর; আর যদি তা আবহমানের জন্য, তবে কর মানবসম্পদ চাষ (Cultivate human)"। বলাই বাহুল্য, দেশ-কাল-জাতিভেদে 'মা ও শিশু'-র স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখাটা এই মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রাক্‌শর্ত তথা অন্যতম প্রধান শর্ত।

প্রসূতি মৃত্য হার (Maternal Mortality Rate—MMR) এবং শিশুমৃত্যুর হার (Infant Mortality Rate)—এই সূচক দু'টি যে কোনও দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। শুধু তাই নয়, এই হার (rate) দু'টি সংশ্লিষ্ট সেই বিশেষ দেশ/অঞ্চল/জাতির স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রের গুণমানও সূচিত করে। নিছক মাতৃ/প্রসূতি মৃত্যুর হার-ই যে কোনও দু'টি দেশের, এমনকী একই দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে গুণগত তফাৎ নির্ণয় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্য কোনও ওজর দেখিয়ে যাকে অবহেলা করার কোনও সুযোগ নেই।

"গোটা ভারতেই বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে মাতৃমৃত্যু এবং শিশুমৃত্যুর হার যথেষ্ট কমেছে। ভারতের-ই এক রাজ্য কেরালায় তো এই হার এমনকী যে কোনও আন্তর্জাতিক মাপকাঠিতেও প্রশংসার দাবি রাখে। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গও কিন্তু এই নিরিখে খুব পিছিয়ে নেই।"

এখানে দেখে নেওয়া যাক, মাতৃ/প্রসূতি মৃত্যুর হার বলতে ঠিক কী বোঝানো হয়। সহজ কথায়, এই MMR বা মাতৃমৃত্যুর হার হল, প্রতি এক লক্ষ জীবিতাবস্থায় শিশু জন্মের সাপেক্ষে মাতৃ/প্রসূতি মৃত্যুর সংখ্যা।

এখন দেখে নেওয়া যাক, একজন মহিলার মৃত্যু কোন সময়ে হলে আমরা তাকে মাতৃ মৃত্যুর ঘটনা বলে চিহ্নিত করব? ঠিক গর্ভধারণের সময় থেকে শিশুর জন্ম দেওয়ার ৪২ দিনের মধ্যে (গর্ভধারণকাল যত দিনেরই হোক) যদি মায়ের মৃত্যু হয়—তবেই তা মাতৃ/প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনা বলে স্বীকৃত হবে। প্রসঙ্গত, এই মৃত্যুর কারণ গর্ভাবস্থাও হতে পারে, বা এমন কোনও রোগ গর্ভধারণের জন্য যার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, দুর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত্যু হলে তা এই হিসাবের বাইরে।

গোটা ভারতেই বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে মাতৃমৃত্যু এবং শিশুমৃত্যুর হার যথেষ্ট কমেছে। ভারতের-ই এক রাজ্য কেরালায় তো এই হার এমনকী যে কোনও আন্তর্জাতিক মাপকাঠিতেও প্রশংসার দাবি রাখে। আমাদের

রাজ্য পশ্চিমবঙ্গও কিন্তু এই নিরিখে খুব পিছিয়ে নেই। উন্নতির কারণগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

(ক) স্বাস্থ্য পরিষেবার বিকাশ;

(খ) প্রশাসনিক স্তরে পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং

(গ) প্রান্তিক স্তরে লব্ধ উন্নতি।

স্বাস্থ্য পরিষেবার বিকাশ

বিগত কয়েক বছরে গর্ভবতী মা ও নবজাত শিশুর স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে সারা ভারতের সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গেও গুণগত মানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে। সরকারি স্তরে স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নে কতটা উদ্যোগী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে— তার খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে দু'-একটি তথ্য থেকেই। প্রথম তথ্যটি হল, ২০১৩-১৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প, "জননী সুরক্ষা যোজনা" (JSY)-র আওতায় উপকৃত মায়েদের সংখ্যাটি হল (শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই) দু' লক্ষ আশি হাজার ছয়শো আটত্রিশ। এবং দ্বিতীয় তথ্যটি হল—তিনটি পর্যায়ে 'মিশন ইন্দ্রধণুষ' কর্মসূচি রূপায়ণের পর (এ রাজ্যের এগারোটি জেলায়) টিকাকরণ সম্পূর্ণ সম্পন্ন হয়েছে এমন শিশুর হার ৯৫ শতাংশ। যেখানে কেন্দ্রের তরফে মিশন নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল—৯০ শতাংশ।

স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের ছবিটা যে দিন দিন উজ্জ্বল হচ্ছে, তার খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যায় জাতীয় স্তরের সঙ্গে তুলনাতেও।

● শিশুমৃত্যুর জাতীয় হার যেখানে ৪২, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে এই হার ৩২; এবং সর্বভারতীয় নিরিখে রাজ্য পঞ্চম স্থানে রয়েছে (২০১২-১৩ সালের হিসাবে)।

● নবজাত শিশুদের ক্ষেত্রে মৃত্যুহার (Neonatal Mortality Rate) সর্বভারতীয় স্তরে যেখানে ২৯; এ রাজ্যে সেখানে ২২। এখানেও পঞ্চম স্থানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ।

● মাতৃমৃত্যুর হারের নিরিখে ২০১০-১২ সাল, এই দু' বছরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যাটা ১১৭, যেখানে সর্বভারতীয় হার ছিল ১৭৮। এবং এক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গ ছিল পঞ্চম স্থানে। তবে, ২০১১-১৩ সালে, এই দু' বছরের পরিসংখ্যান বলছে, রাজ্যে মাতৃমৃত্যুর হার ১১৩; পক্ষান্তরে, সর্বভারতীয় হার ১৬৭— রাজ্যের স্থান ষষ্ঠ।

জাতীয় স্তরের সাথে তুলনার পর, নজরটা আবার রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রের দিকে ফেরানো যাক। ২০১৩-১৪ সালে 'Health on March'-এ প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী বলা যেতে পারে, রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে পরিকাঠামোর নিরিখে আমরা অনেকটা এগিয়ে। উদাহরণ দেওয়া যাক।

"প্রথম তথ্যটি হল, ২০১৩-১৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প, "জননী সুরক্ষা যোজনা" (JSY)-র আওতায় উপকৃত মায়েদের সংখ্যাটি হল (শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই) দু' লক্ষ আশি হাজার ছয়শো আটত্রিশ। এবং দ্বিতীয় তথ্যটি হল—তিনটি পর্যায়ে 'মিশন ইন্দ্রধণুষ' কর্মসূচি রূপায়ণের পর (এ রাজ্যের এগারোটি জেলায়) টিকাকরণ সম্পূর্ণ সম্পন্ন হয়েছে এমন শিশুর হার ৯৫ শতাংশ। যেখানে কেন্দ্রের তরফে মিশন নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল—৯০ শতাংশ।"

● রাজ্যে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা : ৫০১

● প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংখ্যা : ২২৮

● ব্লক প্রাইমারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং গ্রামীণ হাসপাতালের সংখ্যা : ৩৬৬

● মহকুমা হাসপাতালের সংখ্যা : ৪৩

● জেলা হাসপাতালের সংখ্যা : ১৯

● রাজ্যে মেডিকেল কলেজ-এর সংখ্যা (৩১.১২.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত) : ১৩

● রাজ্যের ৮৪.৭ শতাংশ গ্রামে 'আশা' (ASHA) কর্মী আছেন।

● ৯১ শতাংশ গ্রামে ৩ কিলোমিটারের মধ্যে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে।

● ৯৯.৪ শতাংশ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ANM (Auxiliary Nurse Midwife) কর্মী আছেন।

● ৯৬.২ শতাংশ CHC-তে সপ্তাহের সাত দিন চব্বিশ ঘণ্টা স্বাভাবিক প্রসব পরিষেবা দানের ব্যবস্থা রয়েছে।

● নবজাতকের স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্যও আলাদা পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। ৩১.৩.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত হিসাবে, রাজ্যে অসুস্থ নবজাতক পরিচর্যা কেন্দ্র (SNCU)-এর সংখ্যা হল ৩৭ এবং অসুস্থ নবজাতক স্থিতিস্থাপন কেন্দ্রের (SNSU) সংখ্যা হল ১৯৮।

উল্লিখিত স্বাস্থ্য পরিষেবা পরিকাঠামোর হতে ধরে এ রাজ্যে মায়েদের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অনেকটাই উন্নতি প্রত্যক্ষ করা গেছে। ২০.৯.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত এই সংক্রান্ত তথ্যাদি এখানে তুলে ধরা হল। এই পরিসংখ্যানের মাধ্যমে উন্নতির ছবিটা স্পষ্ট হবে।

●প্রাক্‌প্রসব স্বাস্থ্য পরিষেবার আওতায় আনা গেছে ১১৬ শতাংশ প্রসূতিকে।

●গর্ভসঞ্চারের প্রথম তিন মাসের মধ্যে নাম নথিভুক্তির সংখ্যা ৬৯ শতাংশ।

●গর্ভসঞ্চার থেকে প্রাক্‌প্রসব সময়পর্বের মধ্যে ন্যূনতম তিনবার পরীক্ষা (check-up) করিয়েছেন, এমন মায়েদের সংখ্যা ৭৭ শতাংশ।

●প্রাক্‌প্রসব সময়পর্বে প্রয়োজনীয় সব টিকা নিয়েছেন এমন প্রসূতির সংখ্যা ৭৯ শতাংশ।

● গর্ভকালীন পরিষেবা প্রাপ্ত মহিলাদের মধ্যে যতজন আয়রণ ফলিক অ্যাসিড বড়ি পেয়েছেন, তাদের সংখ্যা ৭৩ শতাংশ।

● প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের সংখ্যা ৭৮ শতাংশ।

● কম ওজনের শিশু (LBW baby) ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংখ্যা ১৬ শতাংশ।

● মৃতাবস্থায় ভূমিষ্ঠ শিশুর সংখ্যা ১.৬ শতাংশ।

এ'ত গেল প্রাতিষ্ঠানিক পরিষেবা ক্ষেত্রের হিসাব কিতাব। এর পাশাপাশি মা-শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে, আরও বেশকিছু উদ্যোগ ইতোমধ্যেই ব্যাপক আকারে

হাতে নেওয়া হয়েছে। যেমন—পরিবার-কল্যাণ পরিষেবা ক্ষেত্রে সুলভ গর্ভ নিরোধক ব্যবস্থাদি আমজনতার নাগালে পৌঁছে দিতে যাবতীয় চেষ্টা চালানো হচ্ছে। প্রয়োজন বিশেষে উন্নত মানের তথা অনায়াস গর্ভপাতের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলেও স্বাস্থ্য কেন্দ্র/হাসপাতালগুলিতে রয়েছে উন্নত অবেদনকারি (অ্যানাস্থেসিয়া) ব্যবস্থা। ব্লাড ব্যাংক তৈরি করে প্রয়োজনীয় রক্তের চটজলদি সরবরাহ সুনিশ্চিত করা হয়েছে। এই দু'টি উদ্যোগের ফলে গ্রামাঞ্চলেও প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের ক্ষেত্রে 'সিজারিয়ান ডেলিভারি' অনায়াস হয়ে উঠেছে। উপকৃত হচ্ছেন আমজনতা। এছাড়াও 'Secondary' ও 'Tertiary' মানের হাসপাতাগুলিতে সংকটকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা (Critical Care) পরিষেবার সুযোগ বাড়ানো গেছে। পাশাপাশি, সকল শ্রেণির স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে কাজের প্রতি দায়িত্বশীলতা এবং দায়বদ্ধতাও যথেষ্ট বেড়েছে। যদিও শেষোক্ত দাবিটি তর্কসাপেক্ষ। যাই হোক, মোটের উপর রাজ্যে বিগত কয়েক বছরে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে যে আরও সুষ্ঠু এবং সুসংবদ্ধ করে তোলা গেছে তা নিয়ে বিশেষ তর্কের অবকাশ নেই।

প্রশাসনিক স্তরে পদক্ষেপ গ্রহণ

স্বাস্থ্য পরিষেভার বিকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক হল প্রশাসন। জনমুখী সরকার, তা সে কেন্দ্রে বা রাজ্যে, যেখানেই ক্ষমতাসীন থাকুক না কেন, চালু প্রকল্পগুলির সুষ্ঠু রূপায়ণ সম্ভবপর হত না কখনই, যদি না দক্ষ প্রশাসন থাকত।

নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও নজরদারি, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে অডিট করা এবং অডিট-এর ফলাফল অনুযায়ী চলতি ব্যবস্থাপনায় সার্বিক/সাময়িক রদবদল ঘটানো এবং সর্বোপরি সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি এবং সচিবালয়ের সর্বস্তরের কর্মীদের মধ্যে সহজে সুষ্ঠু যোগাযোগ ও সমন্বয়সাধনই হল স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে উন্নতির মূল সোপান। এর মধ্যে কোনও এক বা একাধিক স্তরে ত্রুটিবিচ্যুতির অবকাশ ঘটলে তার বিরূপ ফল সার্বিক ব্যবস্থাকেই প্রভাবিত করবে। যার প্রতিফলন ঘটবে নিম্ন মানের পরিষেবায়।

প্রান্তিক স্তরে লব্ধ উন্নতি

প্রথমেই বলতে হয় "স্বাস্থ্য ভিক্ষার দান নয়, এ মানুষের অধিকার"। বাক্যটি আজ আর শুধু 'আপ্তবাক্য' হিসাবে নেই। স্বাস্থ্যের অধিকার বিষয়ে সচেতনতা আজ দূরতম গ্রামেও অনুভূত হয়। আর তা সরকারের তরফে ব্যাপক প্রচার ও বিবিধ উদ্যোগ

"পরিবার-কল্যাণ পরিষেবা ক্ষেত্রে সুলভ গর্ভ নিরোধক ব্যবস্থাদি আমজনতার নাগালে পৌঁছে দিতে যাবতীয় চেষ্টা চালানো হচ্ছে। প্রয়োজন বিশেষে উন্নত মানের তথা অনায়াস গর্ভপাতের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলেও স্বাস্থ্য কেন্দ্র/হাসপাতালগুলিতে রয়েছে উন্নত অবেদনকারি (অ্যানাস্থেসিয়া) ব্যবস্থা। ব্লাড ব্যাংক তৈরি করে প্রয়োজনীয় রক্তের চটজলদি সরবরাহ সুনিশ্চিত করা হয়েছে।"

গ্রহণের কল্যাণেই। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিসংখ্যান আগেই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আরও কয়েকটি বিষয় এখানে উল্লেখের দাবি রাখে।

প্রথমত, সমাজ সচেতনতা। আজকের দিনে সরকারি, বেসরকারি, ব্যক্তিবিশেষের উদ্যোগে নানাবিধ সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়ে থাকে প্রায়শই। যা মানুষের মনের উপর ছাপ ফেলে, দৃষ্টিকে করে প্রসারিত।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক প্রসারও কিন্তু প্রকারান্তরে উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বা আরও বিশদে বলতে গেলে উন্নত সমাজ ব্যবস্থার দাবি রাখে। তাই তো গোয়ালঘরের পাশে স্থান পাওয়া আঁতুরঘর থেকে অনেকটা পথ পেরিয়ে আজ আমরা গ্রামেও প্রসূতি মা ও নবজাত শিশুকে দেখতে পাই, বা অন্তত দেখতে চাই প্রাতিষ্ঠানিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে।

তৃতীয়ত, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। তা সে প্রসূতি/মা/নবজাতক-কে বাড়ি থেকে হাসপাতালে, বা এক হাসপাতাল থেকে আরও উন্নত পরিষেবা দিতে পারে এমন হাসপাতাল, যেখানেই নিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন উঠুক না কেন—উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থায় গুরুত্ব অসীম। কারণ, এসব ক্ষেত্রে সময়টা একটা বড় ফ্যাক্টর। যত উন্নত পরিষেবাই দেওয়া হোক না কেন, সঠিক সময়ে না দেওয়া গেলে—তা অর্থহীন হয়ে দাঁড়াতে পারে। কাজেই সার্বিকভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে বা উল্টো করে বললে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাসিন্দাদের কাছে পৌঁছে যেতে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা নিয়ে থাকে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। একে অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই।

চতুর্থত, আরেকটা বিষয়ের উল্লেখ না করলে সম্ভবত এই লেখাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। দূর-দূরান্তের গ্রামে, যেখানে সড়ক ও যান-যোগাযোগের হাল বেহাল বা নেই বললেই চলে, সেখানেও কিন্তু সদাসতর্ক রয়েছে ICDS, ASHA এবং সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অন্যান্য কর্মীরা। এ বড় আশার কথা, ভরসার কথা।

পঞ্চমত, বর্তমান রাজ্য সরকারের ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান (Fair Price Shop)-এর ধারণাটিও কিন্তু সার্বিকভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবায় এক অনন্যমাত্রা যোগ করেছে। এস এস কে এম হাসাপাতাল রাজ্যের একমাত্র সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। সেখানকার একটি ছোট্ট হিসাব তুলে ধরে বিষয়টি বোঝানো যাক। এই হাসপাতালে একটি বেসরকারি সংস্থা তাদের ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানে সমস্ত রকম ওষুধে ৬৭.২৫ শতাংশ ছাড় দেয়। ডিসেম্বর, ২০১২-নভেম্বর, ২০১৪, অর্থাৎ ২৪ মাসের হিসাব বলছে মোট বিক্রিত ওষুধের বাজার দর ৫২১.২২ কোটি টাকা। রোগীরা পেয়েছেন ৩০২.৫৭ কোটি টাকা। উপকৃত রোগীর সংখ্যা ১.১৬ কোটি।

মা ও শিশু ট্র্যাকিং ব্যবস্থা (MCTS)

একজন মায়ের মৃত্যু শুধু নিছক এক ব্যক্তি বিশেষের মৃতু নয়। এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় নবজাতক এবং জীবনের শুরুর দিকের এক অপরিহার্য, অপূরণীয় এবং অতুলনীয় ব্যক্তিত্বকে হারায়, যাকে ছাড়া সেই শিশুটির জীবন বাস্তবিকই অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। সংসার হারায় তার কেন্দ্রকে, ছন্নছাড়া হয়ে যায় গোটা পরিবার। এর ছাপ পড়ে সমাজে, যার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে একটি রাষ্ট্রের কাঠামো বিন্যাসে। গবেষণা বলছে, খুব ছোট্ট এবং সহজ কিছু পদক্ষেপই অনেকাংশে এই চিত্রকে পাল্টে দিতে পারে। ২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে চালু করা এই একটি নাম সম্বলিত ট্র্যাকিং ব্যবস্থা (একটি ওয়েবভিত্তিক পোর্টাল) এরকমই একটি পদক্ষেপ। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিটি গর্ভবতী মা এবং শিশুকে (তার জন্ম থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত) অনুসরণ করা হয়—যাতে করে প্রতিটি মা এবং শিশুকে প্রাক্‌প্রসব, প্রসবকালীন এবং প্রসবপরবর্তী সময়পর্বে প্রয়োজনীয় সমস্ত সাহায্য ও পরিষেবা প্রদান করা সম্ভবপর হয় তথা শিশুর পূর্ণ টিকাকরণ করা যায়। জাতীয় ই-প্রশাসন পরিকল্পনা (NeGP)-র আওতায় জুলাই, ২০১১ সালে MCTS-কে একটি মিশন মোড প্রকল্প হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

অন্যান্য পদক্ষেপ

চলতি শতকে ভারত সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য মা ও শিশুর সার্বিক কল্যাণ। দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় একটি সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট সূচি—RMNCH + A তৈরি করা হয়েছে। এটি পূর্বতন RCH-এর উন্নতর সংস্করণ। এই RMNCH + A সূচিটি চালু করা হয় ২০১৩ সালে। এর পুরো কথাটি হল—Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health। কর্মসূচির নামের মধ্যেই এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট। প্রজননগত, মাতৃত্বকালীন, নবজাতক, শিশু এবং বয়ঃসন্ধি—এই সব ক'টি পর্যায়ে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ ঘটিয়ে সার্বিকভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতিসাধন।

"Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health। কর্মসূচির নামের মধ্যেই এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট। প্রজননগত, মাতৃত্বকালীন, নবজাতক, শিশু এবং বয়ঃসন্ধি—এই সব ক'টি পর্যায়ে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ ঘটিয়ে সার্বিকভাবে, স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতিসাধন।"

এ ধরনের একটি কর্মসূচি চালু করার পেছনে কারণ খুঁজতে গেলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে আরও কয়েকটি বছর। ২০১০ সাল। পরিসংখ্যান বলছে তখন ভারতে মাতৃমৃত্যুর হার ছিল ২১০। অর্থাৎ জীবিতাবস্থায় এক লক্ষ শিশুর জন্মপিছু মারা যাচ্ছেন ২১০ জন মা এবং দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হল ভারত এখনও মাতৃ ও শিশুমৃত্যু হারের নিরিখে বিশ্বের প্রথম পাঁচটি দেশের মধ্যে একটি। ২০১০ সালের পর আমরা এগিয়ে গেছি আরও ছয়টি বছর। এরই মধ্যে ঘোষিত হয়েছে দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (২০১২-১৮ সাল) লক্ষ্যসমূহ পরিকল্পনায় স্থান পেয়েছে স্বাস্থ্যক্ষেত্রের কিছু নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাও। এগুলি হল :

- ২০১৭ সালের মধ্যে শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে করতে হবে ২৫/৬০০০-এ;
- ২০১৭ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যুর হার নামিয়ে আনতে হবে ১০০/১,০০,০০০-এ;
- মোট উর্বরতা কমিয়ে আনতে হবে ২.১-ও, ২০১৭ সালের মধ্যে।

তবে পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তার রূপায়ণই শেষ কথা নয়। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে কী ধরনের অসুবিধা হচ্ছে এবং বা হতে পারে—সে বিষয়েও। ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে 'Tanahashi Framework' ব্যবহার করে এক 'Bottleneck analysis' করা হয়েছিল। এতে মূলত পাঁচটি প্রসঙ্গ উঠে আসে। এগুলি হল :

- Availability বা সহজ প্রাপ্যতা
- Geographical Access বা ভৌগোলিক সীমা নির্বিশেষে সহজলভ্যতা
- Utilization বা সদ্ব্যবহার
- Adequate Coverage বা পর্যাপ্ত পরিষেবার সুযোগদান
- Effective Coverage বা কার্যকরী পরিষেবার সুযোগ প্রদান।

শুধু পরিকল্পনা, শুধু প্রশাসনিক উদ্যোগ শুধু রূপায়ণ—এভাবে খণ্ডে খণ্ডে নয়, সামগ্রিক সুফল আমরা প্রতিটি ভারতবাসী সেদিনই পাব, যেদিন আমরা আরও একটু সংবেদনশীল, সহমর্মী ও সচেতন হব। সব মানুষই তার প্রাপ্য অধিকার ও সম্মান পাবেন—তা তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান যাই হোক না কেন।❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক কলকাতার ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ-এ সহকারী অধ্যাপক। ইমেল : parvin_dear@yahoo.co.in)

নীতি আয়োগ : সময়ের দাবি

নীতি আয়োগের পূর্বসুরী হল পরিকল্পনা কমিশন। স্বাধীনতার পরপরই এদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল দারিদ্র্যের প্রখর অভিঘাত হ্রাস করে দেশের নড়বড়ে পরিকাঠামো ব্যবস্থার বিকাশ ঘটিয়ে স্বনির্ভর শিল্পোন্নয়নের একটা মঞ্চ তৈরি করে দেওয়া। পরিকল্পনা কমিশন অংশত সফলও হয় সে কাজে। কিন্তু গত শতকের নব্বইয়ের দশকের প্রথম দিকে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত কাঠামোর পরিবর্তে একটু একটু করে বাজার নিয়ন্ত্রিত অর্থব্যবস্থার দিকে ঝুঁকতে থাকে ভারত। এর ফলস্বরূপ প্রয়োজন ফুরাতে থাকে পরিকল্পনা কমিশনের। বাজার অর্থনীতির হাত ধরেই ভারতীয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এমন কিছু পরিবর্তনের সূচনা হয় যে প্রশ্ন উঠে যায় পরিকল্পনা কমিশনের প্রয়োজনীয়তা নিয়েই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষাপট পাল্টায়, পাল্টায় সময়ের দাবি। বলা হচ্ছে, পরিকল্পনা কমিশনের পরিবর্তে নীতি আয়োগের প্রতিষ্ঠা সময়ের এই দাবি মেনেই।
লিখেছেন—**অনিন্দ্য ভুক্ত**

জন্ম : জানুয়ারি ১, ২০১৫। জন্মস্থান : নয়াদিল্লি। নাম, নীতি। নীতি আয়োগ। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া। ইংরেজি শব্দগুলির আদ্যাক্ষর নিয়ে সংক্ষেপে 'নীতি'।

জন্মদাতার নাম নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, যাঁর সরকার ২০১৫ সালের প্রথম দিনটিতেই জানিয়ে দিয়েছিল, 'মেয়ে হয়েছে. নাম নীতি।'

একের অবলুপ্তিতে অন্যের উত্থান। সুতরাং অবলুপ্তির কারণের মধ্যেই লুকিয়ে আছে উত্থানের কারণও। আলোচনার শুরুতে আমরা অতএব জেনে নেব নীতির পূর্বসুরীর ঠিকুজি-কুষ্ঠি, জেনে নেব তাকে অবলুপ্ত করার প্রয়োজন কেন হল?

(এক)

নীতির পূর্বসুরীর নাম পরিকল্পনা কমিশন, ১৯৫০ সালে যার জন্ম। যারা এ দেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটু-আধটু খোঁজখবর রাখেন, তারা সংস্থার নাম দেখেই বুঝতে পারছেন এমন একটি সংস্থার উদ্দেশ্য বা কাজ কী হতে পারে। বস্তুত প্রায় দুশো বছরের পরাধীন একটি রাষ্ট্রকে এ দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যখন ইংরেজদের হাত থেকে উত্তরাধিকার হিসেবে গ্রহণ করলেন তখন সেই মৃতপ্রায় রাষ্ট্রের পুনরুজ্জীবন তাদের কাছে ছিল প্রায় একটি চ্যালেঞ্জের মত। চ্যালেঞ্জ এই যে, একদিকে সীমাহীন দারিদ্র্য, ভাঙাচোরা একটি আর্থনীতিক কাঠামো আর অন্যদিকে তার স্বাস্থ্য ফিরিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের নিদারুণ অভাব। সীমিত সামর্থ্যকে গুছিয়ে ব্যবহার করাই ছিল তাই সেই সময়, 'সময়ের দাবি'। এই দাবি মেটাতেই জওহরলাল নেহরুর মানস সংস্থাটির জন্ম, ১৯৫০ সালের ১৫ মার্চ। কাজ বলতে মূলত দু'টি। একদিকে দারিদ্র্যের প্রখর অভিঘাতের হ্রাস, অন্যদিকে দেশের পরিকাঠামোকে উন্নত করে স্বনির্ভর শিল্পবিকাশের একটি মঞ্চ তৈরি করে দেওয়া। আর চ্যালেঞ্জ বলতে একটি, স্বল্প পুঁজি-সামর্থ্যকে পরিকল্পনামাফিক ব্যবহার করা। পটভূমি বিচার করলে পরিকল্পনা কমিশনের মত একটি সংস্থা স্থাপন তাই ছিল 'সময়ের দাবি'।

আর যদি তাই হয়, তাহলে এমন একটি সংস্থাকে অবলুপ্তির পথে পাঠানোর অর্থ সময়ের সেই দাবি ফুরিয়েছে। কিন্তু ঘটনা সত্যিই কি তাই? প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আরও একবার পিছনে ফিরে তাকাতে হবে। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট পরবর্তী যে চ্যালেঞ্জের কথা আমরা বলছিলাম, সেই চ্যালেঞ্জ সামলাতে দরকার ছিল কড়া হাতে অর্থনীতির যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করা। নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন ছিল, না হলে অর্থনীতিকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনামাফিক এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেত না। নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন ছিল আরও একটি কারণে। দীর্ঘ প্রায় দুশো বছরের শাসনে ইংরেজরা যে ঔপনিবেশিক আর্থনীতিক কাঠামো গড়ে তুলেছিল, সেই কাঠামোটিকে ভেঙে ফেলা। কাঠামোটিকে ভেঙে ফেলার প্রয়োজন ছিল; কারণ এই কাঠামো ভারতকে একটি কাঁচামাল রপ্তানিকারী এবং উৎপাদিত পণ্য আমদানিকারী দেশ হিসেবে গড়ে তুলেছিল। এই কাঠামো ভারতের স্বনির্ভরতার অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছিল। এইসব প্রয়োজনীয়তা থেকেই স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতকে একটি রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত অর্থব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল।

রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত অর্থব্যবস্থার এই কাঠামোটিকে বিসর্জন দেওয়া শুরু করা হয় ১৯৯১ সাল থেকে। করা হয়, কারণ ততদিনে সময়ের দাবি পাল্টেছে। এ কথার অর্থ এই নয় যে, ভারত ততদিনে দারিদ্র্যের সমস্যাটির সমাধান করে ফেলেছে বা একটি স্বনির্ভর আর্থনীতিক কাঠামো গড়ে তুলেছে। সময়ের দাবি পাল্টে যাবার কারণ নতুন সময়ে, নতুন পরিস্থিতিতে, পরিস্থিতির চাপে ভারত একপ্রকার বাধ্য হয়েছে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত কাঠামোটির পরিবর্তে একটি বাজার-নিয়ন্ত্রিত

অর্থব্যবস্থার দিকে ঝুঁকতে। কেন বাধ্য হয়েছে, কী বৃত্তান্ত—সে কথা এখানে বাহুল্যমাত্র। তবে একটি রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত অর্থব্যবস্থা বাজার-অর্থনীতির দিকে ঝুঁকলে তার প্রয়োজনগুলি যে পাল্টে যাবে তা বলাবাহুল্য।

এবং এই পরিবর্তিত প্রয়োজনের কারণেই ২০১৪ সালে লালকেল্লা থেকে স্বাধীনতা-ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পরিকল্পনা কমিশনের মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে দেন। ঘোষণা কার্যকর করা হয় পরবর্তী বছরের প্রথম দিনটি থেকে। তবে কেবলমাত্র ১৯৯১ সালের নয়া আর্থনীতিক নীতি যে বাজার-নিয়ন্ত্রিত অর্থকাঠামোর প্রবর্তন করেছিল, তার প্রয়োজন পূরণের জন্যই পরিকল্পনা কমিশনের অবলুপ্তি, সে কথা বললেও সত্যের অপলাপ হবে।

নতুন শতকে পরিকল্পনা কমিশনের অবলুপ্তি এবং অন্য একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভূত হতে শুরু করে অন্তত আরও দু'টি কারণে। উনিশশো আশির দশকের শেষ দিক থেকে এ দেশে শুরু হয় কোয়ালিশন বা জোট সরকারের যুগ। ছোটো ছোটো আঞ্চলিক দলগুলি কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। এইসব আঞ্চলিক দলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ মূলত একটি, কখনও কখনও বড়জোর দু'টি, রাজ্যে। ফলে দিল্লির রাজনীতিতে জায়গা করে নেওয়ার সুযোগ পেয়ে এরা নিজের রাজ্যের জন্য যথাসম্ভব বেশি আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধে আদায়ে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। কিন্তু বিভিন্ন রাজ্যে আর্থিক বরাদ্দের দিকটি তো মূলত দেখভাল করতো পরিকল্পনা কমিশন, নির্দিষ্ট সূত্র মেনে। ফলে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে পরিকল্পনা কমিশনের কাছ থেকে বাড়তি বরাদ্দ আদায় কষ্টকর হয়ে পড়ছিল।

রাজ্যগুলি কেন্দ্রের কাছ থেকে মোটামুটিভাবে তিন ধরনের অর্থসাহায্য পেয়ে থাকে। প্রথমত, সারা দেশ থেকে বিভিন্ন কর বাবদ যে রাজস্ব আদায় হয় তার একটা ভাগ কেন্দ্র রাজ্যগুলিকে দেয়। কোন রাজ্য কতটা কী ভাগ পাবে সেটা ঠিক করে অর্থ কমিশন। অন্যদিকে, পরিকল্পনা কমিশনের হাতে থাকে দু'ধরনের বরাদ্দ ঠিক করার দায়িত্ব। এক, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে রাজ্যগুলি যে পরিকল্পনা তৈরি করে সেই পরিকল্পনা রূপায়ণবাবদ কিছু সাহায্য কেন্দ্রের তরফে দেওয়া হয়। সাহায্যের পরিমাণ কী হবে সেটা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে ঠিক করে পরিকল্পনা কমিশন। দুই, বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার নানারকম প্রকল্প চালু করে। বর্তমানে যেমন এইরকম কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সংখ্যা প্রায় ৬৬-টি। এই প্রকল্পগুলি পরিচালিত হয় বিভিন্ন মন্ত্রকের মাধ্যমে। এইসব প্রকল্পে কোন রাজ্য কী পরিমাণ অর্থ সাহায্য পাবে সেটিও ঠিক করে পরিকল্পনা কমিশন; কেন্দ্র ও রাজ্যের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক ও দপ্তরগুলির সঙ্গে আলোচনাসাপেক্ষে।

দিল্লিতে কোয়ালিশন বা জোট সরকারের যুগ শুরু হবার পর থেকেই রাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করে। কিন্তু বরাদ্দ বৃদ্ধির অধিকার মূলত যার হাতে, সেই পরিকল্পনা কমিশন এই ব্যাপারে সহজে রাজি না হওয়ায় পরিকল্পনা কমিশনের প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বিভিন্ন মহলে তারা প্রশ্ন তুলতে শুরু করে সেই সময় থেকেই।

পরিকল্পনা কমিশনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল দ্বিতীয় একটি কারণেও। ১৯৫১ সালে কাজ শুরু করার পর থেকে কমিশন নজর দিয়েছিল স্বনির্ভর উন্নয়নের একটি পরিকাঠামো নির্মাণের দিকে। পরিকল্পনা কমিশনের এই উদ্যোগের ফলেই দেশে একটা সময় ভারি শিল্পের বিকাশ ঘটেছে, কৃষিক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লব হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ভরতুকি ও ভাতার চল যত বাড়িয়েছে সরকার, ততই কমেছে পরিকল্পনা ব্যয়ের বহর। আর খরচের টাকা না থাকলে পরিকল্পনা করেই বা লাভ কী?

পরিকল্পনা কমিশনের অবলুপ্তি এবং নীতি আয়োগের প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে এই প্রেক্ষাপটগুলিকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষাপট পাল্টায়, পাল্টায় সময়ের দাবি। বলা হচ্ছে, পরিকল্পনা কমিশনের পরিবর্তে নীতি আয়োগের প্রতিষ্ঠা সময়ের এই দাবি মেনেই।

(দুই)

যে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্তের বলে নীতি আয়োগের প্রতিষ্ঠা, সেই সিদ্ধান্ত আয়োগের উপর মোট তেরোটি কাজের ভার চাপিয়ে দিয়েছিল। সেই কাজের তালিকা অনুধাবন করলে আয়োগের চারটি বৃহত্তর লক্ষ্যের সন্ধান পাওয়া যায় (রাও, ২০১৫)। লক্ষ্যগুলি হল : (১) সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রসার, (২) কৌশলগত পরিকল্পনা রচনা, (৩) উদ্ভাবন ও জ্ঞানের উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা পালন এবং (৪) আন্তঃসরকার ও আন্তঃমন্ত্রক সংহতিসাধন। লক্ষ্যগুলি সম্বন্ধে একটু সবিস্তার আলোচনা করা যাক।

(১) **সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রসার** : ভারতের প্রশাসনিক কাঠামোটি যুক্তরাষ্ট্রীয়। সংবিধানের সপ্তম তপশিল অনুযায়ী আইনগত ও কার্যগত দায়িত্বগুলিকে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে; কিছু কিছু দায়িত্ব যেমন সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রের উপর বা সম্পূর্ণভাবে রাজের উপর ন্যস্ত, তেমনই কিছু কিছু দায়িত্ব যৌথভাবে কেন্দ্র ও রাজ্যের উপর ন্যস্ত। নিয়ম অনুযায়ী যৌথ দায়িত্বের বিষয়গুলিতে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে মত পার্থক্য হলে কেন্দ্রের মতামতটিই গ্রাহ্য ও কার্যকর হবে। এই জায়গাটিকে নিয়ে বিরোধ তো তৈরি হয়ই, এছাড়াও, অনেক সময় কেন্দ্রকে রাজ্যের বিষয়গুলিতে হস্তক্ষেপ করতে হয়, বিরোধ তৈরি হয় তখনও। নীতি আয়োগকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এই বিরোধের জায়গাগুলিকে যথাসম্ভব কমিয়ে এনে একটি সহযোগিতামূলক বাতাবরণ তৈরির দিকে নজর দিতে।

কেন্দ্র-রাজ্যের বিরোধের আরেকটি বড়ো জায়গা কেন্দ্রীয় অনুদানে চলা প্রকল্পগুলি। এই ব্যাপারে পরিকল্পনা কমিশন যে নীতি নিয়ে চলত, তাকে বলা হত 'সব পায়ের জন্য একই মাপের জুতো'-র নীতি। অর্থাৎ রাজ্য যেটিই হোক না কেন, তার প্রয়োজন যেমনই হোক না কেন, বরাদ্দ নির্ধারণের ক্ষেত্রে মাপকাঠিটি হবে এক। সর্বস্তরেই এই নীতিটি দীর্ঘদিন ধরে সমালোচিত হচ্ছিল। এই নীতি বাদ দিয়ে, রাজ্যগুলির বাস্তব

পরিস্থিতি বিবেচনা করে বরাদ্দ নির্ধারণের উপর জোর দেবার কথা বলা হচ্ছে বর্তমানে। এই ব্যাপারটি খতিয়ে দেখার কথা বলা হয়েছে নীতি আয়োগকে। এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গেই আলোচনা করবে নীতি আয়োগ।

(২) **কৌশলগত পরিকল্পনা রচনা :** দীর্ঘদিন ধরে যে পদ্ধতিতে পরিকল্পনা রচনা করা হয়ে এসেছে এ দেশে, সেই পদ্ধতিটিকেই পাল্টে দেবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নীতি আয়োগকে। এতদিন সারা দেশের পরিপ্রেক্ষিতে দামস্তর, কর্মহীনতার পরিমাণ, দারিদ্র্য-হার প্রভৃতি আর্থনীতিক চল সম্বন্ধে তথ্য-পরিসংখ্যান জোগাড় করে একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা তৈরি করা হত। তারপর সেগুলির রূপায়ণ করা হত। এখন বলা হচ্ছে পরিকল্পনা প্রথমে করা হবে গ্রামস্তর থেকে। তারপর ধাপে ধাপে সেটির পরিধি বাড়ানো হবে। ফলে স্থানীয় সমস্যাগুলিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করে উন্নয়নের পরিকল্পনা করা যাবে। এইভাবে পরিকল্পনা কী করে করা যায় তার একটি কাঠামো তৈরি করবে নীতি আয়োগ।

(৩) **উদ্ভাবন ও জ্ঞানের উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা পালন :** যে ধরনের পরিকল্পনা-কৌশল রচনার কথা বলা হচ্ছে তার জন্য যেমন প্রয়োজন বিস্তারিত তথ্য ও পরিসংখ্যান, তেমনই প্রয়োজন নতুন ভাবনা, নতুন প্রযুক্তি। সে জন্য চাই নতুন গবেষণা, চাই তথ্য ও জ্ঞানের পারস্পরিক আদান-প্রদান। নীতি আয়োগকে গড়ে তুলতে হবে এই জ্ঞানভাণ্ডার ও তা আদান-প্রদানের একটি কেন্দ্র হিসাবে।

(৪) **আন্তঃসরকার ও আন্তঃমন্ত্রক সংহিতসাধন :** একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় যে কোনও পরিকল্পনার সফল রূপায়ণের জন্য আন্তঃসরকার সংহতি অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয়। একইরকম জরুরি বিভিন্ন মন্ত্রকের মধ্যে সংহতিও, কেননা যে কোনও প্রকল্পের একাধিক দিক থাকে, যেগুলি একাধিক মন্ত্রকের সঙ্গে যুক্ত। বিভিন্ন সরকার এবং বিভিন্ন মন্ত্রক একযোগে কাজ করলে তবেই যে কোনও পরিকল্পনার সফল রূপায়ণ সম্ভব।

পরিকল্পনা কমিশন ও নীতি আয়োগের গঠন কাঠামোর পার্থক্য

কে	পরিকল্পনা কমিশন	নীতি আয়োগ
চেয়ারম্যান	প্রধানমন্ত্রী	প্রধানমন্ত্রী
ভাইস চেয়ারম্যান	সরকার মনোনীত কোনও ব্যক্তি, সাধারণভাবে একজন অর্থনীতিবিদ	সরকার মনোনীত কোনও ব্যক্তি, সাধারণ-ভাবে একজন অর্থনীতিবিদ
সিইও	আইএএস পদমর্যাদার একজন মেম্বার সেক্রেটারি	সেক্রেটারি পদমর্যাদার কোনও আমলা
পদাধিকারবলে সদস্য	অর্থমন্ত্রী পরিকল্পনা মন্ত্রী	প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত চারজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী
অন্যান্য সদস্য (পূর্ণ সময়ের)	চার থেকে সাতজন	কতজন মোট এখনও পর্যন্ত অনির্ধারিত
অন্যান্য সদস্য (আংশিক সময়ের)	—	সর্বাদিক দুজন, যাদের নির্বাচন করা হবে প্রথম সারির কোনও বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা কেন্দ্র থেকে
আমন্ত্রিত সদস্য	—	তিনজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী—পরিবহণ, মানব-সম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার মন্ত্রক। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী প্রয়োজন হলে অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের ডাকতে পারেন
গভর্নিং কাউন্সিল	—	চেয়ারম্যান : প্রধানমন্ত্রী সদস্য : সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলির লেফটেন্যান্ট গভর্নর
অস্থায়ী রিজিওনাল কাউন্সিল	—	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীবৃন্দ

(তিন)

এমন নয় যে সবাই পরিকল্পনা কমিশনের অবলুপ্তির সপক্ষে ছিলেন। কোনও ব্যাপারেই সাধারণত এমন নিরঙ্কুশ পক্ষ-বিভাজন হয় না। নীতি আয়োগ প্রতিষ্ঠার বিরোধী স্বর তাই ছিলই। নীতি আয়োগের প্রবক্তারা বলেছে পরিকল্পনা কমিশনে রাজ্যের কোনও প্রতিনিধি ছিল না। উত্তরে পরিকল্পনা কমিশনের সমর্থকরা বলেছে, সেজন্য ছিল জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ বা ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল, যেখানে ছিল রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব, যে কাউন্সিলের অনুমোদন ছাড়া কোনও পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য ছাড়পত্র পেত না। নীতি আয়োগের সমর্থকরা বলছে, রাজ্যগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার অধিকারটি প্রায় একাই কুক্ষিগত করে রাখায় পরিকল্পনা কমিশনের ইচ্ছামতই চলতে হত রাজ্যগুলিকে, স্থানীয় প্রয়োজন মাফিক কোনও পরিকল্পনার সুযোগ ছিল সীমিত। নীতি আয়োগ এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করবে।

পরিকল্পনা কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগটি কিছু সত্যি হলেও নীতি আয়োগ সম্বন্ধে যে প্রত্যাশাটি করা হচ্ছে সেটি কতটা সত্যি? কারও কারও মতে, রাজ্যগুলির পক্ষে পরিস্থিতি বরং আরও কঠিন হয়ে উঠবে (পটনায়ক, ২০১৫)। যে ক্ষমতা এতদিন পরিকল্পনা কমিশনের হাতে ছিল, তা চলে গেল কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের হাতে। এর অর্থ দু'টি। এক, কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্যের বিষয়টি এখন আরও বেশি করে রাজনৈতিক হয়ে উঠল। পরিকল্পনা কমিশনের মধ্যে তবু যেটুকু অরাজনৈতিক চরিত্র ছিল তা আর রইল না। এর ফলে সবচেয়ে বেশি অসুবিধায় পড়বে সেই সব রাজ্য—যেখানে কেন্দ্র-বিরোধী দল ক্ষমতাসীন। দুই, পরিকল্পনা কমিশনের কাছ থেকে রাজ্যগুলি আর্থিক সাহায্য পেত পরিকল্পনা খাতের বরাদ্দ হিসেবে, এখন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের কাছ থেকে যেটা পাবে সেটি একেবারেই অনুদান চরিত্রের। পরিকল্পনা খাতের বরাদ্দ যত ন্যূনতমই হোক না কেন তাতে একটা 'অধিকার'-এর ব্যাপার ছিল। অনুদানের মধ্যে সেটি থাকবে না।

নীতি আয়োগ : বর্তমান পদাধিকারী	
পদ	**নাম**
চেয়ারম্যান	নরেন্দ্র মোদী
ভাইস চেয়ারম্যান	অরবিন্দ পানগড়িয়া
পূর্ণ সময়ের সদস্য	অধ্যাপক রমেশ চন্দ্র
	ভি কে সারস্বত
	বিবেক দেবরায়
সিইও	অমিতাভ কান্ত
তথ্যসূত্র : নীতি আয়োগের ওয়েবসাইট	

পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের অবলুপ্তিও রাজ্যগুলির স্বার্থের উপর একটি প্রবল আঘাত হয়ে আসতে চলেছে বলেও অভিমত রয়েছে। জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের আদলেই নীতি আয়োগের পরিচালন পর্ষদ (গভর্নিং কাউন্সিল)-টি গঠন করা হলেও তার আর গুরুত্বই বা কী, শুধু তো নীতি-নির্ধারণ। এই গুরুত্বহীনতা অনুধাবন করেই নীতি আয়োগের বৈঠক নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীদের কোনও আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে আয়োগের পরিচালন পর্ষদের বৈঠকে তিনটি সাব-গ্রুপ তৈরি করা হয়েছিল, যার মাথায় রাখা হয়েছিল একজন করে মুখ্যমন্ত্রীকে। এমনই একটি গ্রুপের এক বৈঠকে হাজির ছিলেন মাত্র দুজন মুখ্যমন্ত্রী (তথ্যসূত্র : আনন্দবাজার পত্রিকা, জুন ১৩, ২০১৫)। এই বৈঠকের আলোচ্য বিষয় ছিল কেন্দ্রীয় অনুদানে চলা প্রকল্পগুলি। কিন্তু যেখানে বরাদ্দ নির্ধারণের অধিকারটিই নেই সেখানে কেবলমাত্র আলোচনায় উৎসাহ না থাকারই কথা।

সব মিলিয়ে, যদি নীতি আয়োগের ঘোষিত লক্ষ্যগুলির প্রেক্ষিতেও বিচার করি, তাহলেও নীতির জন্মগ্রহণে অর্থনীতির কতটা কী লাভ হল, কতটা কী লাভ হবে তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। তবে পাশাপাশি একথাও সত্যি রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত অর্থব্যবস্থার পথ ছেড়ে বাজার-নিয়ন্ত্রিত অর্থব্যবস্থার রাস্তা ধরার পর পরিকল্পনা কমিশনের প্রয়োজন ফুরিয়েছিল। বস্তুত সেই অর্থে পূর্ণ রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত অর্থব্যবস্থা তো ভারতে কোনওদিনই ছিল না। তাই সোভিয়েত রাশিয়ার অনুকরণে গড়ে তোলা পরিবক্ষনা ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীণ সাফল্যের সম্ভাবনা এ দেশে কখনওই ছিল না। হয়ও নি। সরকারি ক্ষেত্রের বাইরে বিপুল বেসরকারি ক্ষেত্রটি কী করবে তা পরিকল্পনাকারদের অজানা ছিল। তারা কেবল অনুমানই করেছেন। সেই অনুমান প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে, পরিকল্পনাও সর্বাঙ্গীণ সাফল্য লাভ করেনি। তাই নীতি আয়োগের প্রতিষ্ঠা নিয় প্রশ্নচিহ্ন থাকলেও তা বিশেষ নেই পরিকল্পনা কমিশনের অবলুপ্তি নিয়ে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিকল্পনা ব্যবস্থার আদলে যেমন তৈরি করা হয়েছিল ভারতের পরিকল্পনা ব্যবস্থাটি, নীতি আয়োগের ধারণাটির পিছনে আছে তেমনই চিনের 'জাতীয় উন্নয়ন ও সংস্কার কমিশন (ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিফর্ম কমিশন বা এনডিআরসি)'। এই কমিশনের উদ্যোগে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের বিকাশ ঘটিয়ে চিন আজ বিশ্বের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাবনাচিন্তার পিছনে যে চিন আছে তা পরিষ্কার হয়ে যায় নীতি আয়োগ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি তাঁর 'মেক ইন ইন্ডিয়া' স্লোগানটির কথা মাথায় রাখলে। কিন্তু এর মধ্যে কি এক ধরনের চিন্তার দৈন্যতা প্রকাশ পাচ্ছে না? —প্রশ্ন উঠছে কোনও কোনও মহল থেকে। ভারতের বর্তমান অগ্রগতির প্রধান চালিকাশক্তি তার পরিষেবা ক্ষেত্রটি। জোর কি সেদিকে দেওয়া যেত না?

প্রশ্ন এমন অনেক আছে। তবে বয়স তো হল সবে দেড়। আগামী দিনে কাজের মধ্যে দিয়েই নীতিকে প্রমাণ করতে হবে ভারতীয় অর্থনীতিতে তার অস্তিত্ব কতটা জরুরি।❑

(**লেখক পরিচিতি** : লেখক আরামবাগ নেতাজি মহাবিদ্যালয়-এর অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক।)

তথ্যসূত্র :

১. পটনায়ক, প্রভাত (২০১৫); ফ্রম দ্য প্ল্যানিং কমিশন টু দ্য নীতি আয়োগ; ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ভল্যুম ৫০, নং ৪

২. রাও, এম. গোবিন্দ (২০১৫); রোল অ্যান্ড ফ্যাংশনস অফ নীতি আয়োগ; ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ভল্যুম ৫০, নং ৪

জল ও সংবিধান

যে কোনও দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হল জল। কৃষি, পশুপালন ও অনাময়ের মত নানা কাজের জন্য যে পরিমাণ জল প্রয়োজন তার বেশিরভাগটাই আসে নদী থেকে। এই সব নদী ভারতের বিভিন্ন রাজ্য দিয়ে বয়ে চলেছে। যাদের অববাহিকা একই রাজ্যের সীমার মধ্যে আবদ্ধ বা যারা উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত একই রাজ্যের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে, তাদের অন্তঃরাজ্য নদী বলা হয়। আর যে সব নদী একাধিক রাজ্যের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে, তাদের আন্তঃরাজ্য নদী বলা হয়। এই আন্তঃরাজ্য নদীগুলি নিয়ে কখনও কখনও রাজ্যগুলি বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। এখানেই কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ও ভূমিকা প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। আন্তঃরাজ্য নদী সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় তথা উল্লিখিত বিবাদ নিষ্পত্তি এর মধ্যে অন্যতম। সংবিধান অনুযায়ী সব জীবের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া এবং বন ও বন্যপ্রাণী, নদী ও জলাশয়-সহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও বিকাশ আমাদেরও মৌলিক কর্তব্য।

রাজ্যের জলসম্পদ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা ভারতীয় সংবিধান সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের উপর ন্যস্ত করেছে। রাজ্য তালিকার ক্রমিক সংখ্যা ১৭ অনুযায়ী অন্য রাজ্যের স্বার্থহানি ও বিবাদ এড়িয়ে এই আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে। তবে যেহেতু আন্তঃরাজ্য নদীর নিয়ন্ত্রণ ও বিকাশের ক্ষেত্রে সংসদেরও এক্তিয়ার রয়েছে, সেহেতু রাজ্য সরকারের জলসম্পদ সংক্রান্ত ক্ষমতা শর্তসাপেক্ষ। তাই এটা বলা ঠিক নয় যে জল পুরোপুরি রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়। বরঞ্চ, এটা কেন্দ্র তথা রাজ্যের আওতাভুক্ত এমন একটা বিষয়, যেখানে সংসদের আধিপত্য রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সংবিধানে জল, আন্তঃরাজ্য জলবণ্টন ও সংশ্লিষ্ট বিবাদ সম্পর্কে নানা বিধান রয়েছে।

রাজ্য তালিকার ক্রমিক সংখ্যা ১৭, কেন্দ্রীয় তালিকার ক্রমিক সংখ্যা ৫৬ ও সংবিধানের ২৬২ নম্বর ধারা জল সংক্রান্ত সাংবিধানিক কাঠামোর ভিত্তি। এগুলি হল :

(ক) সপ্তম তফসিলের দ্বিতীয় (রাজ্য) তালিকার ক্রমিক সংখ্যা ১৭ :

যদিও জল রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয় আর সে জন্যই এটি রাজ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু তা কেন্দ্রীয় তালিকার ক্রমিক সংখ্যা ৫৬-তে উল্লেখিত সংস্থান-সাপেক্ষ।

(খ) প্রথম (কেন্দ্রীয়) তালিকার ক্রমিক সংখ্যা ৫৬ :

আন্তঃরাজ্য নদী ও নদী উপত্যকার নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে সংসদে প্রণীত আইন দ্বারা 'জনস্বার্থে সমীচীন' হিসেবে ঘোষিত নিয়ন্ত্রণ ও বিকাশ সংক্রান্ত বিষয়ের উপর কেন্দ্রের এক্তিয়ার রয়েছে।

সংবিধানের ২৪৮ নম্বর ধারা (অবশিষ্ট বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা) : যুগ্ম তালিকা ও রাজ্য তালিকাবহির্ভূত যে কোনও বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা একমাত্র সংসদের রয়েছে।

সংবিধানের ২৫৪ নম্বর ধারা : সংসদ ও রাজ্য বিধানসভা প্রণীত আইনে অসঙ্গতি : সংসদের এক্তিয়ারভুক্ত বা যুগ্ম তালিকাভুক্ত কোনও বিষয়ে রাজ্য বিধানসভা প্রণীত কোনও আইন যদি সংসদ প্রণীত আইনের বা তার কোনও সংস্থানের পরিপন্থী হয়, তবে উপধারা ২ অনুযায়ী, সংসদ প্রণীত আইনই বহাল থাকবে এবং রাজ্য বিধানসভা প্রণীত আইন বা সংশ্লিষ্ট পরিপন্থী সংস্থান বাতিল হবে (সংসদ প্রণীত আইনটি রাজ্য বিধানসভা প্রণীত আইনের আগে বা পরে প্রণীত হয়েছে তার নির্বিশেষে)।

(গ) সংবিধানের ২৬২ নম্বর ধারা :

(১) সংসদ, আইন অনুযায়ী, আন্তঃরাজ্য নদী ও নদী উপত্যকা বা জলের ব্যবহার, বণ্টন বা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কোনও বিবাদের মীমাংসা করতে পারে।

(২) এই সংবিধান সত্ত্বেও সংসদ, আইন অনুযায়ী, এই বিধান দিতে পারে যে উপধারা ১-এ উল্লেখিত কোনও বিবাদের মীমাংসা ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় (সুপ্রিম কোর্ট) বা অন্য কোনও আদালতের এক্তিয়ার নেই। এ বিষয় অন্যান্য কিছু ধারা বা উপধারার তাৎপর্য থাকতে পারে।

নদী পর্ষদ আইন, ১৯৫৬

নদী পর্ষদ আইন, ১৯৫৬ সালে আন্তঃরাজ্য নদী ও নদী উপত্যকার নিয়ন্ত্রণ ও বিকাশের জন্য নদী পর্ষদ গঠন করার সংস্থান রয়েছে। কোনও রাজ্যের সরকারের অনুরোধে বা অন্য কোনও কারণে, কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকে আন্তঃরাজ্য নদী ও নদী উপত্যকার (বা তার অংশবিশেষ) নিয়ন্ত্রণ ও বিকাশ সংক্রান্ত বিষয়ে "পরামর্শ দেওয়ার জন্য" পর্ষদ গঠন করতে পারে। প্রত্যেকটি আন্তঃরাজ্য নদী বা নদী উপত্যকার জন্য আলাদা পর্ষদ গঠন করা যেতে পারে। কৃষি, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নাব্যতা, জল সংরক্ষণ, মাটি সংরক্ষণ, প্রশাসন ও অর্থনৈতিক বিষয়ে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞরা পর্ষদে থাকবেন। আন্তঃরাজ্য নদীর সংরক্ষণ, সেচ ও নিকাশি প্রকল্প, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উন্নতি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, নাব্যতার প্রসার এবং ভূ-ক্ষয় ও দূষণ রোধ সংক্রান্ত বিষয়ে পর্ষদ পরামর্শদাতার ভূমিকা পালন করবে।

আন্তঃরাজ্য জল বিবাদ আইন, ১৯৫৬

সারা ভারত এই আইনের আওতাধীন। এই আইন অনুযায়ী, দু'টি রাজ্যের সরকারের মধ্যে বিবাদ থাকলে, কোনও একটি রাজ্যের সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে মীমাংসার জন্য ট্রাইব্যুনাল-এর কাছে বিচার করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে পারে। যদি কেন্দ্রীয় সরকার মনে করে যে মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিবাদের নিষ্পত্তি সম্ভব নয়, তবে কেন্দ্রীয় সরকার ট্রাইব্যুনালকে বিচার করার নির্দেশ দেয়। এরপর ট্রাইব্যুনাল ব্যাপারটা নিয়ে অনুসন্ধান করে রায় দেয় এবং এই রায় চূড়ান্ত ও সব পক্ষের তা আমল করা বাধ্যতামূলক। এমনকী, এই রায়ের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার এক্তিয়ার সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় (সুপ্রিম কোর্ট) বা অন্য কোনও আদালতেরই নেই। ট্রাইব্যুনালের রায় লাগু করতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মসূচির পরিকল্পনা করতে পারে। এই কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য কর্তৃপক্ষ গঠন করা হতে পারে (পরিচ্ছেদ-৬এ)।

জল ট্রাইব্যুনাল

জলের ব্যবহার, বণ্টন বা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কোনও চুক্তির শর্ত সম্পাদন করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে যদি বিবাদ থাকে, তবে পরিচ্ছেদ ৩ অনুযায়ী, কোনও একটি রাজ্যের সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে মীমাংসার জন্য ট্রাইব্যুনাল-এর কাছে বিচার করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে পারে। যদি কেন্দ্রীয় সরকার মনে করে যে মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিবাদের নিষ্পত্তি সম্ভব নয়, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার এই অনুরোধ পাওয়ার এক বছরের মধ্যে সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই বিবাদের বিচার করার জন্য একটি জল বিবাদ ট্রাইব্যুনাল (ওয়াটার ডিস্পিউট ট্রাইব্যুনাল) গঠন করবে। তবে, আন্তঃরাজ্য জল বিবাদ (সংশোধনী) আইন, ২০০২ বলবৎ হওয়ার আগে ট্রাইব্যুনালে যেসব মামলার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে, সেগুলি নিয়ে আবার বিচার-বিবেচনা করার হবে না।

পরিচ্ছেদ ৫ অনুযায়ী যদি কোনও ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়, কেন্দ্রীয় সরকার (পরিচ্ছেদ ৮ অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা সাপেক্ষে) ট্রাইব্যুনালকে মামলার অনুসন্ধান করার নির্দেশ দেবে। তিন বছরের মধ্যে ট্রাইব্যুনাল তার রায় জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধানের প্রতিবেদন পেশ করবে। এখনও পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রেই জল বিবাদ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে, যেমন—কাবেরী জল বিবাদ, কৃষ্ণা জল বিবাদ (মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের পক্ষ থেকে করা অনুরোধের ভিত্তিতে), মহাদয়ী/মন্দোভী ও বসন্ধরা জল বিবাদ (গোয়া ও ওড়িশা রাজ্যের তরফ থেকে করা অনুরোধের ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনাল গঠনের প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে), পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্যের সরকারের মধ্যে রবি-বিপাশার জলের উপর হরিয়ানার ভাগ ও পাঞ্জাবে শতদ্রু-যমুনা সংযোগ খাল অসম্পূর্ণ থাকা নিয়ে বিবাদ।

পঞ্চায়েতি রাজ আইন :

পঞ্চায়েতি রাজ আইনের পরিচ্ছেদ ৯২ অনুযায়ী, জল ব্যবস্থাপনা, সমান বণ্টন, কর আদায় ও জলসম্পদের সংরক্ষণের জন্য জল কমিটি গঠন করা গ্রাম পঞ্চায়েতের মৌলিক অধিকার।

আইনের পরিচ্ছেদ ৯৯ অনুযায়ী, গৃহস্থ প্রয়োজন ও পশুপালনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে জল সরবরাহ করা, সেচের জন্য জলাশয়, জল নিকাশের প্রণালী, কুয়ো নির্মাণ করা ও সেগুলিকে পরিষ্কার রাখা, এবং প্রয়োজনে কুয়ো, জলাশয়, ডোবা, গর্ত ইত্যাদি ভরাট করা গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব।

পরিচ্ছেদ ৯৯ অনুযায়ী, পঞ্চায়েতের জল নিকাশের জন্য প্রণালী নির্মাণের অনুমোদন দেওয়ার ক্ষমতা আছে।

পরিচ্ছেদ ২০০ অনুযায়ী, পাইপের মাধ্যমে সরবরাহ করা জল, বা পঞ্চায়েতের মালিকানাধীন কুয়ো ও পুকুর থেকে পশুপালন ও গৃহস্থ প্রয়োজনে ব্যবহার বাদ দিয়ে অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত জল, ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই পঞ্চায়েত জলবাবদ কর আদায় করতে পারে।❑

সংকলক : ভাটিকা চন্দ্রা

যোজনা ? ক্যুইজ

বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও

১. ‘বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও’ প্রকল্পের সূচনা কবে হয়?

২. কেন্দ্রীয় সরকারের কোন কোন মন্ত্রক ‘বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও’ প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত?

৩. ‘বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও’ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন কোথায় হয়?

৪. ‘বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও’ প্রকল্পের ‘ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর’ কে?

৫. রাজস্থানের পিপ্লান্ত্রী গ্রাম কন্যা সন্তানের জন্ম কোন পরিবেশ-বান্ধব উপায়ে উদ্‌যাপন করে?

৬. ‘ডিজিটাল গুড্ডা-গুড্ডি বোর্ড’ কী?

৭. সোশ্যাল মিডিয়ায় #SelfieWithDaughter গত বছর জুন মাস নাগাদ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল কেন?

৮. জম্মু ও কাশ্মীরের কোন জেলা ‘বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও’ রিংটোন চালু করে?

৯. লিঙ্গ অনুপাত কী?

১০. ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী শিশুদের (০-৬ বছর) লিঙ্গ অনুপাতের নিরিখে দেশের কোন রাজ্য সবচেয়ে এগিয়ে ও কোন রাজ্য সবচেয়ে পিছিয়ে?

উত্তর :

১. ২০১৫ সালের ২২ জানুয়ারি। ২. মহিলা ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগ। ৩. হরিয়ানার পানিপথে। ৪. মাধুরী দিক্ষিত। ৫. এই গ্রামে কোনও কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে ১১১-টি করে গাছ লাগানো হয়। ৬. মহারাষ্ট্রের জলগাঁও জেলা প্রশাসনের এক অভিনব প্রয়াস—‘বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও’ প্রকল্পের আওতাধীন এই পদক্ষেপের মাধ্যমে জন্ম সংক্রান্ত পরিসংখ্যান ও তথ্য-ভিত্তিক ডিজিটাল পরিষেবা কেন্দ্রীয় সরকারের ই-গভার্নেন্স-এর অঙ্গ। তবে শুধু হাতের নাগালে পরিসংখ্যান ও তথ্য প্রদান করাই নয়, এর প্রধান উদ্দেশ্য সচেতনতা বৃদ্ধি। ৭. হরিয়ানার জিন্দ জেলায় বিবিপুরের পঞ্চায়েত প্রধান নিজের মেয়ের সঙ্গে সেল্‌ফি তুলে ফেসবুক-এ পোস্ট করেন এবং তার গ্রাম পঞ্চায়েত ‘কন্যা সন্তানের সঙ্গে সেল্‌ফি’ প্রতিযোগিতা ঘোষণা করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন। এভাবেই এই প্রয়াস বিশ্বজুড়ে খ্যাতি অর্জন করে। ৮. কাঠুয়া। ৯. প্রতি এক হাজার পুরুষ পিছু নারীর সংখ্যা। ১০. কেরালা সবচেয়ে এগিয়ে (১০৮৪) ও হরিয়ানা সবচেয়ে পিছিয়ে (৮৩৪)।

যো ❖ জ ❖ না ❖ ডা ❖ য়ে ❖ রি

(২১ মে-২০ জুন ২০১৬)

আন্তর্জাতিক

● **মিসাইল টেকনোলজি কন্ট্রোল রেজিম-এর সদস্য হল ভারত :**

'মিসাইল টেকনোলজি কন্ট্রোল রেজিম' (এমটিসিআর)-এর সদস্য হল ভারত। এমটিসিআর-এর সবক'টি সদস্য দেশই এব্যাপারে সম্মতি জানিয়েছে। ফলে ভারত এবার থেকে সর্বাধুনিক মিসাইল প্রযুক্তি সহজেই কিনতে পারবে বিদেশ থেকে। নজরদারি চালানোর জন্য মার্কিন ড্রোন 'প্রেডেটার'-এর ধাঁচে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে ড্রোন বানানোর ক্ষেত্রেও ভারতকে আর আন্তর্জাতিক সমালোচনার মুখে পড়তে হবে না। শুধু তাই নয়, রাশিয়ার সঙ্গে যৌথভাবে ভারত 'ব্রহ্মস' নামে যে সুপারসোনিক ক্রুজ মিসাইলটি তৈরি করেছে, তা তৃতীয় কোনও দেশকে বিক্রি করার ক্ষেত্রেও আর কোনও অসুবিধা হবে না।

● **প্রথম মার্কিন মহিলা প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিলারি ক্লিন্টন :**

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম মহিলা হিসাবে প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়নের জন্য ছাড়পত্র পেলেন হিলারি ক্লিন্টন। এই পদে লড়তে প্রয়োজনীয় ২,৩৮৩ জন প্রতিনিধির সমর্থন নিয়ে প্রেসিডেন্ট পদের দাবিদার হিসাবে নির্বাচিত হলেন হিলারি। এর আগে প্রথম অশ্বেতাঙ্গ হিসাবে প্রেসিডেন্ট পদে জয়ী হয়ে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন বারাক ওবামা। এবার অন্য এক ইতিহাসের পথে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি উইলিয়াম জেফারসন (বিল) ক্লিন্টনের স্ত্রী হিলারি ক্লিন্টন।

● **'আফগান-ভারত মৈত্রী বাঁধ' উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী :**

পাঁচ দেশ সফরের প্রথম পর্যায়ে ৪ জুন হেরাটে আফগান প্রেসিডেন্ট ড. আশরফ ঘানিকে পাশে নিয়ে 'আফগান-ভারত মৈত্রী বাঁধ' উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এত দিন ওই বাঁধটির নাম ছিল—সালমা বাঁধ। ১৭০০ কোটি টাকা খরচ করে ইরান সংলগ্ন হেরাট প্রদেশে চিস্ত-ই-শরিফ নদীর উপরে সালমা বাঁধ গড়েছে ভারত। ৭৫ হাজার হেক্টর কৃষিজমিতে সেচের কাজ করা যাবে এই বাঁধ থেকে। উৎপাদিত হবে ৪২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ।

তবে তার চেয়েও বাঁধটির রাজনৈতিক তাৎপর্য বেশি। কারণ কৌশলগত এবং নিরাপত্তার প্রশ্নে কাবুলের গুরুত্ব ভারতের কাছে অপরিসীম। বস্তুত, দীর্ঘ দিনের পরিকল্পনার ফসল এই সালমা বাঁধ। আশরফ ঘানি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই আফগানিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করার দিকে জোর দেয় ভারত সরকার। পাকিস্তানের সন্ত্রাস মোকাবিলা প্রশ্নেও এই সম্পর্ক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রাক্তন আফগান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই ভারত-বন্ধু হিসেবেই আন্তর্জাতিক মহলে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ২০১৪ সালে তাঁর উত্তরসূরি ড. ঘানি ক্ষমতায় এসে প্রথম বিদেশ সফরের গন্তব্য হিসেবে ভারত নয়, পাকিস্তানকেই বেছেছিলেন। অবশ্য গত বছর এপ্রিলে নয়াদিল্লি আসেন ড. আশরফ ঘানি। দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক সহজ হতে শুরু করে।

● **জঙ্গি কার্যকলাপ নিয়ে বার্ষিক মার্কিন প্রতিবেদন প্রকাশ :**

পাকিস্তানকে প্রায় সরাসরিই দ্বিচারিতার দায়ে অভিযুক্ত করল বারাক ওবামার প্রশাসন। সম্প্রতি প্রকাশিত 'কান্ট্রি রিপোর্ট অন টেররিজম—২০১৫' নামের বার্ষিক প্রতিবেদনে মার্কিন প্রশাসন লিখেছে, তেহরিক-ই-তালিবানের মতো যেসব জঙ্গি সংগঠন পাকিস্তানের মধ্যেই নাশকতা চালাচ্ছিল, তাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সেনা ব্যবস্থা নিয়েছে। কিন্তু জামাত-উদ-দাওয়া, ফালাহ-ই-ইনসানিয়ত এবং আফগান তালিবান বা হাক্কানির মতো সংগঠনকে পাকিস্তান আশ্রয় দিচ্ছে। ভারতে এবং আফগানিস্তানে সন্ত্রাস চালায় এই জঙ্গিরা। রাষ্ট্রসংঘও এই সংগঠনগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কিন্তু পাকিস্তানে তারা অবাধে নতুন লোক নিয়োগ করছে, প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং অর্থসংগ্রহ করছে।

পাকিস্তান সম্পর্কে এমন কড়া রিপোর্ট দিলেও, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের ভূমিকার প্রশংসা করেছে আমেরিকা। ইসলামিক স্টেট ভারতে যেটুকু প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে, সেটুকুকেও সমূলে শেষ করতে ভারত সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছে, তা প্রশংসনীয় বলে মার্কিন রিপোর্টে লেখা হয়েছে।

● **চিনা স্টেল্‌থ ফাইটার :**

প্রযুক্তির লড়াইতে মার্কিন বিমানবাহিনীকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়তে চলেছে পিপলস্ লিবারেশন আর্মির বিমানবাহিনী। জে-২০ নামের এই স্টেল্‌থ ফাইটার (রেডার এড়িয়ে হানা দিতে সক্ষম যুদ্ধবিমান) তৈরি করে ফেলেছে চিন। খুব শীঘ্রই চিনা বিমানবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে এই যুদ্ধবিমান।

স্টেল্‌থ ফাইটার হল এমন যুদ্ধবিমান, যাকে রোখা খুব কঠিন। বিশেষ প্রযুক্তির কারণে এই ধরনের যুদ্ধবিমানের গতিবিধি রেডারে ধরা পড়ে না। ফলে বিমানহানা রোখার জন্য আগে থেকে কোনও প্রস্তুতি নেওয়া যায় না। বর্তমানে মার্কিন এফ-২২ র‍্যাপটর হল বিশ্বের সেরা স্টেল্‌থ ফাইটার। ২০১১ সালে প্রথমবার পরীক্ষামূলকভাবে জে-২০ ওড়ায় চিন। ঘটনাচক্রে সেদিনই চিন সফরে গিয়েছিলেন তৎকালীন মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব রবার্ট গেটস।

● **নেপাল-বিহার সীমান্ত পর্যন্ত চিনা রেল প্রকল্প :**

নেপালের রসুয়াগড়ি পর্যন্ত রেলপথ তৈরির প্রকল্প হাতে নিয়েছে চিন। রসুয়াগড়ি থেকে মাত্র ২৪০ কিলোমিটার দূরেই বিহারের বীরগঞ্জ। দাবি করা হচ্ছে, প্রকল্পটি দিনের আলো দেখলে আমূল

পরিবর্তন হবে চিন-ভারত বাণিজ্য সম্পর্কে। আগামী ২০২০ সালের মধ্যে পরিকল্পনা রূপায়ণের সম্ভাবনা রয়েছে। শেষ হলে এই রেলপথ দিয়ে চিনের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যে সবচেয়ে লাভবান হবে বিহার। দূরত্ব কম হওয়ায় কলকাতা রুট দিয়ে পণ্য রপ্তানিতে যে সময় বা অর্থের প্রয়োজন, একধাক্কায় তা অনেকটাই কমে যাবে।

প্রসঙ্গত, হিমালয়ের দুর্গম পথ দিয়ে কাঠমাণ্ডু পর্যন্ত স্থলপথ ও রেললাইনের মাধ্যমে পরিষেবা শুরু করেছে চিন। গত মার্চেই চিনের সঙ্গে রেল ও স্থলপথে পরিষেবা নিয়ে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন বেজিং সফররত নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা অলি। ওই চুক্তি অনুযায়ী, চিনের গাংসু প্রদেশের লানঝউ থেকে নেপালের কাছাকাছি তিব্বতীয় শহর শিগেজে মালবাহী ট্রেন পরিষেবা শুরু করেছে চিন। সেখান থেকে স্থলপথে নেপালে ওই মালপত্র পাঠানো সম্ভব হবে। সমুদ্রপথে যা পাঠাতে পঁয়ত্রিশ দিন বেশি সময় লাগত।

● **ভিয়েতনামের উপর থেকে উঠল মার্কিন নিষেধাজ্ঞা :**

ভিয়েতনামের উপর থেকে ৫০ বছরের পুরনো মার্কিন সামরিক নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। ২৩ মে হ্যানয়ে ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট ত্রান দাই কুয়াংকে পাশে নিয়ে ওবামা এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। ভিয়েতনামের সঙ্গে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে মার্কিন সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ। ওবামার মতে, দু' তরফেই একটা বিশ্বাস এবং সহযোগিতার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট কুয়াং বলছেন, নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার অর্থ দু' দেশের সম্পর্ক এখন স্বাভাবিক। ১৯৭৫ সালে দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজধানী সাইগন (যা বর্তমানে পরিচিত হো চি মিন শহর হিসেবে) পতনের পরে শেষ হয় ভিয়েতনাম যুদ্ধ। সরে যেতে বাধ্য হয় মার্কিন সেনা।

● **ভারত-মার্কিন-জাপান যৌথ নৌ-মহড়া :**

যৌথ নৌ-মহড়া দিল ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপান। 'মালাবার এক্সারসাইজ' নামে এই বার্ষিক মহড়ার এবার হয় দু'টি পর্যায়ে। প্রথম পর্যায়ের মহড়া ১০ জুন থেকে শুরু হয় জাপানের সাসেবো হারবারে। ১৪ থেকে ১৭ জুন গভীর সমুদ্রে হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের মহড়া। মালাবার এক্সারসাইজ আগে ছিল শুধুমাত্র ভারত এবং আমেরিকার দ্বি-পাক্ষিক মহড়া। পরে জাপানকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গত বছর মহড়া হয়েছিল চেন্নাই উপকূলের কাছে। এবার দক্ষিণ চিন সাগরের আশপাশের এলাকাকেই এই মহড়ার জন্য বেছে নেওয়া হয়।

ভারতের তরফ থেকে মহড়ায় যোগ দেয় চারটি যুদ্ধজাহাজ। সেগুলির মধ্যে আইএনএস সহ্যাদ্রি এবং আইএনএস সাতপুরা হল দেশে তৈরি গাইডেড মিসাইল স্টেল্‌থ ফ্রিগেট গোত্রের যুদ্ধজাহাজ। আইএনএস কির্চ হল গাইডেড মিসাইল করভেট এবং চতুর্থ রণতরীটি হল আইএনএস শক্তি, যেটি একটি ট্যাঙ্কার তথা ফ্লিট সাপোর্ট শিপ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাঠায় একটি এয়ারক্র্যাফ্‌ট ক্যারিয়ার, একটি ক্রুইজার এবং দু'টি ডেস্ট্রয়ার। জাপানের তরফ থেকে মহড়ায় অংশ নেয় একাধিক যুদ্ধজাহাজ।

জাতীয়

● **রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের প্রথম চিন সফর :**

প্রণব মুখোপাধ্যায়ের প্রথম চিন সফর বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। ২৭ মে রাষ্ট্রপতি দফায় দফায় বৈঠক করেছেন সে দেশের প্রেসিডেন্ট শি চিনফিং, প্রধানমন্ত্রী লি খ্যছিয়াং, চিনা কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান ঝাং দেজিয়াং-এর সঙ্গে। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতায় সীমান্ত সমস্যার কথা উল্লেখ করে ভারতের উদ্বেগের সুর বেঁধে দেন ভারতীয় রাষ্ট্রপতি। পরে চিনা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকেও এসেছে সীমান্ত ও সন্ত্রাবাদের প্রসঙ্গ। সম্প্রতি চিনের দু'টি পদক্ষেপ ভারতের উদ্বেগ বাড়িয়েছে। প্রথমত, পাঠানকোট কাণ্ডের মূল চক্রী জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি সংগঠনের নেতা মাসুদ আজহারকে নিষিদ্ধ করতে রাষ্ট্রসংঘে আর্জি জানিয়েছিল ভারত। পাকিস্তানের পাশে দাঁড়িয়ে সেই আর্জি স্থগিত করে দিয়েছিল চিন। দ্বিতীয়ত, পরমাণু সরবরাহকারী গোষ্ঠী বা নিউক্লিয়ার সাপ্লায়ার্স গ্রুপ (এনএসজি)-এ ভারতকে অন্তর্ভুক্ত করা নিয়ে সম্প্রতি বাধ সেধেছে বেজিং। চিনের মতে, পরমাণু সম্প্রসারণ বিরোধী চুক্তি বা এনপিটি-তে সই করেনি দিল্লি—তাই ভারতকে এনএসজি-তে ঢেকানো সম্ভব নয়।

● **প্রধানমন্ত্রীর সুইৎজারল্যান্ড সফর :**

প্রধানমন্ত্রীর পাঁচ দেশীয় (আফগানিস্তান, কাতার, সুইৎজারল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো) সফরে ৭ জুনের গন্তব্য সুইৎজারল্যান্ড ছিল তিন নম্বর দেশ। নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকের পর সে দেশের প্রেসিডেন্ট জোহান স্কিনিডার আম্মান ঘোষণা করেছেন, তাঁর দেশ চায়, ভারত পরমাণু সরবরাহকারী গোষ্ঠী (এনএসজি)-র অন্তর্ভুক্ত হোক। কালো টাকা ভারতে ফিরিয়ে আনার প্রশ্নে দু' দেশের সহযোগিতাকে আরও জোরদার করতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন দুই নেতা। 'ইউরোপিয়ান ফ্রি ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন'-এর সঙ্গে অবাধ বাণিজ্য চালু করা নিয়ে ফের আলোচনা শুরু হবে। সুইৎজারল্যান্ড, আইসল্যান্ড, লিকটেস্টাইন ও নরওয়েকে নিয়ে গড়া এই গোষ্ঠীর সঙ্গে এ সংক্রান্ত আলোচনা ঝুলে আছে সেই ২০০৮ সাল থেকে।

● **মোদী-ওবামার সপ্তম বৈঠক :**

ওভাল অফিস অর্থাৎ হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্টের নিজস্ব অফিসে বারাক ওবামা এবং নরেন্দ্র মোদীর সপ্তম বৈঠক হয় ৭ জুন। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বিডেনও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রপতির এই বৈঠক শুরু হওয়ার আগেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল, ভারত মিসাইল টেকনোলজি কন্ট্রোল রেজিম-এর (এমটিসিআর) সদস্য হচ্ছে। ভারতকে নিউক্লিয়ার সাপ্লায়ার্স গ্রুপ বা এনএসজি-র সদস্যপদ পাইয়ে দেওয়ার বিষয়ে আমেরিকা কীভাবে চেষ্টা চালাচ্ছে, তা নিয়ে বিশদে আলোচনা হয়। মোদী-ওবামার এই বৈঠকে গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়েও আলোচনা হয়েছে। প্যারিস চুক্তি অনুসারে ভারত কীভাবে গ্রিন হাউস গ্যাসের নির্গমন কমাবে, আলোচনা মূলত তা নিয়েই। সিদ্ধান্ত হয়েছে ভারত-মার্কিন পরমাণু সমঝোতা নিয়েও। ভারতে আরও ৬-টি অসামরিক পরমাণু কেন্দ্র তৈরির কাজ এক বছরের মধ্যে শেষ করা হবে বলে স্থির হয়েছে। মার্কিন কংগ্রেসেও নরেন্দ্র মোদী ভাষণ দেন।

● **ভারতীয় যুদ্ধবিমানের ককপিটে প্রথমবার তিন মহিলা পাইলট :**

১৮ জুন প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোহর পরীক্করের উপস্থিতিতে ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রথম তিন মহিলা পাইলট—মধ্যপ্রদেশের আভানি চতুর্বেদী, বিহারের মোহনা সিংহ এবং রাজস্থানের ভাবনা কান্থকে যুদ্ধবিমানের ককপিটে বসার ছাড়পত্র দেওয়া হয়। আগেই ১৫০ ঘণ্টার উড়ানের প্রশিক্ষণের প্রথম ধাপ উতরে গিয়েছিলেন তাঁরা। এতদিন পর্যন্ত কোনও মহিলা পাইলটকে যুদ্ধবিমান চালানোর অনুমতি দেয়নি বায়ুসেনা। সেনার হেলিকপ্টার এবং কার্গো বিমান চালানো পর্যন্ত অনুমতি ছিল তাঁদের। এ বছরই রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, এবার সেনাবাহিনীর কমব্যাট ফোর্সেও মহিলাদের সুযোগ দেওয়া হবে। সেই সুযোগটা প্রথম এনে দিল ভারতীয় বায়ুসেনা।

একের পর এক প্রশিক্ষণে সফল হওয়ার পরই ককপিটে বসার সুযোগ আদায় করে নিয়েছেন এই তিন কন্যা। তাঁদের সাফল্যে ভারতীয় বিমানবাহিনীতে একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। বায়ুসেনা সূত্রের খবর, তিন জনেই প্রথম ধাপে 'পিসি সেভেন বেসিক ট্রেনার' বিমান ৫৫ ঘণ্টা আকাশে ওড়ানোর অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এরপর 'কিরণ মার্ক-টু' বিমানে দ্বিতীয় ধাপের প্রশিক্ষণও হয়েছে। হায়দরাবাদ এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণ এখানেই শেষ। এবার 'অ্যাডভান্সড জেট ট্রেনার'-এ প্রশিক্ষণ নিতে তিন কন্যা হায়দরাবাদ থেকে কর্ণাটকের বিদারে যাচ্ছেন। আগামী ছ' মাস প্রশিক্ষণের পর তাঁরা মিগ, সুখোই এবং মিরাজের ককপিটে বসবেন।

● **এক দশকে ঊনিশ গুণ বেড়েছে নেট অপরাধ :**

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো জানিয়েছে গত এক দশকে দেশে সাইবার অপরাধ বেড়েছে ঊনিশ গুণ। শীর্ষে রয়েছে প্রতারণা। ২০০৫ থেকে ২০১৪ সাল—দশ বছরে সাইবার অপরাধের সংখ্যা বছরে ৪৮১ থেকে বেড়ে হয়েছে ৯,৬২২। বেড়েছে গ্রেপ্তারের সংখ্যাও। ২০১৫ সালে নেট-ব্যাংকিং, এটিএম ও অন্যান্য ব্যাংকের লেনদেনে সাইবার অপরাধের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১২ হাজার।

এই প্রতারণা শুধু ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক সংস্থার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। নিত্যনতুন উপায়ে প্রতারণার ঘটনা ঘটছে নেটের মাধ্যমে বিভিন্ন লেনদেনেও। নেট বাজারের রকেট গতির উত্থানের পীঠস্থান এখন ভারত। ২০২০ সালে নেট বাজারের ক্রেতা সংখ্যা ১৭ কোটি ছাড়াবে। সাইবার অপরাধীদের নজরে রয়েছে এই বাজার। সাইবার অপরাধের তালিকায় প্রতারণার পরে রয়েছে মহিলা ও ছোট বাচ্চাদের প্রতি অসম্মান, যৌন নির্যাতন, প্রতিহিংসামূলক মানসিক নিগ্রহের মতো বিষয়। রয়েছে 'অনলাইন বুলিং' বা নেটে দাদাগিরি।

পশ্চিমবঙ্গ

● **শুরু হল বিধানসভার বাজেট অধিবেশন :**

১৭ জুন বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরু হল। আপাতত ঠিক হয়েছে, ৪ জুলাই পর্যন্ত চলবে এই অধিবেশন। বাজেট অধিবেশন শুরুর আগে ১৬ জুন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘরে ছিল কার্য উপদেষ্টা কমিটির সর্বদলীয় বৈঠক। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সমস্ত দলের নব-নির্বাচিত বিধায়ক। ২৪ জুন রাজ্য বাজেট পেশ করছেন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র।

● **রাজ্যের প্রথম মহিলা পুলিশ কমিশনার :**

রাজ্যের প্রথম মহিলা পুলিশ কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব নিলেন চিলিং সেমিক লেপচা। ৬ জুন রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে আইপিএস-দের বদলির নতুন নির্দেশিকা জারি হয়েছে, তাতে শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার হিসাবে মনোজ বর্মার পরিবর্তে চিলিং সেমিক লেপচাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনার হয়ে ফিরলেন প্রাক্তন ডিএসপি।

১৯৯৯ ব্যাচের অফিসার হিসেবে কাজ শুরু করেন শিলিগুড়ির ডিএসপি (টাউন) হিসাবেই। তার পরে নানা পদোন্নতি, বদলির পর বর্তমানে তিনি মালদহ রেঞ্জের ডিআইজি পদে আছেন। দীর্ঘ দিন ধরে তিনি রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরের উত্তরবঙ্গের স্পেশাল সুপারের দায়িত্ব সামলানো ছাড়াও অন্য পদে থেকেও স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের উত্তরবঙ্গের দায়িত্ব সফলভাবে সামলেছেন।

● **এডিবি চার জেলায় জলপ্রকল্পে ১২০০ কোটি ঋণ দেবে :**

প্রাথমিকভাবে রাজ্যের চারটি অঞ্চলে জলপ্রকল্প শুরু করার জন্য রাজ্যকে ১২০০ কোটি টাকা ঋণ দিতে সম্মত হয়েছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)। ওই চারটি অঞ্চল হল উত্তর ২৪ পরগণা, বাঁকুড়া, শিলিগুড়ি পুর এলাকা এবং জলপাইগুড়ি জেলার একাংশ। প্রকল্পের মৌলিক উদ্দেশ্য হল গ্রাম ও শহরের মানুষকে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা। তবে গভীর নলকূপ বসিয়ে নয়, নদী ও জলাশয়ের জল পরিশোধন করে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, আর্সেনিক মোকাবিলায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) এবং বিশ্ব ব্যাংক সুপারিশ করেছিল, আর্সেনিক পীড়িত সব ক'টি এলাকাতেই নদী থেকে জল তুলে তা শোধন করে বাড়ি বাড়ি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে। যেমন, কলকাতা পুরসভা এলাকায় রয়েছে। কিন্তু মালদহ এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণায় একটি করে প্রকল্প ছাড়া বাকি সব জায়গায় গভীর নলকূপই ভরসা। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে ক্ষুদ্র সেচে অগভীর নলকূপের রমরমা। ফলে জল স্তর নামছে হু হু করে। বাড়ছে আর্সেনিক, ফ্লুওরাইড দূষণ বৃদ্ধির আশঙ্কাও।

● **বাংলাদেশ সীমান্তে ফের যাবে ট্রেন :**

১৯৬৫ সালের পর ফের হলদিবাড়ি দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে রেল যোগাযোগ স্থাপিত হতে চলেছে। ইতিমধ্যে হলদিবাড়ি থেকে বাংলাদেশের সীমান্ত পর্যন্ত রেল লাইন পাতার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষের কাছে নির্দেশ এসেছে। নতুন রেলপথ চালুর জন্য যা যা দরকার তা নিয়ে রেলের পক্ষে একটা সমীক্ষাও করা হয়েছে। রেল বোর্ডের কাছে হলদিবাড়ি স্টেশন সংলগ্ন এলাকার পরিকাঠামোর উন্নয়ন নিয়ে একটা পরিকল্পনা পাঠানো হয়েছে।

একসময় হলদিবাড়ির সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের (অধুনা বাংলাদেশ) রেল যোগাযোগ ছিল। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধের

সময় থেকে সেই রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দু' দেশের পররাষ্ট্র দপ্তর সম্প্রতি নতুন করে এই রেললাইন চালু করা নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেয়। হলদিবাড়ি স্টেশন থেকে রেলপথে বাংলাদেশ সীমান্ত তিন কিলোমিটার। ওপাশে বাংলাদেশের স্টেশন চিলাহাটি। এপারে হলদিবাড়ির মত ওপারেও চিলাহাটি পর্যন্ত ট্রেন আসে। মাঝের অংশটুকু শুধু এতদিন বন্ধ ছিল।

অর্থনীতি

● **রাশিয়ার তেল ক্ষেত্রে ভারতীয় লগ্নি :**

রাশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল ক্ষেত্র ভাঙ্কোরের ২৩.৯ শতাংশ অংশীদারি কিনছে তিন ভারতীয় সংস্থার কনসোর্টিয়াম। এ জন্য ১৭ জুন সেখানকার তেল সংস্থা রোজনেফ্‌ট-এর সঙ্গে চুক্তি করে ইন্ডিয়ান অয়েল, অয়েল ইন্ডিয়া এবং ভারত পেট্রো-রিসোর্সেস। মোট লগ্নির পরিমাণ ২১০ কোটি ডলার (প্রায় ১৪,০৭০ কোটি টাকা)। রোজনেফ্‌ট-এর শাখা ভাঙ্কোরনেফ্‌ট-এর থেকে ওই অংশীদারি হাতে নেবে সংশ্লিষ্ট কনসোর্টিয়াম। ইন্ডিয়ান অয়েল এবং অয়েল ইন্ডিয়া পাবে সমান ৮ শতাংশ করে অংশীদারি। আর ভারত পেট্রোলিয়ামের শাখাটির হাতে আসবে ৭.৮ শতাংশ। আগামী সেপ্টেম্বরেই এ বিষয়ে চূড়ান্ত অনুমোদন মিলবে বলে আশা সংস্থাগুলির। এই চুক্তি ছাড়াও, ভাঙ্কোরের আরও ১১ শতাংশ অংশীদারি বিদেশে ওএনজিসি-র শাখা সংস্থা ওএনজিসি বিদেশকে (এভিএল) বিক্রি করতে রাজি হয়েছে রোজনেফ্‌ট। তবে সেই চুক্তি এখনও চূড়ান্ত হয়নি। প্রসঙ্গত, গত সেপ্টেম্বরেই ওই তেল ক্ষেত্র পরিচালনকারী ভাঙ্কোরনেফ্‌ট-এর ১৫ শতাংশ অংশীদারি কিনেছে তারা। যার লগ্নির পরিমাণ প্রায় ১২৬.৮ কোটি ডলার।

বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম তেল ব্যবহারকারী দেশ হলেও, এখন বেশিরভাগটাই (চাহিদার প্রায় ৭৫ শতাংশ) আমদানি করতে হয় ভারতকে। এই অবস্থায় বিদেশে তেল ক্ষেত্রের অংশীদারি কেনার মাধ্যমে আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনতে চায় কেন্দ্র। গত ১ জানুয়ারির হিসাব মতো ভাঙ্কোর তেল ক্ষেত্রে প্রায় ৩৬.১ কোটি টন তেল এবং ১৩,৮০০ কোটি ঘনমিটার গ্যাস মজুত রয়েছে।

● **চা রপ্তানিতে ৩৫ বছরের নজির ভাঙল :**

গত অর্থবর্ষেই ৩৫ বছরের পুরনো রেকর্ড ভেঙে রপ্তানিতে নতুন সীমা ছুঁয়েছে দেশের চা শিল্প। রপ্তানির পাশাপাশি উৎপাদনেও গত অর্থবর্ষে নতুন রেকর্ড গড়েছে। দেশে এই সময়ে মোট ১২৩.৩১ কোটি কেজি চা উৎপাদিত হয়েছে, যা আগের বারের চেয়ে ৩ শতাংশ বেশি। টি বোর্ডের হিসাবে, ২০১৫-১৬ সালে ভারত ২৩.২৯ কোটি কেজি চা রপ্তানি করেছে। যা ১৯৮০-৮১ সালের (২৩.১৪ কোটি) নজির ভাঙল। তবে এখনও রপ্তানির সর্বকালীন রেকর্ড ভাঙতে পারেনি চা শিল্প। আগে দু'বার এর চেয়েও বেশি চা রপ্তানি করেছে ভারত। ১৯৭৬-৭৭ সালে ২৪.২৪ কোটি কেজি। ১৯৫৬-৫৭ সালে ২৩.৩০ কোটি।

● **নতুন বিমান পরিবহণ নীতিতে মন্ত্রীসভার সায় :**

১৫ জুন নতুন বিমান পরিবহণ নীতিতে সায় দেয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। অনুমোদিত নীতিতে আঞ্চলিক বিমান পরিবহণে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ ধরনের আঞ্চলিক রুটে এক ঘণ্টার উড়ানে বিমান ভাড়া সর্বোচ্চ ২৫০০ টাকায় বেঁধে দেওয়া হচ্ছে, যাতে আরও বেশি মানুষ বিমানে চড়ার ক্ষেত্রে উৎসাহিত হন। দেশের বিমানবন্দরের সংখ্যা ৭৭ থেকে বাড়িয়ে আগামী তিন বছরে ১২৭-টি করার প্রস্তাবও রয়েছে এই নীতিতে।

আগের নিয়ম অনুযায়ী, ৫ বছর উড়ান চালানো ছাড়াও হাতে ন্যূনতম ২০-টি বিমান থাকলে তবেই বিদেশে উড়ানের অনুমতি দেওয়া হত। এবার কমপক্ষে ২০-টি বিমান থাকার নিয়ম বহাল রেখে ৫ বছর উড়ান চালানোর বাধ্যবাধকতা তুলে নেওয়া হল। যার অর্থ, সদ্য ভারতের আকাশে ডানা মেলা বিমান সংস্থার হাতেও ২০-টি বিমান থাকলেই তারা আন্তর্জাতিক উড়ান চালু করতে পারবে।

● **স্টেট ব্যাংকে ৫ সহযোগীকে মেশাতে অনুমতি :**

পাঁচ সহযোগী ব্যাংককে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই)-এর সঙ্গে মিলিয়ে দিতে ১৫ জুন সবুজ সঙ্কেত দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। গত ১৭ মে পাঁচ সহযোগী—স্টেট ব্যাংক অফ বিকানের অ্যান্ড জয়পুর, স্টেট ব্যাংক অফ ত্রিবাঙ্কুর, স্টেট ব্যাংক অফ পাতিয়ালা, স্টেট ব্যাংক অফ মহীশূর ও স্টেট ব্যাংক অফ হায়দরাবাদকে অধিগ্রহণ করতে কেন্দ্রের অনুমোদন চেয়েছিল এসবিআই। বিশ্বে প্রথম সারির ৫০-টি ব্যাংকের তালিকায় ভারতের একটি ব্যাংকও নেই। এই সংযুক্তির পর সেদিকে এগোতে পারবে স্টেট ব্যাংক। অন্যদিকে, ব্যাংকের বকেয়া ঋণ দ্রুত উদ্ধারে আইন সংশোধনেও সায় দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা।

● **এপ্রিলে সঙ্কুচিত শিল্পোৎপাদন :**

১০ জুন প্রকাশিত সরকারি পরিসংখ্যান জানায়, দু' মাস বৃদ্ধির মুখ দেখার পরে এপ্রিলে ফের দেশের শিল্পোৎপাদন সরাসরি কমেছে ০.৮ শতাংশ। প্রসঙ্গত, জানুয়ারিতে শেষ বার ১.৬ শতাংশ কমেছিল শিল্পোৎপাদন। পরিসংখ্যান বলছে, মূলত উৎপাদন শিল্প ৩.১ শতাংশ সঙ্কুচিত হওয়ার জেরেই এপ্রিলে শিল্পোৎপাদন কমেছে। উৎপাদন কমেছে মূলধনী পণ্যের (২৪.৯ শতাংশ)। চাহিদা কমার প্রভাব পড়েছে সামগ্রিক ভোগ্যপণ্য উৎপাদনেও। তবে এরই মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে ব্যবহারের ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বেড়েছে ১১.৮ শতাংশ। কিছুটা ভাল করেছে বিদ্যুৎ (১৪.৬ শতাংশ) এবং খনন শিল্পও (১.৪ শতাংশ)।

● **পরিকাঠামো শিল্পে বৃদ্ধি ৮.৫ শতাংশ :**

৩১ মে প্রকাশিত সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের পরিকাঠামো শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি এপ্রিলে ছুঁল ৮.৫ শতাংশ। গত চার বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে তা এত বেশি হারে বাড়েনি। মূলত অপরিশোধিত তেল শোধন ও বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির হার ১০ শতাংশ ছাড়ানোর হাত ধরেই পরিকাঠামো শিল্প এত বেশি হারে

এগিয়েছে। তেল শোধন ক্ষেত্রে উৎপাদন এপ্রিলে বেড়েছে ১৭.৯ শতাংশ, বিদ্যুৎ ১৪.৭ শতাংশ। সার্বিকভাবে এর জেরে উৎপাদন শিল্পেও প্রাণ ফিরবে বলে আশাবাদী কেন্দ্র সরকার। কারণ সার্বিক শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হিসাবে আটটি পরিকাঠামো শিল্পের (কয়লা, অশোধিত তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, শোধনাগারের পণ্য, সার, ইস্পাত, সিমেন্ট ও বিদ্যুৎ) গুরুত্ব ৩৮ শতাংশ। উল্লেখ্য, মার্চে পরিকাঠামো শিল্পে বৃদ্ধির হার ছিল ৬.৪ শতাংশ।

● **পিএফ-এর সর্বোচ্চ বিমার অঙ্ক ৬ লক্ষ করল কেন্দ্র :**

কর্মী প্রভিডেন্ট ফান্ড (ইপিএফ) প্রকল্পের আওতায় সর্বোচ্চ জীবনবিমার পরিমাণ বাড়ালো কেন্দ্র সরকার। কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী বান্দারু দত্তাত্রেয় ২৫ মে এ কথা জানান। প্রতিটি কর্মীর জন্য তাঁর জমা তহবিলের ভিত্তিতে করা ওই এমপ্লয়িজ ডিপজিট লিঙ্কড ইনশিওরেন্স প্রকল্পে বিমার অঙ্ক এখন থেকে হবে সর্বোচ্চ ৬ লক্ষ টাকা। এত দিন তা ছিল ৩.৬ লক্ষ টাকা। প্রসঙ্গত, কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হলে এই বিমার সুবিধা পাওয়া যায়। এই সিদ্ধান্তে পিএফ-এর আওতায় থাকা ৪ কোটি কর্মী উপকৃত হবেন। গত সেপ্টেম্বরেই ইপিএফ-এর কেন্দ্রীয় অছি পরিষদ বিমার অঙ্ক বাড়ানোর সুপারিশ করে।

● **৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত আগাম পিএফ তুলতে কর-ছাড় :**

কর্মী প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিএফ)-এর তহবিল থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত তুললে উৎসে কর কাটা হবে না। ১ জুন থেকেই এই নিয়ম কার্যকর হল। এত দিন তা ছিল ৩০ হাজার টাকা। আয়কর আইন সংশোধন সংক্রান্ত এই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে কেন্দ্র। কর্মী ৫ বছর কাজ করার আগেই পিএফ-এর টাকা তুললে এই কর কাটা হয়। ১৫জি এবং ১৫এইচ ফর্ম জমা দিলে উৎসে কর কাটা হয় না—এই ফর্ম জমা দিয়ে আসলে আয়কর দপ্তরকে জানাতে হয়, পিএফ-এর তহবিল থেকে টাকা তুললেও তা মোট আয়কে করযোগ্য করে তুলবে না। ৬০ বছরের ঊর্ধ্বে অর্থাৎ প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে ১৫এইচ ফর্ম জমা দিতে হয়। আর ৬০ বছরের নীচে যাঁদের বয়স, তাঁদের ক্ষেত্রে ১৫জি ফর্ম প্রযোজ্য।

● **কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার মূলধনী পণ্য নীতিতে সায় :**

কল-কারখানায় উৎপাদন বাড়িয়ে শিল্পের হাল ফেরাতে জাতীয় মূলধনী পণ্য নীতিতে সায় দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। লক্ষ্য ভারতকে মূলধনী পণ্য তৈরিতে বিশ্বমানের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা। আর, তার হাত ধরেই ২০২৫ সালের মধ্যে নতুন ২.১ কোটি কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে কেন্দ্র সরকার।

মেক ইন ইন্ডিয়া কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এই নীতি বড় ভূমিকা নেবে বলে মনে করছে কেন্দ্র। সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এই নীতি রূপায়িত হলে মূলধনী পণ্য উৎপাদনের পরিমাণ ২০১৪-১৫ সালের ২.৩ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০২৫ সালে ছোঁবে ৭.৫ লক্ষ কোটি। রপ্তানির পরিমাণও মোট উৎপাদনের ৪০ শতাংশে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে বলে জানানো হয়েছে। এখন তা ২৭ শতাংশ।

● **আইওসি-র লাভ দ্বিগুণ :**

গত অর্থবর্ষে ১০,৩৯৯ কোটি টাকা মুনাফা হয়েছে বলে জানিয়েছে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন বা আইওসি। আগের বছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। ফলে লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার তালিকায় ওয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন (ওএনজিসি)-র পরেই জায়গা পেয়েছে তারা। পেট্রোল ও ডিজেল সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত হলেও রান্নার গ্যাস ও কেরোসিন এখনও বিশ্ব বাজারের দরের থেকে কম দামে বেচতে হয় আইওসি-কে। বিশ্ব বাজারে তেলের দাম নামায় দুই দরের সেই ফারাকও (আন্ডার-রিকভারি) কমেছে।

● **কোল ইন্ডিয়া ৬.৩ শতাংশ বাড়াল কয়লার দাম :**

কয়লার দাম বাড়ানোর কথা ঘোষণা করল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা কোল ইন্ডিয়া। ৩০ মে তারা জানায়, দর বাড়ানো হবে ৬.৩ শতাংশ হারে। ফলে চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে ৩২৩৪ কোটি টাকা বাড়তি আয় ঘরে তুলবে সংস্থা। তবে এর জেরে জ্বালানি খরচ বাড়বে বিদ্যুৎ, ইস্পাত ও সিমেন্ট শিল্পে।

পরিচালন পর্ষদের বৈঠকে ২৮ মে এই সিদ্ধান্ত নেয় কোল ইন্ডিয়া। ৩০ মে তারা বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জকে পাঠানো বিবৃতিতে সেকথা জানায়। প্রসঙ্গত, বর্তমানে কয়লার চলবি দাম গড়ে টন প্রতি ১১৯৩ টাকা। দেশে কয়লা উৎপাদনের ৮০ শতাংশেরও বেশি জোগান দেয় কোল ইন্ডিয়া।

● **করযোগ্য সব পরিষেবায় কৃষি কল্যাণ সেস :**

সমস্ত করযোগ্য পরিষেবায় ১ জুন থেকে বসল কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি কল্যাণ সেস। কৃষির উন্নতির লক্ষ্যে ০.৫ শতাংশ হারে এই সেস বসানোর প্রস্তাব গত বাজেটেই ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। এর ফলে বাড়তি ২০ হাজার ৬০০ কোটি টাকার কর জমা পড়বে সরকারের ঘরে। টেলিফোনের বিল থেকে শুরু করে বিমানের টিকিটের দাম, সব কিছুরই মাসুল বাড়ছে এর ফলে। বিমার প্রিমিয়ামের খরচও বাড়ছে। রেলের বাতানুকূল শ্রেণির টিকিট, পণ্য মাসুল এবং পার্সেলের উপরও চাপছে এই সেস। ১ জুন ও তার পরে বিক্রি করা টিকিটে এই সেস নেওয়া হবে। সাধারণ ও স্লিপার ক্লাসে তা বসছে না। মোট ৪৭-টি পরিষেবাকে এই অতিরিক্ত করের আওতা থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে।

● **ওয়েস্টিংহাউসের প্রস্তাবিত পরমাণু চুল্লি নির্মাণ অন্ধ্রে সরছে :**

গুজরাটের মিটি বির্দি থেকে প্রস্তাবিত পরমাণু বিদ্যুৎ চুল্লি প্রকল্প সরিয়ে শ্রীকাকুলামে নিয়ে যাচ্ছে জাপানি বহুজাতিক তোশিবা কর্পের সংস্থা ওয়েস্টিংহাউস। প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছিল গুজরাটের মিঠি বির্দিতে ছ'টি চুল্লি তৈরি করবে ওয়েস্টিংহাউস। যার প্রতিটি উৎপাদন করবে ১,১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। কিন্তু স্থানীয় ফল চাষিরা জমি দিতে বেঁকে বসায় তা এবার সরছে অন্ধ্রপ্রদেশে।

● **নগদে সোনা কেনায় টিসিএস :**

এখন থেকে ৫ লক্ষ বা তার বেশি দামের সোনার গয়না অথবা ২ লক্ষ বা তার বেশি দামের পাকা সোনা (বুলিয়ন) নগদে কিনলে

তবেই ১ শতাংশ হারে 'ট্যাক্স কালেকটেড অ্যাট সোর্স' (টিসিএস) দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার ২০১২ সালে নগদ টাকায় পাকা সোনা বা সোনার গয়না কেনা নিয়ন্ত্রণ করতে লেনদেনের উপর কর আদায় ব্যবস্থা চালু করে। সেই সময় থেকেই ২ লক্ষ বা তার বেশি টাকার পাকা সোনা বা সোনার গয়না কিনলে ক্রেতাদের তার উপর ১ শতাংশ হারে টিসিএস দিতে হত। এবার আইন সংশোধন করে গয়নার ক্ষেত্রে ওই ঊর্ধ্বসীমা ৫ লক্ষ টাকা করা হল।

● **ডাকঘরের পেমেন্টস ব্যাংক :**

এবার ডাকঘরের পেমেন্টস ব্যাংক (ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাংক) চালু করার প্রস্তাবে সিলমোহর দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। রিজার্ভ ব্যাংকের ঘর থেকে ছাড়পত্র মিলেছে আগেই। ১ জুন এই প্রস্তাব পাসের কথা ঘোষণা করে টেলিযোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেন, সারা দেশে ১.৫৪ লক্ষ ডাকঘরের মধ্যে ১.৩৯ লক্ষই গ্রামঞ্চলে। এবার সেই উপস্থিতিকে হাতিয়ার করে প্রত্যন্ত এলাকাতেও সকলের দরজায় ব্যাংকিং পরিষেবা পৌঁছে দিতে ডাক বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যেই চালু হয়ে যাবে এই পেমেন্টস ব্যাংক-এর ৬৫০-টি শাখা। শুরুতে তহবিল ৮০০ কোটি টাকা। যার মধ্যে ৪০০ কোটি শেয়ার মূলধন। আর বাকি অর্ধেক জোগাবে কেন্দ্র। ব্যাংকের নেতৃত্ব দেবেন চিফ এগ্‌জিকিউটিভ অফিসার (সিইও)। আর তা চালানোও হবে পুরোদস্তুর পেশাদারি ঢঙে। গত ১৯ আগস্ট পেমেন্টস ব্যাংক খুলতে ১১ আবেদনকারীকে নীতিগতভাবে অনুমোদন দিয়েছিল শীর্ষ ব্যাংক তার মধ্যে ছিল ডাক বিভাগও। উল্লেখ্য, এখন ডাকঘরের ২২ হাজারেও বেশি শাখা চলে এসেছে কোর ব্যাংকিং-এর আওতায়।

● **কৃষিপণ্য-প্রক্রিয়াকরণ তালুক :**

২ জুন কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী হরসিমরত কৌর বাদল জানান সারা দেশে ২৫০-টি ছোট কৃষিপণ্য-প্রক্রিয়াকরণ তালুক গড়ার পরিকল্পনা করেছে কেন্দ্র। লগ্নি ছাড়াতে পারে ৫,০০০ কোটি টাকা। তাঁর দাবি, নির্দিষ্ট কোনও ফল বা সব্জির উৎপাদন অঞ্চলের কাছে তার তালুক গড়া হবে। লক্ষ্য, প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রকে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে পণ্যের অপচয় কমানো ও আয় বাড়ানো। নির্মাতাকে তালুকপিছু ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত ভরতুকিও দেবে কেন্দ্র।

● **৫৬-টি ওষুধের দাম কমলো :**

ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও জীবাণু সংক্রমণের চিকিৎসার জন্য জরুরি মোট ৫৬-টি গুরুত্বপূর্ণ ওষুধের ক্ষেত্রে দামের সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দিল কেন্দ্র। ফলে এই সমস্ত ওষুধের জন্য খরচ গড়ে যায় ২৫ শতাংশ কমছে। কিছু ক্ষেত্রে দাম কমেছে ১০-১৫ শতাংশ। এমনকী দাম ৪৫-৫০ শতাংশ পর্যন্তও কমে গিয়েছে বেশ কয়েকটির ক্ষেত্রে। তবে স্যালাইন, গ্লুকোজ ইঞ্জেকশনের মতো কিছু ইনট্রাভেনাস ফ্লুইডের ছোট প্যাকের দাম বেড়েছে। বড় প্যাকের দাম কমানো হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশে ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি (এনপিপিএ)।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

● **৫ নতুন মৌলের খোঁজ :**

১৮৬৯ সালে রাসায়নিক মৌল বা মৌলিক পদার্থদের পর পর সাজিয়ে রাখার জন্য যে পর্যায় সারণি (পিরিয়ডিক টেব্‌ল) বানিয়েছিলেন রুশ রসায়নবিদ মেন্দেলিভ, প্রায় দেড়শো বছর পর ফের তা সম্প্রসারিত হতে চলেছে। একুশ শতকে এই প্রথম সংযোজন ঘটতে চলেছে 'মেন্দেলিভ টেব্‌ল'-এ। নতুন যে রাসায়নিক মৌলগুলোর সংযোজন ঘটছে পর্যায় সারণিতে, তাদের পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে প্রোটন রয়েছে যথাক্রমে ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৭ এবং ১১৮-টি। 'ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ পিওর অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রি' (আইইউপিএসি) ৮ জুন ৪-টি মৌলের নামকরণ করে—'নিহোনিয়াম' (Nh-১১৩), 'মস্কোভিয়াম' (Mc-১১৫), 'টেনেসাইন' (Ts-১১৭) এবং 'ওগানেসান' (Og-১১৮)। বাকি একটি মৌলের, যার প্রোটন সংখ্যা ১১৪, এখনও নামকরণ হয়নি।

মেন্দেলিভ যখন প্রথম পর্যায় সারণি বানিয়েছিলেন, তখন তিনি রাসায়নিক মৌলগুলোকে সাজিয়েছিলেন একের পর এক বেড়ে চলা পরমাণু ক্রমাঙ্কের ভিত্তিতে। পরে কোনও পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে (নিউক্লিয়াস) কতগুলো আধানযুক্ত কণিকা (প্রোটন) রয়েছে, তারই ভিত্তিতে সাজানো হতে থাকে পর্যায় সারণি।

● **কোলেস্টেরল ও খাদ্যের সম্পর্ক নিয়ে নতুন তথ্য :**

মার্কিন সংস্থা ডায়েটারি গাইডলাইন্স অ্যাডভাইজরি কমিটির সম্প্রতি প্রকাশিত ২০১৫ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, কোলেস্টেরল যুক্ত খাদ্যের সঙ্গে রক্তে কোলেস্টরল বৃদ্ধির কোনও সম্পর্ক নেই। ৫৭২ পাতার ওই রিপোর্টে গবেষকেরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, ২০১০ সালে প্রকাশিত কমিটির আগের রিপোর্টে কোলেস্টেরল সম্বন্ধে তথ্যে ভুল ছিল। রিপোর্টে বলা হয়েছিল, প্রতি দিন ৩০০ মিলিগ্রামের বেশি কোলেস্টেরল মানুষের শরীরে গেলে ক্ষতি। এবার সংশোধন করে নতুন রিপোর্টে বলা হয়েছে, খাবার থেকে রক্তে কোলেস্টেরল মেশে মাত্র ১২ থেকে ১৫ শতাংশ। রক্তে থাকা কোলেস্টেরলের ৮৫ থেকে ৮৮ শতাংশই আসে যকৃৎ থেকে। একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষের প্রতি দিন ৩০০ মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল প্রয়োজন। একটি সেদ্ধ ডিমের কুসুমে কোলেস্টেরল থাকে ১৮৫ মিলিগ্রাম। সেদ্ধ ডিম ছাড়াও সারা দিনে কোলেস্টেরল এবং প্রোটিন জাতীয় খাবার সকলেই খেয়ে থাকেন।

পরিবেশ

● **ক্রমশ বরফহীন হচ্ছে সুমেরু সাগর :**

উপগ্রহ মারফত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল স্নো অ্যান্ড আইস ডেটা সেন্টার জানাচ্ছে, এ বছর ১ জুন সুমেরু সাগরে বরফ ছিল মাত্র ১ কোটি ১১ লক্ষ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে। তিন দশক আগে এই একই সময়ে তা ছিল ১ কোটি

২৭ লক্ষ বর্গকিলোমিটর এলাকা জুড়ে। অর্থাৎ, গত ৩০ বছরে সুমেরু সাগরে ১৫ লক্ষ বর্গকিলোমিটারেরও বেশি এলাকা (ব্রিটেনের ৬ গুণ আয়তনের সমান) থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে বরফ।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পোলার ওশেন ফিজিক্স গ্রুপের প্রধান বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, অধ্যাপক পিটার ওয়্যাডহ্যাম্‌স বিজ্ঞান-জার্নাল 'নেচার'-এ প্রকাশিত তাঁর গবেষণাপত্রে দাবি করেছেন, এর ফলে আগামী পাঁচ বছরে গোটা বিশ্বের তাপমাত্রা ০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। এটা উষ্ণায়নের বিপদকে অনেকটাই বাড়িয়ে তুলবে। আর বরফ গলে যাওয়ার ফলে তার মধ্যে জমাট বাঁধা অবস্থায় সঞ্চিত মিথেন গ্যাসও বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। যা আগামী দিনে বিপদ ডেকে আনতে পারে। বরফ কমে আলোর প্রতিফলন কমে যাওয়ায় ভূ-পৃষ্ঠ কিছুটা অন্ধকার হয়ে যাবে। ফলত, বেশি সূর্যালোক শুষে আরও বেশি তেতে উঠবে ভূ-পৃষ্ঠ। বাড়বে বিশ্ব উষ্ণায়ন।

● **বাঘ সচেতনতায় 'টাইগার এক্সপ্রেস' :**

বাঘ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের দিনই একটি নতুন ট্রেনের উদ্বোধন করলেন রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু। নাম টাইগার এক্সপ্রেস। দিল্লির সফদরজঙ থেকে সফর শুরু করে কাতানি, জব্বলপুর এবং বান্ধবগড় হয়ে সেটি পৌঁছায় কান্‌হা। পাঁচ দিন ও ছয় রাত্রির এই সফরে ট্রেনের ভাড়া সাড়ে ৩৮,৫০০ টাকা থেকে শুরু। এসি সিঙ্গল টিয়ারে এক জনের জন্য খরচ ৪৯,৫০০ টাকা। এই ভাড়া শুধুমাত্র ভারতীয়দের জন্যই। বিদেশিরা এই ট্রেনে ভ্রমণ করতে চাইলে দিতে হবে অতিরিক্ত আরও ৪,০০০ টাকা। ট্রেনের সব যাত্রীদের বান্ধবগড় এবং কান্‌হা ন্যাশনাল পার্ক ঘোরানো হবে। পর্যটনকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে এটি ভারতীয় রেলের এক অভিনব পরিকল্পনা।

● **আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবসের থিম 'বন্যপ্রাণ বাঁচাও' :**

আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবসে কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের তরফ থেকে এবার থিম বেছে নেওয়া হয়, 'বন্যপ্রাণ বাঁচাও'। আরও নির্দিষ্টভাবে ধরলে, চোরাশিকারি এবং চোরাকারবারিদের হাত থেকে বন্যপ্রাণীদের বাঁচানো। গোটা বিশ্বে মাদক পাচারের পরে আন্তর্জাতিক অপরাধজগতে বন্যপ্রাণী পাচারেরই রমরমা। এর সঙ্গে জড়িত নানা মাফিয়া চক্র। গত বছর থেকে দেশের অপরাধপঞ্জি এনসিআরবি রিপোর্টেও বন্যপ্রাণ সংক্রান্ত অপরাধ নথিভুক্ত হচ্ছে। প্রসঙ্গত, জাতীয় অপরাধ রেকর্ড ব্যুরোর সেই হিসেবেই বলছে, ২১৯-টি মামলা নিয়ে প্রথম স্থানে রয়েছে রাজস্থান। বন্যপ্রাণী পাচার এবং ব্যবসার নিরিখে পিছিয়ে নেই পশ্চিমবঙ্গও। দেশের মধ্যে বন্যপ্রাণ সংক্রান্ত অপরাধের তালিকায় এ রাজ্যের স্থান ষষ্ঠ। এক বছরে ৪৫-টি এমন ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে।

খেলা

● **ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন সানরাইজার্স হায়দরাবাদ :**

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল)-এর নবম আসরে চ্যাম্পিয়ন হল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ২৯ মে ফাইনালে রয়াল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর-কে তাদের ঘরের মাঠে হারিয়ে প্রথমবার খেতাব জিতল হায়দরাবাদ। চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে বিজয়ী দলের বেন কাট্টিংকে 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' ঘোষণা করা হয়। তাঁরই সতীর্থ মুস্তাফিজুর রহমানকে মরসুমের উঠতি খেলোয়াড় হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। রয়াল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর-এর বিরাট কোহলি 'দ্য মোস্ট ভ্যালুয়েবেল প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট'-এর শিরোপা পান।

প্রতিযোগিতা শুরু হয় ৯ এপ্রিল থেকে। এই মরসুমে রাজকোট ও পুনে ভিত্তিক দু'টি নতুন দল—গুজরাট লায়ন্স ও রাইজিং পুনে সুপারজায়ান্টস অংশগ্রহণ করে। অন্যদিকে, পুরনো দলগুলির মধ্যে চেন্নাই সুপার কিংস ও রাজস্থান রয়্যালস-কে ম্যাচ গড়াপেটার জন্য ২০১৭ সাল পযন্ত বহিষ্কৃত করা হয়। প্রসঙ্গত, ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ামক বোর্ড ২০০৭ সালে পেশাদার টি-২০ লিগ প্রতিযোগিতা হিসাবে আইপিএল-এর সূচনা করে।

● **ফ্রেঞ্চ ওপেন :**

জীবনের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম ফাইনালেই 'অঘটন' ঘটালেন গারবিন মুগুরুজা। হট ফেভারিট সেরেনা উইলিয়ামকে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে ফরাসি ওপেন জিতলেন তিনি। ফল ৭-৫, ৬-৪। একইসঙ্গে ১৯৯৮ সালের পর প্রথম মহিলা স্পেনীয় হিসেবে রোলাঁ গারোয় জিতে নজির গড়লেন ২২ বছরের মগুরুজা। স্বদেশীয় আরাঞ্জা সাঞ্চেজ ভিকারিও শেষভার ওই বছরেই লাল সুরকির কোর্টে খেতাব জিতেছিলেন। সর্বাধিক গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের স্টেফি গ্রাফের (২২) রেকর্ড ভাঙ্গার হাতছানি ছিল সেরেনার সামনে। কিন্তু, শেষরক্ষা হল না। এর আগে ২০১৫ সালের ফাইনালিস্ট হওয়াটাই ছিল মুগুরুজার সেরা পারফরম্যান্স।

অ্যান্ডি মারেকে হারিয়ে ২০১৬-র পুরুষ সিঙ্গলস বিভাগে ফ্রেঞ্চ ওপেন চ্যাম্পিয়ন নোভাক জকোভিচ। ম্যাচের ফল ৩-৬, ৬-১, ৬-২, ৬-৪। প্রথম সেট হেরে গেলেও দ্বিতীয় সেট থেকেই ঘুরে দাঁড়ান নোভাক। শুরুটা মারের হলেও শেষটা ও ম্যাচের বাকি সময়টা নিজের দখলেই রাখলেন জকার। এই জয়ের সঙ্গেই সব গ্র্যান্ড স্লাম জয়ীর তালিকায় ঢুকে পড়লেন তিনি। বিশ্বের অষ্টম প্লেয়ার হিসাবে জিতে নিলেন সব কটি গ্র্যান্ডস্লাম। এই প্রথম ফ্রেঞ্চ ওপেন চ্যাম্পিয়ন ট্রফি এল জকোভিচের দখলে।

সানিয়া মির্জা-ইভান ডোডিগকে হারিয়ে ফ্রেঞ্চ ওপেন মিক্সড ডাবলস চ্যাম্পিয়ন হল লিয়েন্ডার পেজ-মার্টিনা হিঙ্গিস জুটি। দু' সেট শেষে ম্যাচ ড্র হয়ে যাওয়ার পর টাই ব্রেকারে শেষ হয় ম্যাচ। যেখানে বাজিমাত লিয়েন্ডারদেরই। মার্টিনা হিঙ্গিসকে সঙ্গে নিয়ে ডাবলসে চারটি গ্র্যান্ডস্লামই জিতে নিলেন লিয়েন্ডার। সানিয়া-ডোডিগ জুটিকে লি-মার্টিনা জুটিকে টাইব্রেকারে ১০-৮-এ হারিয়ে দিল। তার আগে দুই সেটে ম্যাচের ফল ছিল ৬-৪, ৬-৪।

● **দেশে ইডেনেই প্রথম গোলাপি বল :**

গোলাপি বলে ভারতে দিন-রাতের টেস্ট ক্রিকেটকে সবুজ সঙ্কেত দেখাল কলকাতার ইডেন গার্ডেন্স। ১৮ জুন সুপার লিগ ফাইনালে মরসুমের দ্বিমুকুটজয়ী মোহনবাগান বনাম লিগ চ্যাম্পিয়ন

ভবানীপুর ক্লাবের ম্যাচে ভারতে উদ্বোধন করা হয় গোলাপি কোকাবুরা বল। সেদিন ঠিক দুপুর ২.৩৫। রবিকান্ত সিংহের হাত থেকে ইডেনের বাইশ গজে ছিটকে পড়ল গোলাপি বল। সামনে মোহনবাগানের জয়জিৎ বসু। ইডেনের কয়েকশো সমর্থকের হাতের মোবাইল ঝলসে উঠল, ঐতিহাসিক এই মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য। তার ঠিক আগে বেলুন উড়িয়ে ভারতে প্রথম গোলাপি বলের ম্যাচের সূচনা করেছেন অরুণলাল এবং মনোজ তিওয়ারি। উল্লেখ্য, গোলাপি কোকাবুরা বলের আউট হওয়া প্রথম ব্যাটসম্যান হলেন সেই জয়জিৎ বসু। তাঁর উইকেটটি নেন গীত পুরি।

● **চ্যাম্পিয়ন ট্রফি হকিতে ভারতের রুপো :**

এর আগে ১৭ জুন চ্যাম্পিয়ন ট্রফি হকিতে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ২-৪-এ হেরেও ফাইনালে উঠে গিয়েছিল ভারত। এ দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে গ্রেট ব্রিটেন-বেলজিয়াম ৩-৩ ড্র করায় ৫ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে ফাইনালে চলে গেল ভারত। ফাইনালে তাদের সামনে ফের অস্ট্রেলিয়া।

তবে ইতিহাস গড়া হল না ভারতের। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে দুরন্ত লড়েও টাইব্রেকারে ১-৩-এ হেরে যায় ভারত। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ছিল গোলশূন্য। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না—টাইব্রেকারে উত্থাপ্পা, সুনীল মিস করেন। ভারতীয় হকির এক নতুন দিগন্ত খুলে দিল এবারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। এই প্রথম টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠল ভারত। ফাইনালে হেরে রুপো পেল ভারতীয় দল।

● **অস্ট্রেলীয় ওপেন ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন সাইনা নেহওয়াল :**

মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন সুপার সিরিজে চ্যাম্পিয়ন হলেন সাইনা নেহওয়ালা। এর আগের দিন সেমিফাইনালে চিনের লি জুয়েরুইকে হারিয়ে চমকে দিয়েছিলেন চিনেরই সান ইউ। ১২ জুন প্রথম গেমে সেই সানের কাছে হেরেও পিছন থেকে উঠে এসে দুর্দান্ত জিতলেন হায়দরাবাদি তারকা। ম্যাচের ফল সাইনার পক্ষে ১১-২১, ২১-১৪, ২১-১৯। ৭২ মিনিটে খেলা শেষ হয়। সাইনার এই সাফল্যে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন সংস্থা তাঁকে ১০ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে।

দু' বছর আগে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন সুপার সিরিজে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন সাইনা। তিনিই বিশ্বের প্রথম কোনও শাটলার, যিনি দু'বার এই ট্রফি জিতলেন। গত নভেম্বরে চিনা ওপেনের ফাইনালে লি জুয়েরুইয়ের কাছে হারার পর এই প্রথম কোনও সিরিজের ফাইনালে পৌঁছেছিলেন সাইনা। ফাইনালে পৌঁছনোর পথে হারিয়েছেন রত্নাচক ইন্তানন এবং বিশ্বের দুই নম্বর ইহান ওয়াংকে।

● **এশিয়ান পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে চার পদক ভারতের :**

'এশিয়ান পাওয়ার লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে' ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে ৯৩ কেজি বিভাগে তিনটি রুপো এবং একটি ব্রোঞ্জ পেলেন কৌস্তভ ঘোষ। তিনি দুর্গাপুরের বাসিন্দা তথা বিশ্বভারতীর শারীরশিক্ষা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়া। ৭ জুন থেকে ১২ জুন পর্যন্ত রাজস্থানের উদরপুরে চলে ওই প্রতিযোগিতা। ভারোত্তোলনের ৯৩ কেজি বিভাগে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন কৌস্তভ। সেখানেই দ্বিতীয় হয়ে রুপো জেতেন তিনি। ১৯-টি দেশের মধ্যে চলা ওই প্রতিযোগিতায় ফিলিপিন্স প্রথম এবং ইরান তৃতীয় স্থান পেয়েছে।

দুর্গাপুরের রঘুনাথপুর-মধুপল্লির বাসিন্দা কৌস্তভ ২০১৪ সালে ফেডারেশন কাপ-এ ৯৩ কেজি বিভাগে দ্বিতীয় হওয়ার পর ২০১৫ সালে কোচবিহারে স্টেট চ্যাম্পিয়ন হন। তারপরেই জামশেদপুর রতন টাটা স্পোর্টস কমপ্লেক্সে সিলেকশন ট্রায়াল-এর জন্য ডাক পাওয়া। সেখানে ভারোত্তোলনের ৯৩ কেজি বিভাগে প্রথম স্থান পান। তারপরেই ষষ্ঠ কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপের ভারোত্তোলনের ৯৩ কেজি বিভাগে ভারতীয় দলে বাংলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ আসে।

● **জিম্বাবোয়েতে ভারত :**

৯ জুন জিম্বাবোয়ে পৌঁছল ১৬ জনের ভারতীয় ক্রিকেট দল। এখানে তিনটি একদিনের ম্যাচ (১১, ১৩, ১৫ জুন) এবং তিনটি টি-টোয়েন্টি (১৮, ২০, ২২ জুন) ম্যাচ খেলার কথা ভারতের। তিন ম্যাচের একদিবসীয় সিরিজে পর পর দুটো ম্যাচ জিতে সিরিজের দখল নিয়ে নেন ধোনিরা। আর ১১ জুন হারারেতে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে অভিষেক ম্যাচেই ১১৫ বলে দুরন্ত সেঞ্চুরি করে নজর কেড়েছেন কর্ণাটকের লোকেশ রাহুল। তিনি বিশ্বের ১১তম ব্যাটসম্যান, যিনি আবার ইতিমধ্যেই ঢুকে পড়েছেন অভিষেক ম্যাচে সেঞ্চুরিয়নদের দলে।

● **চোটের জন্য উইম্বলডন থেকে সরে দাঁড়ালেন নাদাল :**

চোটের জন্য উইম্বলডন থেকে নাম তুলে নিলেন রাফায়েন নাদাল। ৮ জুন নাদালের কোচ টনি নাদাল জানান, এই চোট সারিয়ে রাফা কবে আবার কোর্টে ফিরতে পারবেন সেটা এখনই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। ফ্রেঞ্চ ওপেনে দু' রাউন্ড খেলার পর কব্জিতে চোটের জন্য সরে দাঁড়িয়েছিলেন নাদাল। এই চোট এখনও ভোগাচ্ছ তাঁকে। উল্লেখ্য, ২৭ জুন থেকে শুরু হচ্ছে উইম্বলডন।

● **দু' বছরের জন্য সাসপেন্ড মারিয়া শারাপোভা :**

শেষ পর্যন্ত ৮ জুন মারিয়া শারাপোভাকে দু' বছরের জন্য সাসপেন্ড করল আন্তর্জাতিক টেনিস ফেডারেশন। ডোপ পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছিলেন জানুয়ারিতে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে। মার্চে প্রাথমিকভাবে সাসপেন্ড হন। অন্যদিকে যত দ্রুত সম্ভব কোর্টে ফিরতে মরিয়া রাশিয়ান তারকা শারাপোভা শাস্তির বিরুদ্ধে কোর্ট অব আর্বিট্রেশনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। ২৯ বছর বয়সি পাঁচবারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ীকে রাশিয়ার রিও অলিম্পিক্সের দলে রাখা হয়েছিল। তিনি না নামতে পারলে অলিম্পিক্সে তাঁর জায়গায় খেলবেন একাতেরিনা মাকারোভা। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে যিনি পাঁচ নম্বর।

শারাপোভার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল নিষিদ্ধ ওষুধ মেলডোনিয়াম ব্যবহার করার। যা ১ জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ওয়াডা নিষিদ্ধ করে দেয়। কিন্তু শারাপোভার যুক্তি ছিল তিনি এক দশক ধরে ওষুধটা খাচ্ছেন। রক্তের প্রবাহ বাড়াতে যা সাহায্য করে। জানতেন না ওষুধটা নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। তবে দু' বছরের সাসপেনশনের শাস্তিও মেনে নিচ্ছেন না তিনি।

● **জুলাইয়ে কলকাতা লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনে নিয়ম বদল :**

এবারের কলকাতা লিগ হবে ১১-টি দল নিয়ে। সব দলকে খেলতে হবে ১০-টি করে ম্যাচ। অবনমন হবে চারটি দলের। তিনজন বিদেশিকে দলে নিতে পারলেও মাঠে খেলতে পারবেন দু'জন। বিদেশির পরিবর্তে নামাতে হবে বিদেশিকেই। এদিকে সব প্রিমিয়ার লিগ দলের জন্য বাধ্যতামূলক করা হল অনূর্ধ্ব-১৮ দল।

কলকাতা লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনে এবার অনূর্ধ্ব-২৩ ফুটবলারের নিয়ম বদলে যাচ্ছে। গত মরসুমেও টিমগুলোকে দু'জন করে অনূর্ধ্ব-২৩ ফুটবলারকে খেলাতে হয়েছে। কিন্তু এবার থেকে একজন করে খেলবেন। আগে অনূর্ধ্ব-২৩ ফুটবলার লালকার্ড দেখলে সিনিয়র ফুটবলার তুলে অনূর্ধ্ব-২৩ ফুটবলারই নামাতে হত। সেই নিয়ম আর থাকছে না। তবে রিজার্ভ বেঞ্চে আরও দু'জন অনূর্ধ্ব-২৩ ফুটবলার রাখতে হবে ক্লাবগুলোকে। জুলাইয়ের তৃতীয় সপ্তাহে প্রিমিয়ার ডিভিশনের মূল পর্বের খেলা শুরু হতে পারে।

● **৬ জুলাই থেকে শুরু ৪৯ দিনের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর :**

৬ জুলাই থেকে সাত সপ্তাহের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে যাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। সেখানে ৪ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবেন বিরাট কোহালিরা। দুটো প্রস্তুতি ম্যাচও থাকছে তালিকায়। চারটি টেস্টের ভেন্যু হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা, জামাইকা, সেন্ট লুসিয়া ও ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোকে। ট্যুর শুরু হবে ৯ জুলাই দু'দিনের অনুশীলন ম্যাচ দিয়ে। এরপর ১৪ জুলাই থেকে তিন দিনের অনুশীলন ম্যাচ খেলবে ভারত। দুটো ম্যাচই হবে সেন্ট কিটে।

প্রথম টেস্ট শুরু হবে ২১ জুলাই থেকে। দ্বিতীয় টেস্ট ৩০ জুলাই থেকে। তৃতীয় টেস্ট শুরু ৯ আগস্ট ও শেষ ও চতুর্থ টেস্ট হবে ১৮ আগস্ট থেকে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে চারটি ভেন্যু এই সিরিজের জন্য তৈরি হয়ে গিয়েছে। প্রসঙ্গত, ভারতীয় দল শেষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গিয়েছিল ২০১১ সালের জুনে। যেখানে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ভারত জিতে নিয়েছিল ১-০-তে। ২০১৪ সালের অক্টোবরে ভারত সফরে আসা ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল মাঝ পথেই সিরিজ ছেড়ে দেশে ফিরে গিয়েছিল।

● **২০১৭ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সূচি প্রকাশ :**

আড়াই সপ্তাহ ধরে চলা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি টুর্নামেন্টের সূচি ঠিক এক বছর আগে প্রকাশ করা হল ওভালে। টুর্নামেন্টে মোট ১৫-টি ম্যাচ হবে। যার মধ্যে তিনটি নক আউট। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে সেরা আটটি দল ইতিমধ্যেই টুর্নামেন্টে কোয়ালিফাই করে ফেলেছে। শীর্ষবাছাই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া। 'এ' গ্রুপে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে আছে চতুর্থ বাছাই নিউজিল্যান্ড, ষষ্ঠ বাছাই ইংল্যান্ড এবং সাত নম্বর বাছাই বাংলাদেশ।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই দিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির শুরুটা করতে চলেছে ভারত। বিরাট কোহালিদের টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচেই ধুন্ধুমার লড়াই হবে ৪ জুন ২০১৭ এজবাস্টনে। ১৮ দিনের টুর্নামেন্ট চলবে জুন ১ থেকে ১৮ পর্যন্ত। এজবাস্টন ছাড়াও খেলতে হবে কার্ডিফ ওয়েলস স্টেডিয়াম আর ওভালে। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের আগে আবার এজবাস্টনে মুখোমুখি হবে ২০১৫ বিশ্বকাপের দুই ফাইনালিস্ট অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ড। পাশাপাশি সংগঠক ও ২০১৩ সালের ফাইনালিস্ট ইংল্যান্ড টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে খেলবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ওভালে। একই মাঠে আবার প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কারও লড়াই হবে ৩ জুন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে।

● **বিশ্বের সবচেয়ে ধনী মহিলা ক্রীড়াবিদ সেরিনা উইলিয়ামস :**

ফরাসি ওপেনের ফাইনালে হারলেও বিশ্বের সবচেয়ে ধনী মহিলা ক্রীড়াবিদ হিসেবে এক নম্বর স্থান দখল করলেন সেরিনা উইলায়মস। ৭ জুন বিশ্বের ধনী মহিলা ক্রীড়াবিদদের তালিকা প্রকাশ করেছে ফোর্বস ম্যাগাজিন। যেখানে এগারো বছর ধরে শীর্ষে থাকা মারিয়া শারাপোভাকে দু' নম্বরে ঠেলে প্রথম স্থানে উঠে এলেন সেরিনা। গত এক বছরে সেরিনার রোজগার ২৮.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

● **এশিয়া কাপের নির্ণায়ক পর্বের তৃতীয় ধাপে ভারত :**

গুয়াহাটিতে ঘরের মাঠে লাওসকে উড়িয়ে এক ধাপ এগোল ভারত। ২০১৯ সালের এএফসি এশিয়া কাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক পর্বের তৃতীয় ধাপে পৌঁছে গেলেন সুনীল ছেত্রীরা। লাওসে গিয়েও তাদের হারিয়ে এসেছিল ১-০ গোলে। ৭ জুন জিতল ৬-১-এ। যদিও এদিন প্রথমে গোলের খাতা খুলেছিল লাওসই। [ভারত ৬ : জেজে লালপেখলুয়া-২, সুমিত পাসি, সন্দেশ ঝিঙ্গান, মহম্মদ রফিক, ফুলগানকো কার্দোজো) এবং লাওস ১ (সিয়াভোং)]। ১৬ মিনিটে সিয়াভোংয়ের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল লাওস। কিন্তু তার পরের সময়টা পুরোটাই ভারতের। প্রথমার্ধে জেজে এবং সুমিতের গোল দিয়ে যে সুনামি শুরু হয়েছিল, দ্বিতীয়ার্ধেও সেটাই জারি ছিল। ভারতীয়দের একের পর এক আক্রমণে জেরবার লাওস রক্ষণ এদিন কোনও প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারেনি। দু' পর্ব মিলিয়ে স্কোরলাইন ভারতের পক্ষে ৬-১।

প্রয়াণ

● **মনোহর আইচ :**

৫ জুন চলে গেলেন 'পকেট হারকিউলিস' মনোহর আইচ। বয়স হয়েছিল ১০৪ বছর। বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ ছিলেন তিনি। অবিভক্ত ভারতের কুমিল্লায় (অধুনা বাংলাদেশে) ১৯১২ সালের ১৭ মার্চ জন্ম। দেহের উচ্চতা মাত্র ৪ ফুট ১১ ইঞ্চির হলেও ১৯৫২ সালে প্রথম বাঙালি বডিবিল্ডার হিসেবে 'মিস্টার ইউনিভার্স' খেতাব জেতেন তিনি। যে শরীরকে তিনি মন্দির হিসেবে দেখতেন, তাও দান করে গেলেন মানুষের কল্যাণে। মৃত্যুর পর বাড়ি থেকে তাঁর দেহ নিয়ে যাওয়া হয় আর জি কর হাসপাতালে। তার আগে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর চোখও।

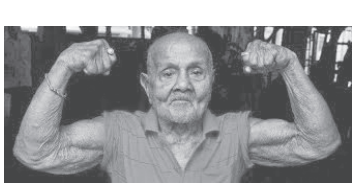

ধীরে ধীরে দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে দেহচর্চার টানে ছুটে গিয়েছেন বিদেশের মাটিতেও। ১৯৫০ সালে ৩৮ বছর বয়সে 'মিস্টার হারকিউলিস' প্রতিযোগিতা জেতেন। ১৯৫১ সালে মিস্টার ইউনিভার্স-এ দ্বিতীয় হন। পরের বছর একেবারে সেরার শিরোপা। নয়াদিল্লি (১৯৫১), ম্যানিলা (১৯৫৪) ও টোকিও (১৯৫৮) এশিয়ান গেমসে তিনটি করে সোনা জেতেন তিনি। এরপর আর থেমে থাকেননি। একের পর এক প্রতিযোগিতায় দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন বিশ্বশ্রী। আশি পেরিয়েও সমানভাবে শরীরচর্চা করে গিয়েছেন তিনি। তাঁর শেষ শো ছিল ৮৯ বছর বয়সে।

● **মহম্মদ আলি :**

মারা গেলেন কিংবদন্ত বক্সার তথা হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন মহম্মদ আলি। বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। বেশ কয়েক দিন ধরে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। এছাড়া গত তিন দশক ধরে দুরারোগ্য পার্কিনসন্স রোগে ভুগছিলেন তিনি। ৩ জুন স্থানীয় সময়ে রাত দু'টো নাগাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনার একটি হাসপাতালে মৃত্য হয় তাঁর।

১৯৬০ সালের প্রথম দিকে বিশ্বকে চমকে দিয়ে আবির্ভাব ঘটে বছর আঠারোর এই মার্কিন বক্সারের। সরকারের মুখের উপর বলতে পেরেছিলেন ভিয়েতনাম যুদ্ধে দেশের হয়ে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা। ক্যাসিয়াস ক্লে থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে হয়ে গেলেন মহম্মদ আলি। ১৯৬০ সালে অলিম্পিকে সোনা জিতে যাত্রা শুরু। মোট ৬১-টি লড়াইয়ের মধ্যে ৫৬-টিতেই জিতেছিলেন আলি। জো ফ্রেজারের সঙ্গে তাঁর লড়াইকে বলা হয় শতকের সেরা লড়াই। ১৯৭৫ সালের সেই ম্যাচ চলেছিল মোট ১৫ রাউন্ড। তিনবার বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ানশিপ খেতাব জিতে অবসন নেন তিনি। বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে বারবার সোচ্চার হয়েছেন 'দ্য গ্রেটেস্ট' আলি।

● **সুলভা দেশপাণ্ডে :**

মারাঠি তথা হিন্দি থিয়েটার এবং ফিল্মের প্রবীন অভিনেতা সুলভা দেশপাণ্ডে চলে গেলেন। বয়স হয়েছিল ৭৯। দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত অসুখে ভুগছিলেন তিনি। ৪ জুন মুম্বইয়ে নিজের বাড়িতেই মারা যান তিনি। স্বামী খ্যাতনামা অভিনেতা-পরিচালক অরবিন্দ দেশপাণ্ডের (১৯৮৭ সালে তিনি মারা গেছেন) সঙ্গে যৌথভাবে ১৯৭১ সালে 'আবিষ্কার' নামে থিয়েটারের দলও খুলেছিলেন তিনি।

মারাঠি থিয়েটার ছাড়াও শ্যাম বেনেগাল পরিচালিত 'ভুমিকা', সৈয়দ মির্জার 'অরবিন্দ দেশাই কি আজিব দাস্তান' বা মুজফ্‌ফর আলির 'গমন'—সত্তরের দশকে রুপোলি পর্দাতেও একের পর এক অনবদ্য চরিত্রে দেখা গিয়েছে তাঁকে। এরই পাশাপাশি, টেলিভিশন সিরিয়ালেও চুটিয়ে অভিনয় করেছিলেন সুলভা। ছোটদের জন্য একটি হিন্দি ছবি 'রাজা রানি কো চাহিয়ে পাসিনা' পরিচালনা করেছিলেন তিনি। ২০১২ সালে শেষবার তাঁকে হিন্দি ছবিতে দেখা যায় 'ইংলিশ ভিংলিশ'-এ মিসেস গোড়বোলের চরিত্রে। মারাঠি ও হিন্দি থিয়েটারে অবদানের জন্য ১৯৮৭ সালে সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার পান।

● **স্টিফেন কেশি :**

আফ্রিকান ফুটবলের নামী ব্যক্তিত্ব স্টিভন কেশি মারা গেলেন। ৮ জুন সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তিনি। বয়স হয়েছিল ৫৪। নাইজিরিয়ার ডিফেন্ডার ছিলেন কেশি। ১৯৯৪ বিশ্বকাপে নাইজিরিয়ার অধিনায়কত্ব করেছিলেন। যে বিশ্বকাপে তাঁর সতীর্থ ছিলেন কলকাতায় খেলে যাওয়া এমেকা এজুগো। নাইজিরিয়ার হয়ে কেশি ৬৪ ম্যাচ খেলেন। কোচ হিসেবেও নাইজিরিয়ার দায়িত্বে ছিলেন। আফ্রিকান নেশনস কাপ জেতাতে সাহায্য করেছিলেন সুপার ইগলসদের। খেলোয়াড় ও কোচ হিসেবে এই কাপ জয় করে তিনি নজির গড়েন (কেশি ছাড়া শুধু মিশরের মাহমুদ এল-গোহারি এই যুগ্ম সাফল্য অর্জন করেছেন)। এছাড়াও কেশির কোচিংয়ে ২০১৪ বিশ্বকাপে শেষ ষোলোয় পৌঁছয় নাইজিরিয়া।

বিবিধ

● **মহারাণা প্রতাপের নামে নতুন রিজার্ভ ব্যাটেলিয়ান ঘোষণা :**

মহারাণা প্রতাপের নামে নতুন বাহিনী তৈরি করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ৭ জুন রাজস্থানের একটি জনসভায় এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। একটি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাটেলিয়ান তৈরি করে তার নামা রাখা হবে মহারাণা প্রতাপের নামে। ভারত সরকার ১৯৭১ সালে সেনাবাহিনীতে প্রথম রিজার্ভ ব্যাটেলিয়ান অন্তর্ভুক্ত করে। এখনও পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ১৫৩-টি বাহিনীকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

● **সব মোবাইল ফোনেই 'প্যানিক বোতাম' বাধ্যতামূলক :**

দেশে চালু থাকা সব মোবাইল ফোনেই বিপদে পড়লে জরুরি বার্তা পাঠানোর (প্যানিক বাটন বা বোতাম) সুযোগ দিতে বিশেষ সফটওয়্যার বসানোর নির্দেশ দিয়েছে টেলিকম দপ্তর (ডট)। যাতে একটি বোতাম টিপেই আপৎকালীন '১১২' নম্বরে ফোন করা যায়। আগামী ১ জানুয়ারি থেকে বিক্রি হওয়া সব নতুন ফোনে 'প্যানিক বোতাম' রাখতে হবে বলে এপ্রিলেই জানিয়েছিল কেন্দ্র। এবার চালু পরিষেবাভুক্ত সমস্ত হ্যান্ডসেটের জন্যও এই ব্যবস্থা আনতে বলেছে তারা।❑

সংকলক : রমা মন্ডল এবং পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী

(বিবিধ সূত্র থেকে সংকলিত)

Our Publications...

...Treasure Trove of Knowledge

Publications Division
Ministry of Information & Broadcasting
Goverment of India

Soochna Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.
Tel : 011-24367260, 24365609

website : publicationsdivision.nic.in
www.facebook.com/publicationsdivision

For more information and business queries,contact : **e-mail: dpd@sb.nic.in, businesswng@gmail.com**

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 30.00

July, 2016
R.N.I. No. 19740/69

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs. 610/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

Phone _____

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐☐☐☐☐☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

ATTENTION PLEASE

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana - Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের অতিরিক্ত মহানির্দেশক, ড. সাধনা রাউত কর্তৃক
৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯, ফোন ঃ ২২৪৮ ২৫৭৬ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।